

182. Ac. 15.5.

তীর্থ-কাহিনী

অর্থাৎ

বহুবীধ পুণ্যতীর্থ, ক্ষেত্রপীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী
দেবদেবী এবং পবিত্র আশ্রমমণ্ডলীর
বিস্তারিত বিবরণ।

—○—

রাজসাহী, ফৈলাজা নিবাসী

শ্রীচন্দ্রনাথ ভৌমিক কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

—*—

কলিকাতা,

২ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

—

১৩২০

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	ক	স্বাধীনতা	১০৯
গঙ্গা তীর্থ	১	প্রভাস	১২৬
কালীঘাট	৬	অযোধ্যা	১৩৮
কিরীটেশ্বরী	১০	নৈমিষারণ্য	১৪২
নলাটেশ্বরী	১৪	হরিদ্বার	১৬২
ভারা মা	১৭	কেদারনাথ	১৬৮
মন্দিকেশ্বর	২২	বদরিকাশ্রম	১৮৭
বক্রেস্বর	২৬	জালামুখী	২০১
বৈদ্যনাথ	৩২	উৎকল	২১৬
গয়াক্ষেত্র	৩৮	বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া	২১৯
কাশী-ধাম	৪৫	একামকানন বা ভুবনেশ্বর	২২৬
বিক্রাচল	৬৭	পুরুষোত্তম	২৩৩
প্রয়াগ	৭০	নৃসিংহজী	২৫১
মথুরা	৭৮	পদগয়া	২৫৭
শ্রীবৃন্দাবন	৮৭	গোদাবরী	২৬০
পুষ্কর	৯৪	কৃষ্ণা গঙ্গা	২৬৭
বিষ্ণু-সরোবর	১০০	কাঞ্চীপুরী	২৭১
সুদামা পুরী	১০৫	সেতুবন্ধ-রামেশ্বর	২৮০

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কামাখ্যা ...	২৯৩	ওঁকারেশ্বর ও অমরেশ্বর	৩২১
চন্দ্রশেখর ...	৩০১	পরিশিষ্ট ...	৩৫০
অবতী ...	৩১০		



1182

26416

তীর্থ-কাহিনী

Pl 29

2009/6

অর্থাৎ

বহুবিধ পুণ্যতীর্থ, ক্ষেত্র, পীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী
দেবদেবীর এবং পবিত্র আশ্রমমণ্ডলীর
চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণ।



রাজসাহী জেলাস্থ লক্ষ্মীকোল নিবাসী

শ্রীচন্দ্রনাথ ভৌমিক কর্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

—:—

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি হইতে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

—o—

১৩২২

মূল্য ১ এক টাকা।

182. Ac. 15. 8.

তীর্থ-কাহিনী

অর্থাৎ

বহুবীধ পুণ্যতীর্থ, ক্ষেত্রপীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী
দেবদেবী এবং পবিত্র আশ্রমমণ্ডলীর
বিস্তারিত বিবরণ।

—○—

রাজসাহী, ফৈলাজা নিবাসী

শ্রীচন্দ্রনাথ ভৌমিক কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

—*—

কলিকাতা,

২ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

—

১৩২০





তীর্থ শব্দ, তৃপাতু হইতে নিষ্পন্ন। তৃপাতুর অর্থ উত্তীর্ণ হওয়া, অর্থাৎ যে স্থানমাহাত্ম্যে জীব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহাকেই তীর্থ বলে। আৰ্য্যঋষিগণ পাপোত্তীর্ণ হইবার মানসে সতত তীর্থ সেবা করিতেন এবং লোকহিতার্থে জনসমাজে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেন। সংসারানুরক্ত মানবগণ সাংসারিক কার্যের অনুরোধেই হউক অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির পরবশ হইয়াই হউক, সময়ে সময়ে যে সকল পাপার্জন করেন, সেই সকল পাপ হইতে ভৌম তীর্থ-স্নাত ব্যক্তিমাത്രেই মুক্ত হইয়া পরম উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

যাগাদ্যুপাসনা সর্বক জ্ঞানার্থাচারসম্ভবাঃ।

তেষাং কলাব সম্ভবাদঘীনাং পাপনাশনং ॥

বিনা তীর্থেন নাস্ত্যেব মুক্তিঞ্চ পরমা তথা।

তস্যাং সর্বপ্রযত্নেন তীর্থাভিষেচনং শুভং ॥

যাগাদি সর্ব প্রকার উপাসনা জ্ঞানের নিমিত্তক, তাহা কেবল সদাচারাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়। অধুনাতন কলিকালে সেরূপ সদাচার সংরক্ষণ হওয়া লোকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এই কারণে তীর্থ সেবাই সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য ও মঙ্গলদায়ক।

ভূমিকা ।

তীর্থগমনেচ্ছু ব্যক্তিমাতেই কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া
গমন করিবেন ; যথা—

উদ্যতশ্চেৎ গয়াং গন্তুং শ্রদ্ধাং কৃত্বা বিধানতঃ ।

বিধায় কার্পটীবেশং কৃত্বা গ্রামপ্রদক্ষিণম্ ॥

ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষান্নভোজনম্ ।

ততঃ প্রতিদিনং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহ বিবর্জিতঃ ।

প্রতিগ্রহাচ্ছপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টী নিরত স্তুতং যতঃ ।

জিতেন্দ্রিয়ো যো দানশীলঃ স তীর্থফল মশ্নুতে ॥

কামং ক্রোধং তথা লোভং ত্যক্ত্বা কার্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ব্রহ্মচার্য্যেকভোজী ভূশারী সত্যবাক্ শুচিঃ

সর্বভূতহিতে রক্তঃ স তীর্থফল মশ্নুতে ॥

অর্থাৎ গয়াগমনোদ্যত ব্যক্তি গৃহে পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ করতঃ গৈরিক
বসন ধারণ পূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করতঃ স্থানান্তর যাইয়া শ্রাদ্ধশেষান্ন
ভোজন করিবে । কাহারও নিকট কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া এবং
বাক্য মন সংযত করিয়া প্রতিদিন গমন করিবে । কামক্রোধাদি সহ
সংসারের কার্য সকল পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনে হবি-
ষাহারী, শুচি, সত্যবাদী, সর্বভূতের হিতে রত, দানশীল ব্যক্তিই
তীর্থের সম্যক ফললাভ করিতে পারে । তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া মুণ্ডিতমস্তক
ও স্নানান্তে উপবাসী থাকিতে হইবে, পরদিন প্রথমে পার্শ্বণ শ্রাদ্ধান্তে
তীর্থের কর্তব্য সকল ক্রমে করিবে । এইরূপে অভিলষিত সমস্ত তীর্থ
দর্শনান্তে বাটীতে পুনঃ প্রত্যাগমন করতঃ পুনরায় পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ
করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে । এই নিয়ম সমস্ত তীর্থগমনেই জানিবেন ।

ভূমিকা ।

ভারতে হিন্দুর তীর্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না ।
ঐ সকল তীর্থস্থান কোনটী সুগম লোকালয়ে—কোনটী দুর্গম
বিপদসঙ্কুল বিজন পৰ্ব্বতারণ্যে, কোনটী এষি গিরিসঙ্কটারণ্য মধ্যে
যে তথায় গৃহীরমাইবার কোনও উপায় নাই । হিন্দুর বহুতর তীর্থই
এইরূপ অগম্য স্থানে, তবে এক্ষণে ইংরেজরাজের সুশাসনে ও গমনা-
গমনের সুব্যবস্থায় অনেকটী দুর্গম স্থানও সুগম হইয়াছে এবং
পূর্বের জায় ভয়ের কোন কারণ না থাকায় হিন্দু নরনারী, বাল বৃদ্ধ
বনিতা সকলেই সকল স্থানে গমন করিয়া পুণ্যক্ষেত্রে, দেবালয় ও
পবিত্র আশ্রম মণ্ডলীর মনোহর অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং স্থানে
স্থানে বিশ্ব প্রকৃতির চিত্তচমৎকারিণী পরমাশ্চর্য্য মূর্তি দর্শন করিয়া
পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও সৃষ্টিকৌশল প্রত্যক্ষ দর্শনে
অপার আনন্দ নীরে নিমগ্ন হন । তীর্থ দর্শনে হৃদয় বেক্রপ নিম্নল
হইয়া প্রেমপুলকিত আনন্দরসে চিত্ত অতিষিক্ত করে, গৃহে
বসিয়া শত শত সদনুষ্ঠান দ্বারায়ও তদ্রূপ চিত্তগুচ্ছ না হইলে তত্ত্ব-
জ্ঞান হয় না । ভগবান উত্তর গীতার বলিয়াছেন—

তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্বং ন বিন্দতি ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভত দূরের কথা বোধ হয় একটী যাত্রীও প্রকৃত হৃদয়ে
বাটী ফিরিতে পারেন কি না সন্দেহ । পরন্তু অর্থলোলুপ পাণ্ডাগণের
দৌরাভ্যে তীর্থের প্রতি লোকে ক্রমশঃই বীতশ্রদ্ধ হইয়া আইসেন ।
সরলপ্রাণ যাত্রীগণের ধর্ম্ম বিশ্বাসেই এরূপ ঘটিয়া থাকে ।
সাঁথ্যা নামধারী যাত্রীগণের বিশ্বাসী দালালগণই এই অনিষ্টের মূল ।
উহাদের দ্বারাই তীর্থের পাণ্ডাগণ কুচক্র করিয়া অযথা অর্থব্যয় দ্বারা

ভূমিকা।

মতলব সিদ্ধ করে। এরূপ কৌশলবিস্তার করিয়া অর্থ লইতে থাকে, যে সরল ধর্মপ্রাণ যাত্রী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে বা বুঝিতে পারে না। এমন কি যাত্রীগণকে একেবারে নিঃস্বল্প হইয়া অবশেষে ঋণপত্র লইয়া বিদায় হইতে হয়। বাটীতে আসিয়াও বৎসরাতীতে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। ইহারা তীর্থ-গমনের পূর্বেই যদি কোন্ তীর্থের কি অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না। কোথায় কোন তীর্থ কোন রেল কোথায় উঠিরা কোন ষ্টেশনে নামিতে হয়, রেলভাড়া কত, কোথায় কি ভাবে থাকিতে হয়, কি কি কার্য্য করিতে হয়, কি কি দর্শনীয় আছে তাহাতে ব্যয়ই বা কত, পাণ্ডার স্বভাব চরিত্র কেমন, তাহার প্রাপ্য কত, স্থানীয় অবস্থা ও জল, বায়ু কিরূপ ইত্যাদি জানা থাকিলে আর সৈঁখো বা পাণ্ডার আবশ্যক হয় না, তাহাদের কাছেও যাইতে হয় না; সুতরাং অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণপত্র দান করিয়া আসিতে হয় না।

আমি যাত্রীগণের এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে তীর্থ স্থানের অবস্থা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে অতিরঞ্জিত কিছুই লেপা হয় নাই। আমি যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছি তখন সেই তীর্থের যে অবস্থা এবং সহজসাধ্য কর্তব্যগুলি দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ দৃষ্টে তীর্থের কার্য্য করিলে তীর্থের কার্য্য কিছুই পণ্ড হইবে না অথচ অল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সকল কার্য্যই হইবে। পাণ্ডার চক্রে পড়িয়া আর মনস্তাপ পাইতে হইবে না।

পাঠকগণও এতৎপাঠে গৃহে বসিয়াই তীর্থের সমস্ত অবস্থা

ভূমিকা ।

অবগত হইতে পারিবেন। পরন্তু পাঠকের চিত্তরঞ্জন নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরাদির ফটো সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইল তাহা যাত্রি-গণ ও পাঠকগণই বলিতে পারেন। এই পুস্তক পাঠে যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎপ্রাণোপকার বোধ করেন, তাহা হইলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করিতেছি যে, পাবনা জেলার অন্তর্গত গুণাইগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিদ্যারঞ্জন মহাশয় অতিশয় পরিশ্রম স্বীকারে ভাষা সংশোধন ও হুশ্জ্বলা সম্পাদনে ক্রটি করেন নাই, পরন্তু জামালপুরস্থ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয় সংস্কৃত অংশ আদ্যো-পান্ত দেখিয়া ভ্রমাদি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থের সহিত উভয়ের নাম চিরসম্বন্ধ রহিল, অলমতি বিস্তরেণ।



সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	ক	স্বাধীনতা	১০৯
গঙ্গা তীর্থ	১	প্রভাস	১২৬
কালীঘাট	৬	অযোধ্যা	১৩৮
কিরীটেশ্বরী	১০	নৈমিষারণ্য	১৪২
নলাটেশ্বরী	১৪	হরিদ্বার	১৬২
ভারা মা	১৭	কেদারনাথ	১৬৮
মন্দিকেশ্বর	২২	বদরিকাশ্রম	১৮৭
বক্রেস্বর	২৬	জালামুখী	২০১
বৈদ্যনাথ	৩২	উৎকল	২১৬
গয়াক্ষেত্র	৩৮	বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া	২১৯
কাশী-ধাম	৪৫	একামকানন বা ভুবনেশ্বর	২২৬
বিক্রাচল	৬৭	পুরুষোত্তম	২৩৩
প্রয়াগ	৭০	নৃসিংহজী	২৫১
মথুরা	৭৮	পদগয়া	২৫৭
শ্রীবৃন্দাবন	৮৭	গোদাবরী	২৬০
পুষ্কর	৯৪	কৃষ্ণা গঙ্গা	২৬৭
বিম্ব-সরোবর	১০০	কাঞ্চীপুরী	২৭১
সুদামা পুরী	১০৫	সেতুবন্ধ-রামেশ্বর	২৮০

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কামাখ্যা ...	২৯৩	ওঁকারেশ্বর ও অমরেশ্বর	৩২১
চন্দ্রশেখর ...	৩০১	পরিশিষ্ট ...	৩৫০
অবতী ...	৩১০		



ভ্রম-সংশোধন ।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
টাইটেল পেজ	৩	বহুবীধ	বহুবিধ ।
সূচীপত্র	১	ব	বিষয়
"	২	দ্বা	দ্বারকা
ভূমিকা (ক)	১	তু	তু
(খ)	১১	রক্তঃ	রতঃ
(গ)	৮	পুণ্যক্ষেত্রে	পুণ্যক্ষেত্র
(গ)	১২	আনন্দ নীরে	আনন্দনীরে
(ঘ)	৮	উঠিয়া	উঠিয়া
(ঙ)	২	ফটো-সন্নিবেশিত	ফটো-এবং দুইখানি মানচিত্র ।
১	৩	তীর্থ	তীর্থঃ
১	৫	দৃষ্টা তু	দৃষ্টা তু
২	৮	পিবেদ-পস্তুস্ত	বিপেদাপস্তুস্ত
২	১২	তত্ততীর্থ ফল- প্রাপ্তিনাত্র	তত্ততীর্থফলঃ প্রাপ্তি- নাত্র
১৫	১৭	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
২৪	১৫	পূর্ব	পূর্ব
২৯	৬	গভীররতা	গভীরতা ।
৩২	৪	ভুক্তি	ভক্তি

ভ্রম সংশোধন ।

পত্রাঙ্ক	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	১৬	কালিতঃ	কীলিতঃ
৪১	৮	ক্ষেত্রবাসি বিপ্রগণকে শস্যফল	তাহাকে দানের ফল সম্যক
৪১	১৯	সশক্তিঃ	স্বশক্তিতঃ
৪১	২২	এনং বিধাষ্যামি	ফলস্বিধাষ্যামি
৪১	২২	সত্যমেদ্রবীমিতে	সত্যমেতদ্রবীমি তে
৪৬	৪	শিবমাপ্রবন্তে	শিবমাপ্নুবন্তি
৪৭	২	মুক্তা	মুক্তা
৫৫	৫	জন্মার্জিত	জন্মজন্মার্জিত
৫৫	১৩	শিবমাত্র	এই বিশ্বেশ্বরকে
৫৯	৮	দশাহরায়	দশ-হরায়
৬২	ফুটনোট ২	কালীদৃশ্য	কাশীদৃশ্য
৬২	৬	মত্ত	মর্ত্ত
৬৩	১৩	ফুলে	কূলে
৬৭	২	ব্যুৎপৎসোতে	ব্যুৎপৎসোতে
৭০	১	বিশেষ্যতে	বিশিষ্যতে
৭০	৪	যাত্রাপ্নুতো	যাত্রাপ্নুতো
৭১	৫	মোহ	মোহঃ
৮৯	১১-১৪	পরে নূতন মন্দির হইতে করিয়া আসিতেছেন ।	এই অংশ বাদ দিয়া পড়িতে হইবে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

৮৯ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তির 'বিদ্যমান' আছে—ইহার পর—

প্রাচীন কীর্তির মধ্যে উক্ত পুরাতন মন্দিরত্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গোবিন্দজির মন্দির শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী নির্মাণ করান । মহারাজা মানসিংহ ৯৯৭ সালে ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন । হিন্দুদেবী যবনরাজ ঔরঙ্গজীবের দৃষ্টিতে মন্দিরের উপরার্ক যদিও ধ্বংস হইয়াছে, তথাপিও উহার পূর্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, বরং ভারতের স্থাপত্য গৌরবের অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান আছে । তৎপর চব্বিশ পরগণার বহরুর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার ঘোষ মহাশয় ১২২৫ সালে নূতন দেবালয় নির্মাণ করিয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন । গোপীনাথজির পুরাতন মন্দির রাজপুতনার শ্রীরায় শীলজি ৯৯০ সালে নির্মাণ করাইয়া দিয়া ছিলেন ; কিন্তু ঔরঙ্গজীবের দৃষ্টিতে ঐ মন্দিরের শীর্ষদেশও উড়িয়া যায় । তারপর উক্ত নন্দকুমার বাবু ১৩১২ সালে পুনরায় নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়া গোপীনাথজিকে স্থাপন করেন । মদনমোহনজির পুরাতন মন্দির সম্বন্ধে এই কিস্কদন্তি আছে যে শ্রীসনাতন গোস্বামী ইহার সেবা করিতেন । পঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতান নিবাসী রামদাস নামক জনৈক ধনাঢ্য বণিক নৌকাযোগে বাণিজ্যার্থে এইস্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নৌকা যমুনার চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় । বণিকপ্রবর চড়া-মুক্ত জন্তু ক্রমে তিন দিবস বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় হতাশ হইয়া পড়েন । তখন তিনি সনাতন গোস্বামীর কথা লোকমুখে শ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হন । তিনি রামদাসকে আশ্বাস প্রদান

তীর্থ-কাহিনী ।

করিয়া বলেন, যাও নৌকা মুক্ত হইয়াছে । বণিক পদধূলি গ্রহণান্তে নৌকার নিকট আসিয়া দেখেন, নৌকা চড়া-মুক্ত হইয়াছে । তৎকালে রামদাস ভক্তি ও বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট আসিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোস্বামীজি বলেন আমার অর্থের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাতে রামদাস ক্ষুধমন হইয়া পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায়, শেষ আদেশ করিলেন যে, তুমি যদি সমর্থ হও তবে মদনমোহনজির মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেও । রামদাস তাহাতে সম্মত হইয়া ১১৩২ সালে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন । পরে যখন ঔরঙ্গজিব কর্তৃক ঐ মন্দিরের চূড়া ধ্বংস হইয়া যায় তখন পূর্বোক্ত ঘোষ মহাশয় বর্তমান মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দেন । এইরূপে মন্দির তিনটি নির্মিত হইয়াছে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

৯১ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির পর—

ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবের পরদিবস দশমী তিথিতে বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মথুরাতে যাইয়া ভূতেশ্বর মহাদেব ও পাতাল-দেবীকে দর্শন করিয়া তথায় সেইদিন অবস্থিতি করিতে হয় । পর দিবস প্রাতে যাত্রিগণ মধুবনে গমন করেন ; এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মধু দৈত্যকে বধ করায় ইহার নাম মধুবন হইয়াছে । মধুবন দর্শনান্তে ধ্রুবটীলা দর্শন করিয়া তালবনে যাইতে হয় । শ্রীকৃষ্ণ-এজ বলরাম এই বনে ধেনুকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন । যাত্রিগণ এই স্থান দর্শন করিয়া কুমুদবন দর্শনানন্তর পুনরায় মধুবনে আসিয়া থাকেন । তৎপর দিবস সন্তনকুণ্ড দেখিয়া বহুলা বনে যাইতে হয় । শ্রীকৃষ্ণ বহুলা নাম্নী গাভীকে হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । পর দিবস যাত্রিগণ রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া তথায় রজনী যাপনান্তে কুসুম সরোবর, মানসী গঙ্গা, চন্দ্র সরোবর দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন যাইয়া রাত্রি বাস করেন । পর দিবস লাঠাবন যাইয়া থাকিতে হয়, যাত্রিগণ লাঠাবন হইতে কাম্যবনে যাইয়া দুইরাত্রি বিশ্রাম করেন, এইস্থানে অনেকগুলি দর্শনীয় আছে—যথা, সেতুবন্ধ, লুকলুকীকুণ্ড, ছোটচরণ পাহাড়ি, পিছলি শিলা, ভোমাসুরের গুম্ফা এবং ভোজনস্থালী ইত্যাদি । এই স্থানে যাত্রিগণ যথাসাধ্য ব্যয়ে সাধু-ভোজন করাইয়া থাকেন । তৎপর শ্রীরাধা-রাণীর পিত্রালয় বর্ষানগ্রামে যাইতে হয়, পথি মধ্যে কদমখণ্ডি, আলুতা পাহাড়ী, দোহনকুণ্ড দর্শন করিয়া যাইতে হয় । পরদিবস সঙ্কেত বট, কৃষ্ণকুণ্ড, বিহ্বলকুণ্ড, ঘোলমহন, ঝাউবনের হাউ

ତୀର୍ଥ-କାହିନୀ ।

ଦର୍ଶନ କରିয়া ନନ୍ଦଗ୍ରାମେ ଯାହା ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନାନ୍ତେ
ଜାବଟେ ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଦର୍ଶନ କରିয়া ପୁନରାୟ ନନ୍ଦଗ୍ରାମେ ଆସିয়া ରାତ୍ରି-
ବାସ କରିତେ ହୁଏ । ପରଦିବସ ପାବନ ସରୋବରେ ସ୍ନାନାନ୍ତେ ଚରଣମାହାଡ଼ୀ
ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣଚିହ୍ନ ଦର୍ଶନାନ୍ତେ ଶେଷାୟୀ ଯାହା ଥାକେନ ।
ତତ୍ପର ସେରଗଡ଼େ ବଳଦେବକୁଣ୍ଡେ ଯାହା ରାତ୍ରିବାସ କରିତେ ହୁଏ ।
ତଥା ହୁଏତେ ରଘୁନା ହୁଏତେ ଅଙ୍ଗୁର ବଟ, ବଜ୍ର ହରଣେର ଘାଟ ଦର୍ଶନ କରିয়া
ନନ୍ଦଘାଟେ ଯାହା ଥାକିତେ ହୁଏ । ପରଦିବସ ପ୍ରାତେ ଯମୁନା ପାର ହୁଏତେ
ଭଦ୍ରବନ, ଯାଠବନ, ବେଳବନ, ଯାନସରୋବର ଦର୍ଶନ କରିয়া ପାନିଗ୍ରାମେ
ଯାହା ଥାକିତେ ହୁଏ । ପ୍ରାତେ ସେ ସ୍ଥାନ ହୁଏତେ ରଘୁନା ହୁଏତେ ପ୍ରାଚୀନ
ଗୋକୁଳ ମହାବନେ ଯାହା ଥାକିତେ ହୁଏ । ପରଦିବସ ପୁନରାୟ ମଥୁରାର
ଆସିଆ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ, କଂସଟିଳା, କଂସକାରାଗାର, ଶ୍ରବଣିଳା, ସାରକା-
ନାଥଜି ଦର୍ଶନ କରତଃ ଯାତ୍ରିଗଣ ଚୌରାଶୀ କ୍ରୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମଣ
ଶେଷ କରିଆ ଥାକେନ ।

ভ্রম সংশোধন ।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০০	৪	পিতয়া	পিতয়া
১০৯	৮	বৈক্ষুঃ	স্থাতাঃ
১০৯	১৪	দূরস্ত্যাজ্যঃ	দূরাস্ত্যাজ্যঃ
১৬৩	৩	মায়রপুরী	মায়াপুরী
১৬৭	৭।৮	এই স্থান হইতে জালামুখী যাওয়া যায় হইতে নামিয়া যাইতে হয় ।	এই অংশ বাদ দিয়া পড়িতে হয় ।
১৮১	১৬	তাং স্থানং	তং স্থানং
১৮৭	৭	উদ্ধৃত্য	উদ্ধৃত্য
১৮৭	৯	সিংহ	সিংহং
১৮৭	১২	প্রয়াগি	প্রয়াগি
১৮৭	১৩	সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে	সাক্ষাৎদেবাবতিষ্ঠতে
১৯৩	৫	ব্রহ্ম স্বরূপং আননং পশু	ব্রহ্মস্বরূপং দ্ব্যামপশ্যান্নিজ
১৯৩	১৩	গুর্বাঙ্গনা	গুর্বাঙ্গনা
২০৩	১৫	চিস্তাহ	চিস্তাই
২২০	৮	ভাক্ত	ভক্তি
২৪৪	১৯	ইন্দ্রদ্যয়ে	ইন্দ্রদ্যাম্বে
২৫৫	৭	কাছবৎ	কচ্ছবৎ

ভ্রম সংশোধন ।

পত্রাঙ্ক	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৩	১-২	আমাদের অদেশমত সকল কার্যেই সাহায্য করিয়াছিলেন। শৌচাদি কার্য সকল সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম ।	আমরা তাঁহার আদেশমত শৌচাদি কার্য সকল সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম ।
২৮২	২০	সপ্তপদ	সপ্তপদ
২৮১	১২	ধনুস্তীর্ণ	ধনুস্তীর্ণ
২৮৫	১২	রামনাথ যাইয়া	রামনাথের মন্দিরে যাইয়া ।
৩১২	১৪	এবং সত্যকথা বলিতে যেন,	এবং সত্যকথা বলিতে কি যেন
৩১৩	১০	টিকিট লইয়া	টিকিট কিনিয়া লইয়া
৩১৪	১০	জ্যোতির্লিঙ্গ	জ্যোতির্লিঙ্গ ।
৩১৭	১৬	আনিয়া	আসিয়া
৩২৩	৪	তাহার	তাঁহার
৩২৭	৩	শ্রীশ্রীওঁকারেশ্বর	শ্রীশ্রীওঁকারেশ্বর ।
৩২৭	৮	ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে
৩৩০	১	দ্বিতীয়া চ	দ্বিতীয়া
৩৩৩	১	ছলনা	ছিল না ।
৩৩৩	১৫	ফিরিয়া ন	ফিরিয়া যান ।
৩৩৩	৪	সমিভিব্যাহারে	সমভিব্যাহারে ।
৩৩১	২	হৃদ পীঠ মনুজমং	হৃদ পীঠঞ্চ মৃতমং

তীর্থ-কাহিনী ।

গঙ্গাতীর্থ ।

গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি ।

নান্যদ্রুতং শিবরাত্রি সমং তথাস্তি ॥

(শিবরহস্তে)

কৃতেতু পুষ্করং তীর্থং ত্রেতায়াং নৈমিষস্তথা ।

দ্বাপরেতু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাপ্রয়েৎ ॥

(পাণ্ডে)

দর্শনাবগাহন ফলং ।

দৃষ্টাতু হরতে পাপং স্পৃষ্টাতু ত্রিদিবং নয়েৎ ।

প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদাত্তবগাহিতা ॥

যৎফলং জায়তে পুংসাং দর্শনাৎ পরমাত্মনঃ ।

তদ্ববেদেব গঙ্গায়া দর্শনে ভক্তিভাবতঃ ॥

যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গা স কৃদ্ভক্ত্যবগাহিতা ।

তেষাং কুলান্নাং লক্ষন্তু ভবান্তারয়তে শিবা ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

অনেকজন্মসমুত্তং পাপং পুংসাং প্রণশ্যতি ।
স্নানমাত্রেন গঙ্গায়াং সদ্যঃ পুণ্যস্য ভাজনং ॥
স্নানন্তু ভক্ত্যা গঙ্গায়াং কৰ্ত্তুকামস্য গচ্ছতঃ ।
পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলং মৰ্ত্যস্য জায়তে ॥
যে গচ্ছন্তি স্বতোগঙ্গাং, পরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে ।
ইহ তে সৰ্বভোগানামন্তে জ্ঞানস্য ভাজনং ॥
গণ্ডুষমাত্রপানেন অশ্বমেধফলং লভেৎ ।
স্বচ্ছন্দং যঃ পিবেদপস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্তথ যামুনং ।
নাস্মদং দশভিস্মাসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীৰ্য্যতি ॥
নাভ্যন্তর্গততোয়ানাং মৃতানাং কাপি দেহিনাং ।
তত্তত্তীর্থফলপ্রাপ্তির্নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥

অর্থ

ত্রিভুবনে গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, ব্রতের মধ্যে শিব রাত্রি সমান
অন্য ব্রত নাই । শিবরহস্তে ইহা লিখিত আছে । পদ্মপুরাণ প্রভৃতি
গ্রন্থে লিখিত আছে—সত্যযুগে পুষ্করতীর্থকে আশ্রয় করিবে ;
ত্রেতাযুগে নৈমিষারণ্যতীর্থকে আশ্রয় করিবে ; দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র
তীর্থকে আশ্রয় করিবে ; কলিযুগে গঙ্গাতীর্থকে আশ্রয় করিবে ।
গঙ্গাদর্শনে পাপনাশ, স্পর্শনে স্বর্গবাস ; প্রসঙ্গ (ভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে

গঙ্গାভীর্থ ।

অর্থাৎ ক্রয়, বিক্রয় বাণিজ্যার্থ, প্রভুর সেবার্থ ইত্যাদি) ক্রমেও যে গঙ্গায় অবগাহন করে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যেমন অনিচ্ছায় অনলস্পর্শে দগ্ধ হইয়া থাকে সেইরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বে গঙ্গাস্নানে সঞ্চিত পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু গঙ্গাকে সামান্য নদীর স্থায় জ্ঞান না করিয়া পাপহারিণী পুণ্যসলিলা, সূর্য্যতুল্য পরম জ্যোতিঃস্বরূপা জ্ঞান থাকা চাই। পরমাত্মা দর্শনে যে ফল হয় ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাদর্শনেও সেই ফল হয়। যে সকল মনুষ্য ভক্তি-পূর্ব্বক পুণ্যবাহিনী গঙ্গাতে একবার মাত্রও অবগাহন করেন গঙ্গা সেই সকল মনুষ্যের লক্ষসংখ্যক কুল ও ভবভয় হইতে উদ্ধার করেন। গঙ্গাতে স্নানমাত্র মনুষ্যমাত্রেরই তৎক্ষণাৎ পুণ্যভাগী হয় এবং তাহার অনেক জন্মসমুত্ত পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। ভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি গঙ্গায় স্নান নিমিত্ত গমন করেন তাঁহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান জন্ত গমন করেন অথবা যিনি গঙ্গাস্নান জন্ত অত্নকে প্রেরণ করেন, এই উভয়েই ইহলোকে নানাবিধ অভিলষিত ভোগ লাভ করিয়া পরলোকে মোক্ষভাগী হন। গণ্ডুষমাত্র গঙ্গাজলপানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়; যে স্বচ্ছন্দ গঙ্গাজল পান করে তাহার মুক্তি করতলগতা হয়। সরস্বতী জল তিন মাসে জীর্ণ হয়, যমুনা জল সপ্তম মাসে, নর্ম্মদার জল দশম মাসে আর গঙ্গাজল এক বৎসরে জীর্ণ হয়। নাভী-মধ্যগত তীর্থজল থাকিতে যে ব্যক্তি মৃত হয় সে ব্যক্তি সেই তীর্থ ফল প্রাপ্ত হয়। অপিচ কাশীখণ্ড, ক্রিয়া যোগসার, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদিতে গঙ্গামাহাত্ম্য্য সবিস্তাররূপে আরও বর্ণিত হইয়াছে। সকল

তীর্থ-কাহিনী ।

সংস্কৃত লেখায় পুস্তক বিস্তৃত হয় সেইজন্য কথঞ্চিৎ সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি । গঙ্গাতীর্থে সকল সময়ই শুভকাল, সমস্ত ক্ষেত্রই পবিত্র স্থান এবং সমস্ত ব্যক্তিই দানের যোগ্যপাত্র । গঙ্গায় তিথি নক্ষত্রাদি নিমিত্তের আবশ্যক হয় না ; যে কোন সময়ে গঙ্গান্নান করিলেই সঞ্চিত পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয় । গঙ্গাতীরে ঘৃত, মধু ও তিলসংযুক্ত পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গবাস এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণের মুক্তি হইয়া থাকে । ঐ পিণ্ডস্থ তিলসংখ্যক সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গত পিতৃগণ স্বর্গবাসী হইয়া থাকেন । গঙ্গার পবিত্র সলিলে যে কোন প্রকারে যে কোন মৃত প্রাণীর অস্থি-পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার স্বর্গলাভ হইবে । পুণ্যহীন মহাপাপী আত্মঘাতী ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় পতিত হইলেও তাহার আত্মা স্বর্গস্থ হইবে ; অধিক কি, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিভাবে বিধিপূর্বক গঙ্গান্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ হইতেও মুক্তি অবশ্যস্বাধী ; অস্ত্রাঘাতপাতকীর ত কথাই নাই । ষড়্, দান, তপ, জপ, শ্রদ্ধ, দেবপূজা প্রভৃতি গঙ্গাতীরে যাহাই কৃত হউক, সে সমস্ত কার্যেরই কোটি কোটি গুণ ফল লাভ হয় । ষড়্ দানাদি জন্ত সকল পুণ্যই সুলভ আর সতিল গঙ্গাজলদ্বারা পিতৃতর্পণ অতীব দুর্লভ ।

গঙ্গা বিষ্ণুপাদোজ্জ সন্তুতা । গঙ্গার স্বর্গবাহিতাংশের নাম মন্দাকিনী । পুণ্যতপা ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে আনীতা গঙ্গার নাম ভাগীরথী । এবং পাতালবাহিনী গঙ্গার নাম ভোগবতী । ভাগীরথী গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখ ঈশিক স্থান হইতে বহির্গতা হইয়া হরিদ্বার

গঙ্গাতীর্থ।

দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া সাগরের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। যেখানে গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন ঐ স্থানকে সাগর-সঙ্গম বলে। গোমুখ পর্বত হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৭৮০ ক্রোশ। এই সুদীর্ঘ স্থানের মধ্যে তিনটি স্থানের বিশেষ প্রশংসা পুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা :—

“সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু হ্রলভা।

হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে ॥”

অর্থাৎ গঙ্গা সর্বত্রই সুলভ কেবল তিনটি স্থানেই অতি হ্রলভ। হরিদ্বারে, প্রয়াগে আর সাগরসঙ্গমে। এই তিন স্থানের মাহাত্ম্য যথাস্থানে লিখিত হইবে।

বঙ্গের পূর্বোত্তর অঞ্চলের গঙ্গাতীর্থযাত্রী সকল খুলট বা রাস উপলক্ষে নবদ্বীপ কিম্বা শাস্তিপুর যাইয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ, নৈহাটি, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে যে কোন সময়ে গঙ্গাস্নান হইতে পারে। ঐ সকল স্থানে যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট নাই; ব্যয়ও সামান্য। থাকিবার জন্ত বাসা ও খাদ্যদ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

গঙ্গাতীর্থে স্নান, তর্পণ, পার্শ্বশ্রাদ্ধ, গঙ্গাপূজা, ব্রাহ্মণভোজন প্রধান কার্য্য; ইহা ভিন্ন দানাদিও প্রশস্ত। যাহার যে মত শক্তি তিনি তাহাই করিবেন। স্নান, তর্পণ, পার্শ্বশ্রাদ্ধ যাত্রীমাত্রেরই অবশ্য করণীয়।

কালীঘাট ।

নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপদাঙ্গুলিষুচ ।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা ॥
কলৌ কালীং বিহায়াথ যঃ কশ্চিন্মোক্ষমিচ্ছতি ।
তৃষিতো জাহ্নবীং ত্যক্ত্বা কূপং খনতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥

অর্থাৎ কালীপীঠে নকুলীশ নামে ভৈরব অবস্থিত । সতীর (১) দক্ষিণ চরণের চারিটা অঙ্গুলি পতিত হয় । তাহাতেই এই কালিকা-দেবী ও নকুলীশ ভৈরবের উৎপত্তি হয় (২) । এই কালিকাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী । কলিকালে কালিকাদেবীকে পরিত্যাগ করতঃ যে মানব মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই দুৰ্ম্মতি মনুষ্য তৃষিত হইয়া গঙ্গা পরিত্যাগপূর্ব্বক কূপ খননে প্রবৃত্ত হয় মাত্র । কলিকাতা ভারত-

(১) দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেন, তাহাতে সৃষ্টির লয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া নারায়ণ চক্র দ্বারা তাহা থণ্ড থণ্ড করেন ; ঐ ছিন্ন দেহাংশে একান্নগী পীঠের উৎপত্তি হয় ।

(২) সাধারণে বলেন কালীঘাটে দেবীর মুখপদ্ম পতিত হয় ; কিন্তু তাহা ভুল । পীঠমালা দেখিলেই সে ভ্রম দূর হইবে । যে কালীঘাটে দেবীর মুখপদ্ম পতিত হয় সেস্থান কাটোয়ার নিকট । তথায় পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়দুর্গা ও ক্রোধীশ ভৈরব বিদ্যমান আছেন ।

কালীঘাট ।

বর্ষের রাজধানী (৩) । এই মহানগরী ইংরেজরাজ কর্তৃক স্থাপিত । দেড়শত বৎসর পূর্বে এই স্থানের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল । তখন অধুনাতন সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য কিছুই ছিল না । এক্ষণে নিয়তই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । ইহার যেরূপ সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য ভারতের কুত্রাপি সেরূপ সহর দৃষ্ট হয় না ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একদল ইংরেজ বণিক ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এখানে বাণিজ্য করিতে আইসেন । ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট যব চার্লস সাহেবের সহিত মুশাদ্দাবাদের নবাবের হুগলিহু ফৌজদারের বিবাদ হওয়ায় উক্ত কোম্পানী সুতানুটিতে একটি কুঠী নির্মাণ করেন । সেই হইতেই কলিকাতার সূত্রপাত হয় ।

পুরাণে কালীঘাটের নাম কালীক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত । বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান কালীক্ষেত্র । বহুলাকে এক্ষণে বেহালা বলে । দক্ষিণেশ্বর অদ্যাপি বর্তমান আছে । আইন আকবরীতে এই কলিকাতার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । বল্লাল সেনের জীবনীতেও এই স্থানের নাম কলিকাতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; ফলতঃ সহরটী নূতন হইলেও নামটী নূতন নহে । ইংরেজ অধিকারে কালীক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক অংশ কালীঘাট নামে এবং অপর বর্দ্ধিত অংশ কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ফলতঃ কালীক্ষেত্র হইতেই

(৩) ইংরেজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

যে কলিকাতা (Calcutta) নাম উদ্ভূত হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই (১) ।

কথিত আছে এই বিগ্রহ বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের স্থাপিত । তখন দেবীর আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান হইত না । তজ্জন্ত তাঁহারা দেবীর ও মন্দিরের স্বত্ব-স্বামিত্ব পুজারি হালদারদিগকে দান করেন । অধুন! আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার হালদার মহাশয়েরা জমিদার হইয়া উঠিয়াছেন ।

এই স্থানে যাত্রীদিগের প্রধান কার্য্য গঙ্গান্নান, কালীপীঠ ও নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন এবং পূজা । যাহার যেমত ইচ্ছা তিনি তদনুরূপ পূজা দিতে পারেন । কেহ ষোড়শোপচার, কেহ দশোপচার, কেহ বা পঞ্চোপচার দ্বারা মায়ের পূজা দিয়া থাকেন । কেহ সুধু বলি কিম্বা ভোগ দিয়া থাকেন । নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ডালা প্রদান করিয়া থাকেন । ঐ ডালার মূল্য পাঁচ পয়সা পাত্র । স্থানীয় দোকানীদের নিকট ঐ ডালা প্রস্তুত পাওয়া যায় । যে যাত্রী বিধানানুসারে পূজা বা ভোগ দিবেন, তিনি পূজোপকরণ ও ভোগের দ্রব্য সমুদয় পূজক ব্রাহ্মণ হালদারদের নিকট দক্ষিণার সহিত গচ্ছিত করিবেন ; তিনি তদ্বারা মাকে যথাবিহিত পূজা ও ভোগ দিয়া যাত্রীদিগকে প্রসাদ ও নির্ম্মালা প্রদান করেন (২) ।

(১) কলিকাতার নামকরণ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত ; বাহুল্যভয়ে সেগুলি লিখিত হইল না ।

(২) যাত্রী যথোপযুক্ত পূজোপকরণ যথারীতি দক্ষিণাশ্রুতি পুজারি মহাশয়ের

কালীঘাট ।

এই কালিকা দেবীর মন্দিরের অনতিদূরেই ভৈরব নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত । তাহাকেও দর্শন ও যথাবিধি পূজা করা কর্তব্য ।

মায়ের প্রসাদাৎ বহুতর দুঃখী লোক প্রতিপালিত হইতেছে । যাত্রিগণ উহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন এবং কুমারী কস্তাদিগকেও কিছু কিছু দান করা কর্তব্য ।

কালীঘাটের যাত্রিগণের বাসস্থানের অসুবিধা নাই । দোকানদারদের দোকান গৃহের পশ্চাতেই যাত্রী থাকিবার গৃহ আছে । প্রত্যেক যাত্রী, দৈনিক এক পয়সা হিসাবে গৃহের ভাড়া দিলেই থাকিবার ও রন্ধনাদির স্থান পাইয়া থাকে । গঙ্গা অতি নিকট ; জলাদি আনিবার কি রন্ধনাদি করিবার অনুষ্ঠান নিজে করিতে না পারিলে চাকরানী দ্বারা হইতে পারে । প্রত্যেক বাসাতেই চাকরানী উপস্থিত থাকে । তাহাকে দুইটা পয়সা দিলে সমস্ত জোগাড় করিয়া দেয় । নিকটেই বাজার, তাহাতে তরকারী, শাকসব্জি, ফল মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ।

নিকট গচ্ছিত করিলে, পূজারী প্রভু পূজার দ্রব্যগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে কালীমাতার চন্দ্রলিঙ্গের গোচর করাইয়া তাহার বার আনা নিজ দস্তে ও অবশিষ্ট সিকি অংশ যাত্রীকে কিঞ্চিৎ ফল বিম্বপত্র সহিত প্রত্যর্পণ করিয়া প্রতিনিধির গুরুতর দায়িত্ব হইতে স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করেন ।

কিরীটেশ্বরী ।

ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ ।

দেবতা বিমলানাম্নী সংবর্ত্তো ভৈরবস্তথা ॥

(পীঠমালা)

অর্থাৎ

কিরীটদেশে সতীর কিরীট পতিত হয়, একত্র তথায় সিদ্ধি-
রূপিণী ভুবনেশ্বরী বিমলানাম্নী দেবী এবং সংবর্ত্ত নামক ভৈরব
বিরাজিত আছেন ।

এইস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, গঙ্গা নদীর তীরস্থ ডাহা-
পাড়া গ্রাম হইতে পশ্চিমে তিন মাইল দূরে অবস্থিত । প্রশস্ত
পথে পদব্রজে বা গোলকটে যাওয়া যায় ।

হাওড়া হইতে—আজিমগঞ্জ ষ্টেশন ১৭২ মাইল, ভাড়া ২১৫
পাই । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে লুপ্লাইন থারু জংসন হইয়া নলহাটা
জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ ব্রাহ্ম লাইনে আজিমগঞ্জ নামিতে
হয় । আমরা মুর্শিদাবাদ চকের ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া ডাহাপাড়া
হইতে সড়ক পথে পদব্রজে তিন মাইল গমন করিয়া পীঠস্থান প্রাপ্ত
হইলাম । মায়ের মন্দিরটী জনশূন্য অরণ্য মধ্যে । এখানে অনেক
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । দীঘি, পুষ্কর্ণী জল
শূন্য । কেবল মায়ের জীর্ণ মন্দিরটী কোনরূপে দণ্ডায়মান আছে ।
পূর্বে এখানে বহু লোকের বসতি ছিল ; তাহা নিদর্শন অদ্যাবধি

কিরীটেখরী ।

বর্তমান আছে । কালের কুটিল গতিতে এখন জনহীন—অরণ্যময় । স্থানের এইরূপ অবস্থা হওয়ায় মায়ের সেবাইতগণ মন্দিরের কিয়দূরে মায়ের প্রতিনিধি স্বরূপিণী এক মূর্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরে যাতায়াতের কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন ।

আমরা মন্দির সমীপে উপনীত হইলে জনৈক ব্রাহ্মণ গ্রাম হইতে আসিয়া মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিলেন । মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিলাময় কিরীটাক্রিত পীঠ দর্শন করিলাম ; কিন্তু তেমন প্রীতिलाভ করিতে পারিলাম না । কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর প্রকাশ করিলেন কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলেই মায়ের অপূর্ব সিদ্ধার (শৃঙ্গার) মূর্তি দর্শন করা যায় । আমরা সকলেই তত্বাকো সম্মতি প্রদান করিয়া যাত্রিগণ মধ্য হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা মায়ের পূজার জন্য উক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে দিলাম । তিনি অর্থ পাইয়া সত্বর বাড়ী গিয়া সিদ্ধারের সাজ সরঞ্জাম ও পূজোপকরণ লইয়া আসিলেন এবং মন্দিরে প্রবেশ পুরঃসর দ্বার রোধ করিয়া মাকে সিদ্ধার বেশে সজ্জিত করতঃ দ্বার খুলিলেন । তখন মায়ের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া যাত্রিগণ সকলেই মুগ্ধপ্রায় হইয়া, পুলকিতাস্তঃকরণে ভক্তিভরে নতশিরে প্রণাম করিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন । মায়ের রজতময় মুখারবিন্দ হইতে এক অতু্যজ্জ্বল জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সর্বাত্ম জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিল । মায়ের অঙ্গে কোথায়ও মণি, মুক্তা, হীরকাদি কিছুই নাই ; অথচ উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হইল না । যাত্রিগণ সকলেই এইরূপ জ্যোতিঃ-

তীর্থ-কাহিনী ।

শ্রম বিভূতি দর্শনে বিষয় বিস্ফারিত লোচনে মন্দির মধ্যে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিল । কিন্তু জ্যোতিঃ দর্শনের কারণ কিছুই অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিল । এ রহস্য ভেদ কিছুতেই হইল না । ঠাকুর যথারীতি পূজা করিয়া প্রসাদ নির্মাণ্য প্রতি যাত্রীর হস্তে প্রদান করতঃ আশীর্বাদ করিলেন ।

এই পীঠাধিষ্ঠাতা দেবতা ভৈরবের নাম সম্বন্ধ । তাঁহার দর্শন ইচ্ছা করায় ঠাকুর একটা স্থান মাত্রই দর্শন করাইয়া বলিলেন ইনি এইস্থানে গুপ্ত আছেন, কেহই ইঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই । ৬ মহারাজ রামকৃষ্ণ এইস্থানে আসিয়া তপস্বী করিয়াছিলেন । তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন অদ্যাপি বর্তমান আছে । এক্ষণে ঐ সকল স্থানের ধ্বংসাবশেষ মাত্রই দৃষ্ট হয় । পূর্বে এখানে ঐশ্বর্য্য সম্পদ অতুলনীয় ছিল ; অনেক বিগ্রহ ও দেবমন্দির ছিল । এক্ষণে তাহার চিত্তস্বরূপ কেবল পুরাতন মন্দির ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র পূর্ব সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছে । বিষন্ন মনে সেই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল ।

এইস্থান হইতে কিছু ব্যবধানে গ্রামের মধ্যে সেবাইত ঠাকুরের বাড়ীতে মায়ের যে প্রতিমূর্তি স্থাপিতা আছেন তাহাও দর্শন করিলাম । এইস্থানে হাট বাজার নাই, কাজেই খাদ্যাদি পাইবার বা যাত্রী থাকিবার কোন সুবিধা নাই । সুতরাং অনাহারে আমরাগকে ফিরিয়া আসিতে হইল । সন্ধ্যার সময় জিয়াগঞ্জের বাসায় পৌঁছিয়া আশ্বাসাদি করিলাম ।

কিরীটেশ্বরী ।

বীরভূমে অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে । নলাটেশ্বরী, তারাপুর, নন্দীকেশ্বর, অটুহাস প্রভৃতি । কেহ কেহ বলেন তারাপুর সিদ্ধপীঠ ; কেহ বলেন একান্নপীঠের অন্তর্গত । কিন্তু পীঠমালায় তারাপুরের কোনই উল্লেখ নাই । প্রবাদ আছে ইনি সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদা, এখনও ছুই একজন সাধককে তথায় দেখা যায় ।

সে যাহা হউক । আমাদিগের মনে তারা মাকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রবল হইল । আমরা নলহাটী হইয়া নলাটেশ্বরী দর্শন করতঃ অভীষ্ট স্থানে রওয়ানা হইব ইহাই পরামর্শ করিলাম । পরদিন রাত্রিকালে রেলযোগে নলহাটী রওয়ানা হইলাম ।



নলাটেশ্বরী ।

নলহটাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা ।

তত্র সা কালিকাদেবী সৰ্বসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥

(পীঠমালা)

অর্থাৎ

বিষ্ণুচক্রে চিত্র হইয়া দেবীর নলা (নলী) নলহাটীতে পতিত হয়, তাহাতে যোগীশ ভৈরব এবং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী দেবীর নাম কালিকা ।

এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটী গ্রামে ।
তন্নামেই রেলওয়ে ষ্টেশন ।

হাওড়া হইতে—নলহাটী ষ্টেশন ১৪৫ মাইল ভাড়া ১৮০ আনা । খানুজংসনে গাড়ী পরিবর্তন করত লুপ্লাইনে নলহাটীতে পৌঁছিতে হয় । আজিমগঞ্জ হইতে—নলহাটী ভাড়া ১১০ আনা । ষ্টেশন হইতে পশ্চিমদিকে এক মাইল ব্যবধানে প্রশস্ত পথে পদ-ব্রজে যাইতে হয় ।

আমরা রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় নলহাটী ষ্টেশনে নামিলাম । অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ষ্টেশনেই বসিয়া কাটাইলাম । প্রাতে রওয়ানা হইয়া এক মাইল যাইয়াই মাঝের বাড়ী পাইলাম । দেবীর মন্দিরটী ইষ্টকনির্মিত, অল্লোচ্চ—পর্বতোপরি স্থাপিত । দ্বার বন্ধ, কাজেই তখন দর্শন হইল না । এই স্থানটী গ্রামের প্রান্ত ভাগে ; চতু-

নলাটেধরী ।

দিকেই বেশ পরিষ্কার । পুরীর প্রান্তভাগে একটি প্রশস্ত জলাশয়, ইষ্টক দ্বারা একটি ঘাট বাঁধান আছে, জল অতি স্বচ্ছ । আমরা তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নানাহিক প্রভৃতি নিত্যকৃত্য শেষ করিয়া দেবীর দর্শনার্থ পুরোদ্বারে উপবিষ্ট রহিলাম । দেবীর সেবা-পূজার নিমিত্ত নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি আছে । এতদ্বারা দেবীর সেবার কার্য সুসম্পন্ন হয় । এতদ্ব্যতীত সময় সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের এবং সমাগত যাত্রীগণের প্রদত্ত মানসিক ও পূজায় কিঞ্চিৎ আয় হইয়া থাকে । দেবীর পরিচারকগণের জায়গীর আছে । তাঁহারা যথাকালে বাহার যে কার্য তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন । আমরা বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে পূজোপকরণ লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসিয়া পুরোদ্বার উন্মোচন করিলেন এবং মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্বক মন্দির মার্জনা করিয়া পূজোপকরণ রাখিয়া গেলেন । এই স্তম্ভভাগে আমরাও পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । সম্মুখেই দেবীর মন্দির ; তৎপার্শ্বেই ভোগ মন্দির ; দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত দ্বিতল যাত্রীনিবাস । আমরা সেই সকল দেখিতেছি, ইতিমধ্যে অন্ত এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবীর বসনাবরণ মোচন পূর্বক স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প, মালা দ্বারা ভূষিতা করিয়া দিলেন । পূজক ঠাকুর পূজা করিতে বসিলেন ; জনৈক ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন । এদিকে পাকশালায় পাকের যোগাড় হইতে লাগিল । কেহ চাউল-দাইল লইয়া আসিল, কেহ হাঁড়ী-খড়ি, তরী-তরকারী আনিল ; এইরূপে ৭৮ জন লোকে আয়োজন করিয়া দিল । আমি

তীর্থ-কাহিনী ।

মন্দিরে প্রবেশপূর্বক দেবীর নিকটস্থ হইয়া দর্শন করিতে লাগিলাম । দেখিলাম দেবী পাষণময়ী কালিকামূর্তি । মন্দির মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রের যাইবার অধিকার নাই ।

আমরা দর্শন করিতেছি, এমন সময় ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা সমারোহে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মানসিক প্রদান করিলেন । আমরাও যাত্রিগণ মধ্য হইতে কিছু কিছু অর্থ উঠাইয়া দেবীর পূজার্থ পূজকের নিকট দিলাম ।

এই দেবীর বাড়ীর বাহিরে অপ্রশস্ত আবর্জনাপূর্ণ একটা মন্দির মধ্যে যোগীশ ভৈরব বিরাজিত । ভৈরবের বাসস্থান উপযুক্তই হইয়াছে ; কেননা যোগীর আশ্রম অপরিষ্কার শ্মশান ; এমন্দিরটাও ততোধিক । যোগী বলিয়াই বুঝি ইঁহার এত হতাদর । যাত্রিগণ যদি কেহ দয়া করিয়া একটু জল বিল্বপত্র দিলেন তবেই ; নচেৎ উপবাসেই থাকিতে হয় ।

এতদ্ভিন্ন এখানে দর্শনীয় অল্প কোন দেবতা নাই । স্থানীয় লোকের বসতি অতি কম । ষ্টেশনের ধারে একটা বাজার আছে, আহাৰ্য্য বস্তু যা কিছু তথা হইতেই খরিদ করিয়া আনিতে হয় । জল-হাওয়া মন্দ নহে, সময় সময় অনেকে হাওয়া পরিবর্তন জন্য এখানে আসিয়া থাকেন ।

আমরা দেবীর আঙ্গিনার এক পাশ্বে পাকাদির অন্নুষ্ঠান করিয়া আহাৰ্য্যান্তে ষ্টেশনে আসিয়া অপরাহ্ন ছইটার গাড়ীতে রওনা হইয়া চারিটার সময় রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিলাম । উদ্দেশ্য তারাপুরে তারা মাকে দর্শন করা ।

তারা মা ।

বক্রেশ্বরস্ত ঐশান্যং বৈদ্যনাথস্তপূর্বতঃ ।
দ্বারকায়াঃ পূর্বভাগে যত্র তারা শিলাময়ী ।

* * *
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী ।

* * *
তারাপুরং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা ।
লক্ষত্রয়ং জপাদেব সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
ঈশানে চক্রনাথস্ত বৈদ্যনাথস্ত পূর্বতঃ ।
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভূবি দুর্লভং ॥

(তারাহস্তে)

অর্থঃ

বক্রেশ্বর, ভৈরবের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ শিবের পূর্বে,
দ্বারকা নদীর পূর্ব তীরে শিলাময়ী তারাদেবী অবস্থিতা । এই
দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম তারাপুর ।

বশিষ্ঠদেব যে তারার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন সেই তারাদেবী শিলাময়ী ।

তীর্থ-কাহিনী ।

তারারহস্তে তারাপুর মহাপীঠ* বলিয়া উল্লিখিত আছে কিন্তু পীঠমালায় ইহার কোনই উল্লেখ নাই । ইনি বশিষ্ঠ উপাসিতা সিদ্ধপীঠ তাহাতে কোন সংশয় নাই । যে ব্যক্তি তারাপুর গমন-করতঃ যত্নপূর্বক তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করেন তাহার সমস্ত সিদ্ধ হয় । চক্রনাথ (বক্রেশ্বর) শিবের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ শিবের পূর্বভাগে তারাপুর নামে বিখ্যাত স্থান, পৃথিবীতে এই স্থান অতি দুর্লভ ।

হাওড়া হইতে—রামপুরহাট ষ্টেশন ভাড়া ১।০ টাকা । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল খামুঙ্গংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া লুপ্ লাইনে রামপুরহাট ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয় । আজিমগঞ্জ হইতে রামপুরহাট ষ্টেশন ভাড়া ১।১০ আনা । ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ দূরে তারাপুর । প্রশস্ত রাস্তায় গোলকটে বা পদব্রজে যাওয়া যায় । প্রান্তর মধ্যস্থ সাধারণ পথে অল্প সময় মধ্যে যাওয়া যায় ।

আমরা শীঘ্র পৌঁছিবାର জন্য রামপুরহাট হইতে জনৈক পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া শেষোক্ত পথে চলিলাম । বেলা চারিটার সময় রওনা হইয়া বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রমপূর্বক বড়শান, বেলেগ্রামের মধ্য দিয়া সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতেই প্রসিদ্ধ পুণ্য স্থান তারাপুর প্রাপ্ত হইয়া জনৈক পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলাম । এইস্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ সেবায়তের বসতি । ইহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণী । মায়ের সেবা পূজা করেন বলিয়া সেবায়ত বা পাণ্ডা বলা হয় । গ্রামটি অতি ছোট পল্লী ।

* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।

তার মা ।

মায়ের সেবার জন্ত মহারাজ রামকৃষ্ণ দত্ত দেবোত্তর আছে ।
তদ্বারা দেবীর সেবাপূজা খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয় এবং
সেবায়তগণের সেবাও উত্তমরূপে চলে । এতদ্ব্যতীত সময়
সময় যাত্রীগণের আগমনেও সেবায়তগণের কিছু কিছু লভ্য হয় ।
যাত্রীগণ যে যাহার আশ্রয়ে থাকে তাহার দেয় যাহা কিছু তাহা
সেই আশ্রয়দাতা সেবায়ত পাণ্ডাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । রাত্রি
হওয়ায় তৎকালে আমাদের দর্শন হইলনা । পর দিবস সকালে
মানার্থ দ্বারকা নদীতে উপস্থিত হইলাম । নদটী দেবীর মন্দিরের
অনতি দূরে পশ্চিম দিকে, বালুকাময়, অত্যল্পজল বিশিষ্ট কিন্তু
শ্রোতস্থান । জলের অগভীরতাবশত অবগাহন স্নান করা যায় না ।
ঘটী ভরিয়া জল উঠাইয়া স্নানাদি শেষ করিয়া তারামার মন্দিরে
আসিলাম, তখন দেবীর অঙ্গের বেশভূষা খুলিয়া স্নান করান
হইতেছে, সুতরাং মায়ের পাষণময়ী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা ক্রোড়স্থ
শিশুরূপী মহাদেবকে স্তনদানরতা মূর্তি সুন্দররূপে দর্শন করিলাম ।
মনে মনে ভাবিলাম মা ! তুমি কি আমার মাতামহগণের আরাধ্যা
দেবী ? নেপালদীঘিতে (১) বরদেবরী রূপে বিরাজিতা আছ ?

আমরা সকলে মিলিত হইয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্বক
মায়ের পূজার্থ পাণ্ডা ঠাকুরের হস্তে দিলাম । পূজকেরা সন্তোষের
সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া মায়ের পূজাদি শেষ করিলেন । যাত্রীর

(১) নেপালদীঘি—রাজসাহী জেলার অধীন নাটোর মহকুমা হইতে তিন
মাইল পূর্বে অবস্থিত ।

তীর্থ-কাহিনী ।

দত্ত পূজার কোন বাঁধা নিয়ম নাই । যাত্রীগণের ইচ্ছানুসারে অথবা
পূজা হইয়া থাকে । মাকে দর্শন, স্পর্শন, পূজা, ও প্রণাম করিয়া
বাহিরে আসিলাম ।

এইস্থানের কিঞ্চিৎ ব্যবধানেই মহারাজ রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী
আসন । এই স্থানেই দেবীর আদিস্থান । প্রথমে দেবী এই
স্থানেই ছিলেন । পরে মন্দির গঠন করিয়া দেবীকে আনিয়া
মন্দিরে স্থাপন করা হয় । আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে ধুম-
ধামে মায়ের পূজা হয় । তৎকালে এই স্থানে একটা মেলা হয় ।

এই দেবী জাগ্রতা, এজন্ত শক্তি উপাসকেরা মন্ত্র সিদ্ধির জন্ত
মায়ের উপাসনা উপলক্ষে দেবীর নিকট আসিয়া থাকেন ।
এখনও দুই চারি জন সাধক দৃষ্ট হইল । লোকে বলে ইহারা
সিদ্ধ হইয়াছেন ।

সে যাহা হউক । সিদ্ধ অসিদ্ধ কিছু বিচার করিয়া কাজ
নাই । আমরা দর্শন করিতে আসিয়াছি দর্শন করিয়া বাইব ।
দর্শনীয় অন্য বিশেষ কিছুই নাই ; গ্রামে হাট বাজার নাই, খাদ্যাদিও
ভাল পাওয়া যায় না । সামান্য মুদীর দোকান আছে, তাহাতে
চাউল, দাউল, লবণ, তৈল, হাড়ী, খড়ি পাওয়া যায় । প্রয়োজন
হইলে বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিসসকল রামপুরহাট হইতে আনিতে
হয় । স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নয় ।

আমরা দর্শনাদি শেষ করিয়া বাসায় আসিলাম এবং আহারান্তে
পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত বসিয়া খোসগল্প করিতে লাগিলাম । কথা
প্রসঙ্গে জানিলাম এ প্রদেশে আরও একটা পীঠস্থান আছে ;

গঙ্গাতীর্থ ।

তাহার নাম বক্রেশ্বর । এইস্থানে পাপহরা নামী একটি নদী আছে, তাহার একধারের জল উষ্ণ এবং অপরধারের জল শীতল । এইরূপ আশ্চর্য্য বর্ণনা শুনিয়া আমাদের সকলেরই দর্শনপিপাসা বলবতী হইল ; এত নিকটে আসিয়া বক্রেশ্বর দর্শন না করিয়া ফেরা হইবে না । এই গমন পথে সাঁথিয়া ষ্টেশনে আরও একটি পীঠস্থান দর্শন করা যাইতে পারে ; আমরা এই সকল শুনিয়া তৎকালেই জনৈক পথপ্রদর্শক লইয়া মল্লারপুরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম ।



নন্দিকেশ্বর ।

হারপাতো নন্দিপুৰে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ ।

নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধিৰ্নসংশয়ঃ ॥

(পীঠমালা)

অর্থাৎ

নন্দিপুৰে দেবীর কণ্ঠহার পতিত হয়, তাহাতে ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী । এই পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী সাধকের সিদ্ধিপ্রদায়িনী তাহাতে সংশয় নাই ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লুপ্ লাইনে সাঁথিয়া রেল ষ্টেশনের পার্শ্বেই নন্দিপুৰ গ্রামে এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ।

হাওড়া হইতে সাঁথিয়া ষ্টেশন, ভাড়া—১৫০ টাকা । ই, আই, রেলে লুপ্ লাইনে খানু জংসন হইয়া সাঁথিয়া পৌঁছিতে হয় । মল্লার-পুৰ হইতে সাঁথিয়া ভাড়া ৮০ আনা । সাঁথিয়া ষ্টেশনই নন্দিকেশ্বরের ষ্টেশন । ষ্টেশনের পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ।

আমরা মধ্যাহ্নে আহারান্তে দুইটার সময় তারাপুৰ হইতে পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে প্রান্তর মধ্য দিয়া চারি মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক মল্লারপুৰ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম । তথা হইতে গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় সাঁথিয়া ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিলাম । ষ্টেশনের পূর্ব ধারেই পীঠস্থান দৃষ্ট হওয়ায় তথায় যাইয়া সদর দ্বারদেশে উপবেশন করিলাম ।

নন্দিনী-স্থর ।

প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষতলে নন্দিনী পীঠ । এই অশ্বথ বৃক্ষের চতুর্দিকে চারি বিঘা পরিমিত স্থান ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত । দক্ষিণদিকে একটীমাত্র প্রবেশদ্বার ; ঐ দ্বার কাষ্ঠ নির্মিত রেলিং, এবং রজ্জু দ্বারা বদ্ধ । দ্বারদেশে উচ্চ উচ্চ চারিটা স্তম্ভ বিশিষ্ট উন্মুক্ত ছোট ইষ্টকালয়ের মধ্যস্থলে লম্বমান রজ্জু দ্বারা একটা ঘণ্টা ঝুলান আছে ; গৃহে আর কিছুই নাই । এই ঘণ্টা চালনা করিয়া সাড়া দিলাম, জনমানবের কোনই সন্ধান পাইলাম না । আমরা এইস্থানে বসিয়া ভিতরে প্রবেশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম । ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না ; প্রদীপ জ্বালিলাম । লণ্ঠনস্থ প্রদীপ হস্তে করিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম দ্বার রজ্জু দ্বারা বদ্ধ সুতরাং সহজেই দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম । হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলো সাহায্যে চতুর্দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম মন্দিরাদি কিছুই নাই । অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে চন্দ্রাতপতলে বৃক্ষমূলে মৃণ্ময় চতুষ্কোণ বেদিকোপরি বজ্রাচ্ছাদিত দৃষ্ট হইল । ভাবিলাম ইনিই বুঝি মা নন্দিনী দেবী । ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মাকে সামান্য মন্দিরে রাখিলে ব্রহ্মময়ীর বিশ্বব্যাপকত্বের ব্যাঘাত হয় তাই বুঝি মায়ের মন্দির নাই !!!

সে যাহা হউক, আমরা ইহাকেই নন্দিনী দেবী স্থির করিয়া ভক্তিভাবান্বিতচিত্তে প্রণাম করিলাম । বোধ হয় পূজক ব্রাহ্মণ সকাল সকাল সন্ধ্যা আরতি শেষ করতঃ মাকে শয়ন করাইয়া বজ্রাচ্ছাদিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে আচ্ছাদন উন্মোচন

তীর্থ-কাহিনী ।

করিয়। কে আমাদেরকে দেবী দর্শন করায় ? নিদ্রিতাবস্থায় বসনোন্মোচন পূর্বক নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দর্শন করা আমাদের সাহসে কুলাইল না। যেটুকু দর্শন হইল সেই যথেষ্ট এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমাদের সঙ্গীয় জনৈক যাত্রী, দেবীর নিদ্রা ভঙ্গ করতঃ বসনোন্মোচন করিলেন। আচ্ছাদন উন্মুক্ত করার আমাদের দর্শন, স্পর্শন ঘটিল, নচেৎ দর্শন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অসময়ে দেবীকে দর্শনার্থ, বসনোন্মোচন পূর্বক নিদ্রা ভঙ্গ করা শুভ কি অশুভ—তাহা তিনিই জানেন। ফলতঃ যিনি বসনোন্মোচন করিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয় প্রণয়িনী-সহধর্ম্মিনীটী সুস্থদেহে বাড়ী ফিরিতে পারেন নাই। বাড়ী পৌঁছিয়া তিন চারি দিবস মাত্রই জীবিত ছিলেন। তাই বলি কোন্ কার্যের কোন্ ফল তাহা ফলদাত্রী মাই জানেন।

সে বাহা হউক, আমরা পীঠরূপিনী মাকে দর্শন, স্পর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ববৎ বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া নন্দিকেশ্বর ভৈরবের অনুসন্ধানে ব্রতী হইলাম। মায়ের বেদীর পূর্বদিকে প্রাচীরগাত্রে অর্গলযুক্ত একটি দ্বার দৃষ্ট হইল। আমরা অর্গল খুলিয়া দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে দুইটি মন্দির দেখিলাম। একটি মন্দিরে ধূম্রজ্বলিত কালীর দাগ দৃষ্টে, অনুমানে স্থির করিলাম সেইটি ভোগমন্দির বা রক্তনশালা। অপর মন্দিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শিকল দ্বারা দ্বার বদ্ধ। শিকল খুলিলাম। হস্তস্থিত আলোর সাহায্যে ভিতরে ফুলচন্দনসজ্জিত শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইল, স্থির করিলাম ইনিই দেবীর ভৈরব—নন্দিকেশ্বর। আমরা একে একে মন্দিরমধ্যে

নন্দিকেশ্বর ।

প্রবেশ পূর্বক বাবাকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করতঃ পূর্বমত দ্বারসকলবন্ধ করিয়া যথাস্থানে আসিলাম ।

অসময়ে আসার জন্ত এই তীর্থের কর্তব্যকার্য্য,—পূজাদির নিয়ম কি ?—পাণ্ডাগণের স্বভাবই বা কেমন, যাত্রিগণ কি উপায়ে কোথায় থাকিয়া কিরূপ ভাবে কার্য্য করেন,—হাটবাজার, রাস্তাঘাট কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না । সময়ের অভাবে রাত্রিতেই মাকে ঐরূপে দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর দর্শনার্থ পুনরায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ছবরাজপুরের টিকিট লইয়া গাড়ী উঠিয়া রওয়ানা হইলাম । প্রাতে আসিয়া ছবরাজপুর ষ্টেশনে নামিলাম ।



বক্রেশ্বর ।

বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্ত্ব ভৈরবঃ ।

নদী পাপহরাতত্র দেবী মহিষমর্দিনী ॥

(পীঠমালা)

গৌড়দেশে মহাক্ষেত্রে বক্রেশ্বরঃ স্মসঙ্গতঃ ।

বক্রেশ্বর সমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডে গোলোকে ।

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈবচ ॥

(মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রঃ)

কুণ্ডে চানেকলিঙ্গানি অনেক প্রতিমাশুভা ।

গঙ্গাস্নান ফলং স্নানেহথবা শিবতাং ব্রজেৎ ॥

যত্রোষঃ তৌয়ং বহতে সদা পাপহরা নদী ।

যমদ্বারে বৈতরণী নামা যা লোক বিষ্কৃত্য ॥

তাক্ষ প্রত্যক্ষাং দৃশ্যন্তে মনুজাশ্চ স্বচক্ষুযা ।

তস্মাৎ মজ্জন মাত্রেণ মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥

(স্কন্দপুরাণম্)

অর্থাৎ

বক্রেশ্বরে দেবীর মনঃ (হৃদয়ের মধ্যস্থান) পতিত হয়, একান্ত
তথায় বক্রেশ্বর নামে ভৈরব ও দেবী মহিষমর্দিনী এবং পাপহরা
নাম্নী নদী বিদ্যমান আছেন ।

বক্রেশ্বর ।

গৌড়দেশে মহাক্ষেত্রে বক্রেশ্বর নামক শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে । ঐ বক্রেশ্বর তীর্থের সমান তীর্থ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বা গোলোকেও নাই । ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন ।

বক্রেশ্বরে অনেক কুণ্ডতীর্থ আছে । ঐ সকল কুণ্ডে শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলদায়িনী প্রতিমা এবং পাপহরা নদী আছে । এই পাপহরা নদী উষ্ণতোয়া । যমদ্বারে বৈতরনী নামে যে নদী লোকে ক্রত বা কথিত হইয়া থাকে সেই নদীকে এইস্থানে মনুষ্যসকল প্রত্যক্ষ দর্শন করে । সেই বৈতরনী সদৃশ পাপহরা নদীতে মনুষ্যগণ স্নান মাത്രেই মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

এই বক্রেশ্বরতীর্থ বীরভূম জেলার সদর ষ্টেশন শিউড়ির অধীন ছবরাজপুর রেল ষ্টেশনের চারি ক্রোশ ব্যবধানে পাপহরা নদীর তীরে অবস্থিত ।

হাওড়া হইতে—ছবরাজপুর ষ্টেশনের ভাড়া ২১০ আনা । খানু জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ লুপ্ লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া ছবরাজপুর যাইয়া নাগিতে হয় । আজিমগঞ্জ হইতে ছবরাজপুরের ভাড়া ১ টাকা । ছবরাজপুর রেল ষ্টেশনই বক্রেশ্বরের রেলষ্টেশন । তথা হইতে চারি ক্রোশ প্রশস্ত পথে গো-শকটে অথবা পদব্রজে বক্রেশ্বর যাওয়া যায় । শকটের ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় ।

আমরা প্রাতে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া উক্ত বাঁধা রাস্তায় রওয়ানা হইয়া বেলা ১২টার সময় বক্রেশ্বর উপস্থিত হইলাম ; এইস্থানে বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না । অনেকগুলি পাণ্ডা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের আশ্রয়েই থাকিতে হয় । তীর্থস্থানটা প্রান্তর

তীর্থ-কাহিনী ।

মধ্যে, নিকটে লোকালয় নাই, উক্ত স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পাণ্ডাগণের বসতি । তীর্থস্থানে কেবল দেবালয় মাত্রই আছে । কাজেই পাণ্ডাগণের বাড়ীতেই আমরা বাসা লইলাম । পূর্ব রাত্ৰিতে আহারাদি হয় নাই, আজও বেলা ১২টা পর্য্যন্ত পথশ্রমজনিত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় শরীর ক্লান্ত হওয়ায়, আগেই রক্তনাদির বন্দোবস্ত করিলাম । এখানে হাটবাজার কিছু নাই সুতরাং খাদ্যাদি পাইবার উপায় নাই । আমাদের সঙ্গে যাহা যাহা ছিল তাহাতেই একরূপ চলিতে পারে, কেবল কিছু চাউলের অভাব । আমরা তীর্থযাত্রী—সকলেই আতপ চাউলই ব্যবহার করি, বিশেষতঃ বিধবা সঙ্গে থাকায় আতপ চাউলেরই নিত্য আবশ্যক । এস্থানের অনেক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেই বিধবা আছে, কিন্তু কোন বাড়ীতেই প্রায় আতপ চাউলের সংশ্রব মাত্রও নাই ; এই দেখিয়া আমরা অবাক !!! ভাবিলাম তবে কি এদেশে বিধবাগণ আতপ খান না ? আতপ খান না—একথা কে বলে !!! মেঘাচ্ছন্ন দিন ভিন্ন প্রতিদিনই আবালবৃদ্ধ হিন্দুমুসলমান সকলেই সমভাবে আতপ ভোগ করেন ।

আমরা বহু চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে দুই তিন বাড়ী হইতে যে কিছু আতপ চাউল সংগ্রহ করিলাম তাহাতেই মধ্যাহ্নের কার্য্য হইল । রক্তনাদির জোগাড় করিয়া দিয়া স্নানার্থ পাপহরা নদীতে চলিলাম । পূর্বেই বলিয়াছি তীর্থস্থানটী গ্রাম হইতে কিছু দূরে,—প্রান্তরমধ্যে, সুতরাং পরিধেয় বসন ও পূজোপকরণ লইয়া পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম । স্নানের ঘাটে উপনীত হইয়া দেখিলাম ঘাটটী ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলী দ্বারা উত্তমরূপে বাধান ।

বক্রেশ্বর ।

আমরা জলসন্নিহিত সোপানশ্রেণীর উপর বসিয়া জলস্পর্শ করিয়া দেখি জল এত গরম যে তাহাতে অবগাহন স্নান করা অতি কষ্টকর । কিন্তু এই স্থানের অনুমান দ্বাদশ হস্ত দূরবর্তী স্থান হইতে ক্রমশঃ উষ্ণতা হ্রাস হইয়াছে । পর পারের জল তত গরম নহে, সুখোষ্ণ । নদীর পরিসর ও গভীরতা বেশী নহে । আমরা ঐ দ্বাদশ হস্তের মধ্যে স্নান করিতে অসক্ত হইয়া তৎপশ্চিমে অপর একটি ঘাটে স্নান করিলাম । এ ঘাটটীও ইষ্টকনির্মিত । এস্থানের জল সুখোষ্ণ না হইলেও স্নান করা যায় । আমরা কোনরূপে তথায় স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করতঃ নিকটস্থ অনেকগুলি কুণ্ডতীর্থ দর্শন ও স্পর্শনপূর্বক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহিষমর্দিনী দেবীকে দর্শন ও পূজা করিলাম । পাষাণময় পীঠস্থানোপরি ধাতুময়ী দশভুজা মহিষমর্দিনী বিরাজিতা আছেন । ইহাকেই দর্শন ও পূজা করিতে হয় । তথা হইতে বহির্গত হইয়া অপর মন্দিরে গমনপূর্বক ভৈরব বক্রেশ্বর দর্শনাদি করিতে হয় । ইনি মন্দিরের মধ্যস্থ গহ্বরদেশে অবস্থিত । আমরা অতি সন্তুর্পনে সোপানাবলী দ্বারা নিয়ে নামিয়া দর্শন ও পূজা করিলাম । একমাত্র গৌরীপট্টে অষ্টাবক্র শিব এবং বক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ উভয়েই অবস্থিত আছেন । প্রথমতঃ অষ্টাবক্র শিব পূজা করিয়া পশ্চাৎ বক্রেশ্বর পূজা করিতে হয় । কথিত আছে—অষ্টাবক্র মুনি এই শিবলিঙ্গের উপাসনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ; তাহাতেই অষ্টাবক্র লিঙ্গের উৎপত্তি ও ভৈরবের নাম বক্রেশ্বর । আমরা তথাকার

তীর্থ-কাহিনী ।

কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় আসিলাম । আহারাঙ্কে আর কোথায়ও গমন করিলাম না; যাইবই বা কোথায় ? যাইবার বা দেখিবার আর কিছুই নাই সুতরাং বাসাতেই বিশ্রাম করিলাম । পরদিবস প্রাতঃকালে পুনরায় পাপহরা নদীতে স্নান করিয়া পূর্বোক্ত বৈতরণী পার হইলাম । মাঘ মাসের প্রবল শীতেও বৈতরণী পার হইতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । জল এত উষ্ণ যে স্থানে স্থানে টক্‌বগ্‌ শব্দে ফুটিয়া সমস্ত নদীর জল হইতে অত্যাধিক বাষ্পসকল নির্গত হইতেছে । এই সকল দেখিয়া যাত্রীগণ মধ্যে অনেকেই জলে নামিতে সাহসী হইলেন না । আমরা দুই চারি জন সাহসে নির্ভর করিয়া পার হইয়াছিলাম ।

এই পাপহরা নদীর তীরে আরও অনেকগুলি কুণ্ডতীর্থ আছে ; যথা—ক্ষারকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি, কুণ্ডের জল এত উষ্ণ যে চাউল নিঃক্ষেপ করিলে রীতিমত ভাত হয় । জীবন্ম কুণ্ড পূর্বোক্ত উষ্ণ কুণ্ডেরই পার্শ্বে অথচ ইহার জল সুশীতল । প্রসিদ্ধ আছে রমণীগণ এই কুণ্ডে অবগাহন করিলে মৃতবৎসা দোষ প্রশমিত হয় । পার্শ্বতীকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, প্রভৃতি কুণ্ডের জল সুখাদ্য । শ্বেতগঙ্গা নামে একটি কুণ্ড আছে, ইহা অতি দীর্ঘ-চৌবাচ্চার স্থায় । আশ্চর্য্য এই যে, ইহার জলের একধার শীতল অন্য ধার উষ্ণ । শ্বেতগঙ্গায় যাত্রী মাত্রেই স্নান তর্পণ করিতে হয় ।

এই তীর্থের কার্য্য কেবল স্নান, তর্পণ, দর্শন, পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন । আমরা যথাসাধ্য তথাকার কার্য্যসকল শেষ করিয়া

বক্রেখর ।

অশ্রয়দাতা পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া তৎকালেই বিদায় হইলাম । কেননা আতপ চাউলের অভাবে শেষ আতপ খাইয়া থাকিতে না হয় । পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন না । শুনিলাম শিবরাত্রিতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, তৎকালে একটা মেলা বসে ।

আমরা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পুনরায় ছবরাজপুর আসিয়া আহারাদি করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম । এস্থান হইতে বৈদ্যনাথ ত্রিশ ক্রোশ । ইচ্ছা করিলে পদব্রজে যাওয়া যায় ।



বৈদ্যনাথ ।

আর্য্যাবর্তে বৃক্ষখণ্ডে গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে
প্রহ্লাদ জনকোষস্মাৎ প্রহলৌ নামিকাপুরী ॥
পুরাকৃতযুগেচৈব দাক্ষায়ন্যাঃ শরীরতঃ ।
তৎক্ষেত্রমুত্তমং জাতং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কং ॥
অপি কাশ্যাদিক্ষেত্রাণামেতৎ ক্ষেত্রং মহত্তরং ।
ক্ষেত্ররাজ ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্ব ক্ষেত্রোত্তমোত্তমঃ ।
দেব্যাঙ্গদি নিপাতেন হার্দপীঠ মণুত্তমং ।
এতৎ পীঠাৎ পরংনাস্তি বর্ততে ধরনীতলে ॥
শশকা মশকান্শ্চৈব পীঠমধ্যে পতন্তি যে ।
তৈকৈলাসং সমাযান্তি কিংপুনৰ্ম্মানুষাদয়ঃ ॥
হার্দপীঠ সমোনাস্তি বর্ততে ধরণীতলে ।
যত্র দাক্ষায়ণী দেবী জয় দুৰ্গা স্বরূপিনী ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবঃ পার্ৱত্যা সহিত প্রভুঃ ।
বৈদ্যনাথেশ্বরো নামা জ্যোতির্লিঙ্গঃ সনাতনঃ ॥
সৰ্বেষাং ভক্ত বর্গানাং সৰ্ব্ব কামফল প্রদঃ ।
বর্ততে রাবণাধীশো ন স্রপ্তো নচ কালিতঃ ॥

বৈদ্যনাথ ।

তং পশ্যন্তি নরা যেতু তেষাং বাঞ্ছা স্মদিক্তি ।
মৃত্যে স্নেহকিমায়ান্তি পুনরাগম বর্জিতাঃ ॥

(বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যং)

অর্থাৎ

আর্যাবর্তে ঝাড় খণ্ডে গঙ্গার দক্ষিণ তটে অতি রমণীয় গ্রাহলী নামিকা পুরী । ঐ স্থান পুরাকালে সত্যযুগে দক্ষ কন্যা দাক্ষায়ণীর অঙ্গসম্ভূত বলিয়া ভুক্তি (ভোগ) মুক্তিদায়ক উত্তম ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র কাশ্মাদি পুণ্য ক্ষেত্র হইতেও মহত্তম ক্ষেত্র । একান্ত ইহাকে ক্ষেত্ররাজ বলা যায় । এই স্থানে মহাদেবীর হৃদয় নিপুতিত হইয়াছিল তজ্জন্ত ইহা হার্দপীঠ নামে বিখ্যাত । ধরলী তলে ইহারতুল্য আর মহাপীঠ নাই । এখানে দাক্ষায়ণী দেবী কামরূপে বিরাজিতা থাকিয়া মশক, শশক ইত্যাদি পীঠমধ্যে মৃতপ্রাণী মাত্রেরই মুক্তি প্রদান করিতেছেন, মানবের কথা আর কি ? সেই ক্ষেত্রে পার্বতীর সহিত পার্বতীপতি সাক্ষাৎ সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথ নামে বিরাজিত থাকিয়া ভক্ত মানবগণের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন । যে ভক্তিমান্ মানব তদগতচিত্ত হইয়া একান্তমনে সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথ দর্শন করেন তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং জীবনান্তে পুনরাগমনবর্জিত হইয়া স্বর্গে গমন করেন ।

ষাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে বৈদ্যনাথ একটা সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ এবং পঞ্চ মহাপীঠ মধ্যে হার্দপীঠ একটা মহাপীঠ । যথা,—

তীর্থ-কাহিনী ।

হার্দিপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ ।

দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে জানুনৌ মম ॥

(তন্ত্রচূড়ামণিঃ)

অর্থাৎ

বৈদ্যনাথে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তথায় হার্দিপীঠ এবং বৈদ্যনাথ নামে ভৈরব ও জয়দুর্গানাম্নী দেবী বিরাজিতা ।

সত্যযুগে দেবীর হৃদয় নিপতিত হওয়ায় ইহা মহাপীঠ হয় । ত্রেতাযুগে রাক্ষসেশ্বর রাবণ কর্তৃক এই সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ কৈলাস হইতে আনীত হইয়া স্থাপিত হয় । কলিযুগে বৈজু গোয়ালার কর্তৃক লোকমণ্ডলীতে প্রকট হইয়া বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন । বৈদ্যনাথের পুরীর বাহিরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ঐ বৈজু গোয়ালার এক মন্দির আছে । লোকে উহাকে বৈজুর মন্দির বলে ।

হাওড়া হইতে—বৈদ্যনাথ জংসন ২০১ মাইল—ভাড়া ২১৫ পাই । তথায় গাড়ী পরিবর্তন করতঃ অল্প গাড়ীতে উঠিয়া দেওঘর—বাবার ধামের ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয় । ভাড়া ৮০ আনা । পদব্রজে বা ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া যায় ।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র পাণ্ডাগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যাত্রীগণ স্বেচ্ছায় যে কোন পাণ্ডার নাম বলিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে পারেন । পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে সাদর যত্নের সহিত লইয়া বাসাবাড়ীতে অবস্থিতির জন্য স্থান প্রদান করেন । যাত্রীগণের জন্য স্বতন্ত্র বাসাবাড়ী প্রস্তুত আছে এবং মিউনিসি-

বৈদ্যনাথ ।

পালিটীর অনুগ্রহে বাসাভাড়ী অতি পরিষ্কার থাকে, তজ্জন্ত যাত্রীগণের কোন অসুবিধার কারণ নাই । আট দশদিন যাত্রীভাবে থাকিলে বাসাভাড়ী লাগে না । যাহারা বায়ু পরিবর্তন জন্ত যাইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র বাসাভাড়ী করিয়া থাকিতে হয় ।

সহরের মধ্যস্থলে বৃহৎ দ্বার চতুষ্টয়যুক্ত বাবা বৈদ্যনাথের প্রকাণ্ড পুরী । অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্মিত সুদৃশ্য উচ্চ মন্দির, সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজপতাকা দ্বারা শীর্ষদেশ সুশোভিত, মন্দিরাভ্যন্তরে বাসনাফলপ্রদ সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথদেব বিরাজিত । প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে জয়ভূগার মন্দির ও অন্যান্য দেবীর মন্দির আছে ।

এই স্থানের প্রধান কার্য্য বানগঙ্গায় স্নান, তর্পণ, বাবা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতা দর্শন, পূজা ও যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন । বাবা স্বয়ং বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণানাং মুখে নৈব সর্বং ভক্ষ্যামি রাবণ । তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সুধীঃ ॥” অর্থাৎ হে রাবণ ! আমি ব্রাহ্মণগণের মুখেই ভোজন করিয়া থাকি, অতএব পরমযত্নের সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ।

বাবা বৈদ্যনাথের পূজার ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নাই । কেহ পঞ্চোপচারে, কেহ দশোপচারে, কেহ ষোড়শোপচারে, কেহ বা গঙ্গাজল, বিল্বদল মাত্র দিয়া পূজা করিয়া থাকেন । “ভাবমিচ্ছন্তি দেবতাঃ”—যিনি যে প্রকারেই পূজা করুন না কেন, ভক্তি থাকিলেই বাবা পরিতুষ্ট হন । পশ্চিমদেশীয় যাত্রীগণ কেহ হরিদ্বার হইতে, কেহ প্রয়াগ হইতে, কেহ কাশী ধাম হইতে গঙ্গাজল পূর্ণ কলস

তীর্থ-কাহিনী ।

বংশদণ্ডের উভয় পার্শ্বে রজ্জু যোগে লম্বিত করিয়া স্কন্ধে বহনপূর্বক ঐ ভারের সহিত ঘণ্টা ও পতাকা উড়াইয়া অতি দুর্গমপথে বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সুদূর পথ অতিক্রম পূর্বক মহানন্দে দলে দলে ভজন গান করিতে করিতে “বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা,” রবে বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়া উপস্থিত হয় । আহা ! তখন উহাদের অচলা ভক্তি দেখিলে বিশ্বয়ে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে । তখন উহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না । উহারা কোন পাণ্ডার অপেক্ষা করে না, পাণ্ডাগণ উহাদের কাছে যায় না । উহারা ভাবরূপ বিম্বদল সহ ভক্তিরূপ চন্দন চর্চিত করতঃ গঙ্গা জল বাবা বৈদ্যনাথের মস্তকোপরি ঢালিয়াই মানসোপচারে পূজা শেষ করিয়া থাকে । -যাহার যেমন শক্তি তিনি তদনুসারেই পূজা কার্য্য করিতে পারেন । পাণ্ডাগণ নানারূপ কৌশল অবলম্বন পূর্বক স্বার্থ সাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে, তজ্জন্ত সতর্ক হইয়া এই স্থানের কার্য্য করিতে হয় ।

শিবরাত্রিতে বৈদ্যনাথ দর্শনের প্রাপ্ত সময় । ঐ সময়ে নানা দেশীয় বহুতর যাত্রীর সমাগম হয় । পূর্বোক্ত পশ্চিমদেশীয় যাত্রীরা এই সময় দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয় । লোকালয়ে স্থানের অকুলন হওয়ায় প্রাপ্তিরে, বৃক্ষমূলে সর্বত্রই লোকে লোকা-রণ্য হইয়া উঠে । এই অবস্থা ২৩ দিবস মাত্র থাকে । তারপর আর তাদৃশ জনতা থাকে না । এই স্থানে বর্দ্ধিষ্ঠ বাজার আছে । খাদ্য দ্রব্য সমস্তই সুলভ মূল্যে প্রচুর পাওয়া যায় । উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নানাবিধ চাউল, দাইল, তরকারী, আম, কাঁঠাল,

বৈদ্যনাথ !

আতা, পেয়ারা প্রভৃতি সাময়িক ফল-মূল অতি অল্প মূল্যেই পাওয়া যায়। মৎস্য মাংসও পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নিকট তত্ত্ব করিতে হয়।

এই স্থানের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহুতর বাঙ্গালী বাবু আসিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন। উক্তরূপে বাঙ্গালী বাবুগণ আসায় পূর্বাশ্রম স্থানের উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এই স্থানের জল-বায়ুর এমনি গুণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের বিনা ঔষধে রোগমুক্তি হয়। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রমেহ-পীড়িত দূষিত গুরু রোগীর পক্ষেও এস্থান স্বাস্থ্যকর। যমুনাকোড় নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। তাহার জল অতি সুস্বাদু ও সুপেয়; কিন্তু প্রমেহ পীড়িতের পক্ষে পর্বতের ঝরণার জলই উপকারী।

এইস্থানে আদালত আছে। ঐ আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় কার্য্যই একজন বিচারকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রজা দরিদ্র বলিয়া এখানে উকিল আইন জারী নাই। এই স্থান সাঁওতাল পরগণার অধীন; ইহার সদর ষ্টেশন ছমকা। অর্দ্ধ মাইল দূরে থানা, পোষ্টাফিস টেলিগ্রাফ অফিস, হাস্পিটাল ও একটি এন্ট্রাস স্কুল আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতলেখক অত্রত্য উচ্চ ইংরাজী স্কুলের পূর্বতন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে কুষ্ঠরোগিগণের যথেষ্ট উপকার ও চিকিৎসা, গুরুত্ব প্রভৃতি হইতেছে।

গয়া ক্ষেত্র ।

পঞ্চকোশং গয়াক্ষেত্রং কোশমেকং গয়াশিরঃ ।
তন্মধ্যে সৰ্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি সন্তি বৈ ॥
গয়ায়াং নহি তৎস্থানং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে ।
সান্নিধ্যং সৰ্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততোবরং ॥
শ্রাদ্ধকৃদ্ যো গয়াক্ষেত্রে পিতৃণামনৃণোহি সঃ ।
শিরসি শ্রাদ্ধকৃদ্ যস্ত কুলানাং শতমুদ্বরেৎ ॥
গৃহাচ্চলিত মাত্রেণ গয়ায়াং গমনং প্রতি ।
স্বর্গারোহণ সোপানং পিতৃণাঞ্চ পদে পদে ॥
পদে পদেহশ্বমেধশ্চ যৎফলং গচ্ছতো গয়াং ।
তৎফলঞ্চ ভবেন্নৃণাং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং কল্প কোটি শতৈতরপি ॥
আত্মজোহপ্যন্যজোবাপি গয়া ভূমৌ যদা তদা ।
য স্নান্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েৎ ব্রহ্ম শাশ্বতং ॥

(গয়া মাহাত্ম্যং)

গয়া ক্ষেত্র ।

অর্থাৎ

গয়া ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চাশকোশ এবং গয়াশির এক কোশ পরিমাণ । ত্রিলোকস্থ সমুদয় তীর্থ এই ক্ষেত্র মধ্যে সন্নিহিত আছে । গয়াক্ষেত্রে একরূপ কিঞ্চিন্মাত্র স্থানও নাই যে স্থানে কোন তীর্থ নাই । সমস্ত তীর্থের সান্নিধ্য বশতঃই গয়াতীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ তীর্থ । এই গয়াক্ষেত্রে যে মানব শ্রদ্ধ করে সে পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয় । গয়াশিরে শ্রদ্ধ করিলে শত কুল উদ্ধার হয় । গৃহ হইতে গয়া গমনকারীর প্রতি পদবিক্ষেপে পিতৃগণ স্বর্গ সোপান আরোহণ করিতে থাকেন এবং গমনশীল ব্যক্তিও প্রতি পদবিক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ভগবান বলিয়াছেন গয়াশিরে পিণ্ডদানে যে ফল হয়, কোটিকল্পেও তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি না । স্বীয় সম্বানই হউক কি অন্য কোন ব্যক্তিই হউক—গয়াক্ষেত্রে যেখানে সেখানে বাহার নামে পিণ্ড প্রদান করিবে তিনি শাস্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবেন ।

বেহার ও ছোটনাগপুর প্রদেশে (১) পাটনা বিভাগে গয়া জেলায় ফকু নদীর পশ্চিম তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থ গয়াক্ষেত্র ।

হাওড়া হইতে বাঁকীপুর ৩৪৮ মাইল—রেলভাড়া ৩৮/১০ আনা ।
তথা হইতে গয়া ষ্টেশন ৫৭ মাইল—ভাড়া ৮০ আনা । অথবা
হাওড়া হইতে লক্ষ্মী সরাই ২৬২ মাইল—রেলভাড়া ২৮/১৫ আনা ।

(১) পূর্বে বঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুরের লেফটন্যান্ট গভর্নরের অধীন ছিল । গত দিল্লীর দরবার উপলক্ষে বঙ্গ হইতে পৃথক হইয়া বেহার, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা লইয়া নুতন প্রদেশ হইয়াছে । উহা এখন পৃথক লেফটন্যান্ট গভর্নরের অধীন ।

তীর্থ-কাহিনী ।

তথা হইতে অন্ত গাড়ীতে গয়া ষ্টেশন পৌছা যায় । এই রাস্তা সোজা এবং ভাড়া কিছু কম । এখন গ্র্যাণ্ড কর্ডলাইন হওয়ায় আরও সুবিধা হইয়াছে । হাওড়া হইতে একেবারেই গয়াক্ষেত্রে পৌছা যায় । ভাড়া ৩১৫ আনা । ষ্টেশন হইতে গয়ালীপাড়া প্রায় দুই মাইল ; পদব্রজে বা ঘোড়গাড়ীতে যাওয়া যায় ।

ষ্টেশনে পৌছামাত্রই গয়ালীর গোমস্তা উপস্থিত হইয়া যাত্রি-গণকে লইয়া যায় এবং অবস্থিতির জন্য উপযুক্ত বাসা প্রদান করেন ।

গয়ালীরা আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই স্থানের কার্য তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন ।

(১) খাপরাল, (২) দর্শনী, (৩) একোদ্বিষ্ট । সমস্ত স্থানের পিণ্ড প্রদানের নাম খাপরাল । এই কার্য দশ দিনে শেষ হয় । ইহার দক্ষিণা ১৬ টাকা, ইহা ছাড়া উপরি খরচা ৫ টাকা । দর্শনী অর্থাৎ ঠামশীলা, প্রোতশীলা এবং ধর্ম্মারম্ভ ভিন্ন অন্ত সমুদয় স্থানের নাম দর্শনী । ইহা সম্পন্ন করিতে সাতদিন সময় প্রয়োজন ; দক্ষিণা ১০ টাকা,—উপরি খরচা ৩ টাকা । একোদ্বিষ্ট অর্থাৎ কেবলমাত্র ফলুতে, বিষ্ণুপদে ও অক্ষয় বটমূলে পিণ্ডদানের নাম একোদ্বিষ্ট । এই কার্য এক দিনেই শেষ হয় । দক্ষিণা ৫ টাকা, উপরি খরচা ২ টাকা । এতদ্বিন্ন বাড়ীতে স্থাপিত বিগ্রহ থাকিলে তাহার প্রণামী বাবদ ১ টাকা, ইনুকম্ টেক্স বাবদ ১০ চারি আনা, খাজানা বাবদ ১০ আনা, চৌকদারী এক পয়সা, ভান্ডী বাবদ এক পয়সা লইয়া থাকেন ।

গয়া ক্ষেত্র ।

পূর্বেকৃত তিন প্রকার কার্যের মধ্যে বাহার যেমত ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন । তত্ত্বিয় শ্রাদ্ধাদির অঙ্গীভূত দান অবশ্য কর্তব্য । ভগবান্ বলিয়াছেন দান দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, দান দ্বারাই দুঃখ নষ্ট হয়, এবং দান দ্বারাই দুর্গতি বিনাশ হয় । আমি দানেতেই সন্তোষ লাভ করি, এজন্ত সর্ব প্রযত্নে কার্পণ্যবিহীন হইয়া শক্তি অনুসারে দান করিবে । তাহাতে যিনি কুপণতা করেন তাহার দান নিষ্ফল জানিবে । আমার ক্ষেত্রবাসি বিপ্রগণকে দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে আমি ক্ষেত্রবাসি বিপ্রগণকে শস্য ফল প্রদান করি । (১)

পিণ্ডাদি প্রদান জন্ত প্রধান গয়ালীদের বেতনভোগী কৰ্মচারী ব্রাহ্মণ আছেন । গয়ালীদের অভিমতে উক্ত ব্রাহ্মণ, যাত্রীদের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পিণ্ডদানের যত্ন বলিয়া পিণ্ড দান করান । এই পুরোহিতকে প্রকাণ্ডে কিছু দিলে প্রধান গয়ালী জানিতে পারিলে তিনিই তাহা গ্রহণ করেন । এই স্থানের পিণ্ড যবচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে । তিল, ঘৃত, মধু, যবচূর্ণ প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক তৎ সমস্তই দোকানদারের নিকট

(১) দানাং স্বর্গমবাপ্নোতি দানাদ্ দুঃখং প্রণশ্যতি ।

দানাত দুর্গতির্নাস্তি দানেন শয়ি তোষাতে ॥

তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন দানদ্যং সশক্তিতঃ ।

কার্পণ্যেন চ যদানং তদানং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

মৎক্ষেত্র বাসিনো বিপ্রাঃ সদা তুষান্তি দানতঃ ।

তদা এনং বিধাষ্যানি সত্যমেজবীমিতে ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইতে হয় । মুষ্টিপ্রমাণ অথবা কাঁচা আমলকীপ্রমাণ কিম্বা সমিপত্রপ্রমাণ পিণ্ড গয়াশিরে অর্পণ করিতে হয় (১) ।

সমস্ত স্থানে পিণ্ড দানান্তে শেষ দিবস অক্ষয় বটমূলে পিণ্ড দিবেন । এইস্থানে প্রধান গয়ালী ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সফল (২) দিয়া থাকেন । প্রবাদ এইরূপ—গয়ালী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম প্রকল্পিত । ব্রহ্মা ইহাদিগকে এতৎ ক্ষেত্রের কার্যের জন্ত সৃষ্টি করতঃ গয়াক্ষেত্রের পিণ্ডদানের কার্যে অধিকার দিয়াছেন । এজন্ত হব্য কব্যাদি ও দক্ষিণা প্রদান পূর্বক সর্বতোভাবে ইহাদের তুষ্টি সাধন করিবে । গয়ালী ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতার সহিত পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন (৩) ॥ অতএব সর্ব প্রযত্নে সন্তোষ সাধন পূর্বক সাফল্য গ্রহণ করিবে ।

পুণ্যশীলা খ্যাতনামী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানী অহল্যাবাই কর্তৃক গয়াসুরের শিরোপরি বিষ্ণুপদযুক্ত স্থানে অত্যাচ্চ প্রস্তরময় সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হয় । মন্দিরের শিরোভাগের কলস ও চক্র স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন । এই মন্দিরের মধ্য স্থল—দুই হস্ত দীর্ঘ, দুই হস্ত প্রস্থ

(১) মুষ্টিমাত্রং প্রমাণকং আর্দ্রামলকমাত্রকং ।

সমিপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যৎ গয়াশিরে ॥

(২) “সফল” প্রচলিত কথা । প্রকৃত পক্ষে উহাকে স.ফল্য বলে । উহার অর্থ আমার কৃত কার্যের যথোক্ত ফল হইল, তৎ কথন ।

(৩) ব্রহ্মঃ প্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদি নার্চয়েৎ ।

তৈ সন্তুষ্টৈ স্তোষিতাঃ সর্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ ॥

এবং এক হস্ত গভীর চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি বিষ্ণু পদ অঙ্কিত আছে ।
যাত্রীগণ তৎস্থানে পিণ্ড দান করেন ।

বুদ্ধগয়া—গয়াধাম হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে । এইস্থান বৌদ্ধেরা অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন । বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ অন্যান্য স্থানে তপস্বী কবিবার পর, শেষে এইস্থানে তপস্বী করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন । তদবধি এইস্থান বৌদ্ধদিগের নিকট অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । বুদ্ধদেবের অত্যাচ্ছ স্মরণ্য এক মন্দির আছে । ঐ মন্দির ভারত বিখ্যাত । গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যাইবার প্রশস্ত পথ আছে ; ঘোড় গাড়ীতে বা পদব্রজে যাওয়া যায় । গয়াধামের যাত্রীগণ উক্ত স্থানে যাইয়া পিণ্ড প্রদান করেন । এই স্থানের নিকটে ফল্গুনদীর পরপারে ধর্ম্মারণ্য । সে স্থানেও পিণ্ড দিতে হয় । গয়াধামের তিন ক্রোশ দূরে প্রেতশিলা । অত্যাচ্ছ পর্ব্বতোপরি মন্দির মধ্যে স্বর্ণ বর্ণের সরল রেখাঙ্কিতা একখণ্ড শীলা । তদুপরি পিণ্ড প্রদান করিতে হয় । এই পর্ব্বত আরোহণ জ্ঞাত কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও মদনমোহন দত্ত বিপুল অর্থব্যয়ে সোপান শ্রেণী প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাত্রীগণের পরমোপকার করিয়াছেন ।

গয়া সহরের পরিমাণ পূর্ব পশ্চিমে অনুমান তিন ক্রোশ এবং পরিসর উত্তর দক্ষিণে দেড় ক্রোশ । এ স্থানের জল হাওয়া তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে । গয়ালীপাড়ার পথগুলি অপ্রশস্ত এবং পুতিগন্ধময় । বহুতর লোকের বসতি আছে । গয়ালীপাড়ায় অনেক দীনহীন দরিদ্র আছে । যাত্রীগণ উহাদিগকে কিছু

তীর্থ-কাহিনী ।

কিছু দান করিয়া থাকেন । এতদ্ব্যতীত পাই পয়সা সঙ্গে রাখা উচিত ।

গয়ার উত্তর অংশকে সাহেবগঞ্জ বলে । এই ভাগে গবর্ণ-মেন্টের বিবিধ বিচারালয় ও জেলা স্কুল ; সাহেবগঞ্জের বাজারে বহুতর ধনী মহাজনের আড়ৎ আছে । নানাবিধ তরী-তরকারী ও বহু প্রকার মিঠাই প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই পাওয়া যায় । পিত্তলের বাসন অতি সুলভ মূল্যে যথেষ্ট বিক্রয় হয় । গয়ার কাল পাথরের থালা বাটি ও তামাক অতি প্রসিদ্ধ । গয়ার রেল ষ্টেশনের নিকট ধর্মশালা আছে । যাত্রীগণ তথায় থাকিয়া গয়ার কার্য্য করিয়া থাকেন । এই স্থান হইতে বিষ্ণুমন্দিরাদি কিছু ব্যবধান, সে অল্প বাঙ্গালী যাত্রীমতেই গয়ালাগাড়াই নিজ নিজ গয়ালাীর নিরূপিত বাসায় থাকিয়া গয়াকার্য্য করিয়া থাকেন । অনেকেই গয়ার কার্য্যান্তে কাশী যান । গয়া ষ্টেশন হইতে কাশী যাইবার রেল ভাড়া ১৮/৫ আনা ।





বিশ্বেশ্বরজীর শৃঙ্গার মূর্তি । •

काशी धाम ।

पञ्चक्रोशात्त्रयं क्षेत्रं पूर्वं पश्चिमतस्तथा ।
दक्षिणोत्तरतश्चैव मृतोमुक्ति मवाप्नुयात् ॥
मध्यमेश्वरमारभ्य यावदेहलि विस्त्रपः ।
सूत्रं स्थाप्य चतुर्दिक्षु ब्रामयेन्मण्डलाकृतिः ॥
तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रमुत्तमं ।
काशीति यांविद्वदे वास्तुत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता ॥
काशीस्तुः परमं क्षेत्रं विशेष फल साधनं ।
वाराणसीति यत् ख्यातं तन्मानं निगदामि वः ॥
दक्षिणोत्तरयोन्यो वरुणासिच पूर्वतः ।
जाह्नवी पश्चिमे पाशपानिश्चापि गणेश्वरः ॥
तेषामन्तःस्थितं क्षेत्रं विशेष फल साधनं ।
अविमुक्तमिति ख्यातं तन्मानं प्रब्रवीमि वः ॥
विश्वेश्वर चतुर्दिक्षु धनुः शत युगोन्मितं ।
अविमुक्ताभिधं क्षेत्रं मुक्तिसुत्रं न संशयः ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

গো কর্ণেশঃ পশ্চিমে পূর্বতশ্চ গঙ্গামধ্য-

শ্চোত্তরে ভার ভূতঃ ।

ব্রহ্মেশাগো দক্ষিণে সংপ্রদিক্ত স্তত্ত্ব প্রোক্তং ভবনং

বিশ্বভর্তুঃ ॥

কীটাঃ পতঙ্গাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা জলে স্থলে যেচ

চরন্তি জীবাঃ ।

মণ্ডুক মৎস্তাঃ ক্রিময়োহপিকাশ্চাং ত্যক্ত্বা শরীরং

শিবমাপ্ন বন্তি ॥

সূচ্যত্রমাত্রমপি নাস্তি মমাস্পাদেশ্বিন্ ।

স্থানং সুরেশ্বরী মৃতশ্চ ন যত্র মোক্ষঃ ॥

ভূমৌ জলে বিয়তি বাণ্ডুচিমধ্যতোবা ।

সর্পোহগ্নিদম্বু পরিভির্নিহতশ্চ জন্তোঃ ॥

স্থিরাকাশ্যামি হৈ বৈ কা প্রতিজ্ঞাহি ময়া কৃত্য ।

অত্রৈব মৃত মাত্রাণাং তিরস্চামপি দেহিনাং ॥

ভক্তানাং প্যভক্তানাং পুণ্য পাপাত্মনা মপি ।

মুক্তিং দাস্যামি সর্বেষাং ভক্তানামেব সৈবহি ॥

মোক্ষস্তুল্লভং মত্বা সংসারক্ৰান্তি ভীষণং ।

অশ্মনা চরণৌহত্বা বারানশ্চাং বসেন্নরঃ ॥

কাশী ধাম ।

ইদং কলিযুগং ঘোরং সম্প্রাপ্তং পাণ্ডু নন্দন !

গতিমন্ত্রম্ পশ্যামি মুক্ত্যৈ বারানসীপুরীং ॥

জপ ধ্যান বিহীনানাং জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জিতানাং ।

তপশ্চাসাহ হীনানাং গতির্বারানসী নৃণাং ॥

(কাশী মুক্তি বিবেকঃ)

অর্থাৎ

কাশী মুক্তি বিবেকে বর্ণিত হইয়াছে ;—কাশীক্ষেত্র পূর্ব পশ্চিমে পঞ্চ কোশ এবং উত্তর দক্ষিণে পঞ্চকোশ ; ইহার মধ্যে মৃত ব্যক্তি মাত্রই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । মধ্যমেশ্বর শিব হইতে দেহলী গণেশ পর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরাইলে যে বৃত্ত অঙ্কিত হইবে তন্মধ্যস্থ ক্ষেত্রই কাশী । এই কাশীক্ষেত্র মধ্যে বিশেষ ফল সাধন বারানসী নামক পরম ক্ষেত্র আছে । দক্ষিণে বরুণা নদী, উত্তরে অসি নদী, পূর্বে গুরুধুনী গঙ্গা, পশ্চিমে পাণি গণেশ—এই চতুঃসীমাস্তর্গত স্থানের নাম বারানসী ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রে মৃত জীবের মুক্তি অবশ্যজ্ঞাবী । এই মুক্তি প্রদ বারানসী ক্ষেত্রের মধ্যে বিশ্বনাথের অস্তর্গৃহ আছে । তাহার পরিচয় এই—পশ্চিম সীমা গোকর্নেশ্বর শিব, পূর্বসীমা ভাগিরথী গঙ্গার মধ্যভাগ, উত্তরসীমা ভারভূতেশ্বর শিব, দক্ষিণসীমা ব্রহ্মেশ্বর শিব—এই সীমা চতুষ্টয়ের অস্তর্গত বিশ্বেশ্বরের অস্তর্গৃহ । এই অস্তর্গৃহমধ্যে বিশ্বনাথের চতুর্দিকে দুই শত ধনু অষ্টশত হস্ত পরিমিত স্থানকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে । ইহাতে জীবের মৃত্যু হইলে নিশ্চয়

তীর্থ-কাহিনী ।

মুক্তি হয়, তাহাতে সংশয় নাই । কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, ভেক, মৎস্য, ক্রিমি 'আদি এবং জলচর, স্থলচর যে কোন জীব কাশী মধ্যে দেহ ত্যাগ করুক না কেন তাহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে । হে সুরেশ্বর ! আমার এই আশয়ে এমন সূচ্যগ্র স্থানও নাই, যেখানে মৃত প্রাণীর মুক্তি না হয় । জলে, স্থলে, শূন্যে অথবা অশুচি স্থান মধ্যে, সর্প, অগ্নি, চৌর কিম্বা উরু হইতে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ হউক, আমার প্রতিজ্ঞাই এই স্থির জানিবে যে কাশীতে ভক্ত, অভক্ত, পুণ্যবান্ বা পাপী জীবগণকে তাহাদের জীবনান্তে মুক্তি প্রদান করিব । হে দেবি ! সংসার অতি ভীষণ, ইহাতে মুক্তি সুদুর্লভ জানিয়া পাষণ দ্বারা চরণদ্বয় ভগ্ন করতঃ কাশীতে বাস করিবে । ০ । হে পাণ্ডুনন্দন ! এই ঘোর কলিযুগে জপ-ধ্যান বিহীন, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিবর্জিত এবং তপস্তাতে উৎসাহহীন জীবের বারণসী বাস ভিন্ন আর অন্য গতি দেখিতেছি না ।

কাণ্ডা হইতে মোগলসরাই ৪৬৯ মাইল, রেল ভাড়া ৪।৮৫ আনা । মোগল সরাই জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ আউদ এণ্ড রোহিল খণ্ড রেলের রাজঘাট কাশীর স্টেশন, ৭ মাইল রেল ভাড়া ৮।১৫ সাত পয়সা । তথা হইতে বাঙ্গালী টোলা প্রায় ২ মাইল, গাড়ী পাকী, নোকা বা পদব্রজে যাওয়া যায় ।

রেল গাড়ী হইতে নামিবাসাত্রই পাণ্ডা উপস্থিত । ইচ্ছা হয় তাহার সহিত যাইতে পারেন, কিম্বা পরিচিত কোন স্থান থাকিলে তথায় যাইতে পারেন । শেষোক্ত স্থানে যাওয়াই ভাল । কেননা পাণ্ডাদের সম্পূর্ণ অধীনে যাইতেই নাই । নিতান্তই যাহার পরিচিত কোন স্থান নাই তিনি স্বল্প বাসা ভাড়া করতঃ তথায় থাকিয়া, কাশীর কার্য্য করিবেন । তাহা হইলেই উচিত নিয়মে যথাযোগ্য ব্যয় দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবেন ।

কাশী ধাম ।

কাশীর প্রধান কার্য্য স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দর্শন, পূজা এবং ব্রাহ্মণ, সধবা, কুমারী ও দণ্ডী ভোজন । যাহার যেরূপ সাধ্য তদনুসারেই উক্ত কার্য্য সকল করা যাইতে পারে । পাণ্ডাদের উপর উল্লিখিত কার্য্যের ভার না দিয়া স্বহস্তে ব্যয় করিতে হয়, নচেৎ অযথা অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে ।

এই স্থানের কার্য্য সকল গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালা দ্বারা হইয়া থাকে । গঙ্গাপুত্রেরা কেবল গঙ্গাস্নানের সময় সংকল্প মাত্র দেওয়াইয়া থাকেন । যাত্রীরা যতদিন তথায় থাকিবেন যাত্রাওয়ালারা ততদিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থস্থান দর্শন করান । এজন্ত উহাদিগের প্রাপ্য প্রতি যাত্রীর নিকটে প্রত্যেকে সতর আনা, অর্থাৎ গঙ্গাপুত্র সতর আনা, যাত্রাওয়ালা সতর আনা পাইয়া থাকে । ইহা গবর্ণমেন্ট হইতে বন্দোবস্ত ।

যাত্রীগণ কাশীতে আগমন করিয়া প্রথম দিবস উপবাসী থাকিবেন । পর দিবস প্রথমত মনিকর্ণিকাতে গমনকরতঃ বিধিপূর্বক স্নান, তর্পণ এবং তীর্থশ্রাদ্ধ ও দানাদি সাধ্যানুসারে করিবেন (১) । তদনন্তর মনিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া শ্রীশ্রীচুণ্ডিরাজ গণেশের নিকট গমনকরতঃ তাঁহাকে পূজা করিবেন । তৎপর দণ্ডপাণির নিকট যাইয়া পূজা করিবেন । ইহার পর জ্ঞানবাণীতে গমন করিয়া জলোত্তলন পূর্বক স্নান

(১) কাশীধামে উক্ত আছে অমৃত মহা দান করিলে যে ফল হয়, কশীক্ষেত্রে কিঞ্চিৎদাতা দানেও তদপেক্ষা সহস্র গুণ ফললাভ হয় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

করিবেন অথবা ঐ পবিত্র বারি শিরে ধারণপূর্বক কিঞ্চিৎ পান করিবেন । তদন্তর সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর দর্শন, স্পর্শন, ও পূজা করিবেন । পূজাস্তে বিশ্বনাথের মন্দির পরিক্রমণ করিতে করিতে তত্তৎস্থানীয় দেব দেবীগণকে ও মুক্তি মণ্ডপেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া তথায় ত্রীত্রীবিশ্বনাথের ধ্যানমগ্ন হইয়া স্নানকাল অবস্থিতি করিবেন । তৎপর বিশ্বনাথের স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরের স্বয়ং কলস দর্শন ও প্রণাম পুরঃসর জগন্মাতা অন্নপূর্ণার বাড়ী গমনাস্তে মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীকে ভক্তি সহকারে ষথাসাধ্যোপচারে পূজা করিবেন । ইহাদের পূজার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই—ইচ্ছানুসারেই পূজা করিতে পারেন ।

এই কাশীক্ষেত্রে সংখ্যাতিরিক্ত পূজনীয় শিবলিঙ্গ আছেন । মানবের সাধা কি যে সেই সমস্ত শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করে । একারণ কাশীক্ষেত্রে প্রধান মুক্তি লিঙ্গ চতুর্দশটি নির্ণীত হইয়াছে । সেই চতুর্দশটি শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজিত হইলে, সমস্ত লিঙ্গ পূজিত হইয়া থাকেন । অতএব ষাত্রিগণের একান্ত কর্তব্য সেই চতুর্দশটি লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করেন ।

চতুর্দশলিঙ্গ—(১) প্রণবেশ্বর, (২) ত্রিলোচনেশ্বর, (৩) মহাদেব, (৪) কুর্তিবাসেশ্বর, (৫) রত্নেশ্বর, (৬) চন্দ্রেশ্বর, (৭) কেদারেশ্বর, (৮) ধর্মেশ্বর, (৯) বীরেশ্বর, (১০) কামেশ্বর, (১১) বিশ্বকর্মেশ্বর, (১২) মনিকর্ণিকেশ্বর, (১৩) অবিমুক্তেশ্বর, এবং (১৪) মহালিঙ্গ বিশ্বেশ্বর । কাশীক্ষেত্রে এই চতুর্দশলিঙ্গের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে । সংক্ষেপে সেই চতুর্দশ লিঙ্গ মাহাত্ম্য লিখিত হইল ।

কাশী ধাম ।

অতঃপর মঙ্গলবার কিম্বা চতুর্দশীতে কালভৈরবের পূজা করা বিধি । কিন্তু ষাটীদেব সময় সংকীর্ণ বশতঃ প্রায়ই তদনুযায়ী পূজা করা ঘটয়া উঠে না । এজন্য বিশ্বেশ্বরের পূজা অস্তেই কালভৈরবের পূজা করিতে হয় । এই কালভৈরব মহাদেব কোপ সমুত্ত । ইনি কাশীবাসী পাপস্বামীভবের শান্তিদাতা । কাশীতে কালের অধিকার না থাকায় বিশ্বনাথ এই কালভৈরবের সৃষ্টি করিয়াছেন । কাশীতে পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ রুদ্র পিশাচত্ব লাভ করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর, কালভৈরবের কঠোর শাসনদণ্ড ভোগ করিয়া পরিশেষে পিশাচত্ব পরিহার পূর্বক মুক্তিলাভ করে । অগ্রাহায়ণ মাসের অষ্টমীতে বথোপচার বিধানে কালভৈরবের পূজা করিলে মানবের সম্বৎসরের বিষমকল দূরীভূত হয় । কালোদক তীর্থে স্নানান্তে কালভৈরবের দর্শন ও পূজা করিতে হয় । এবং কালোদকে পিতৃগণের তর্পণ করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় ।

পূর্বোল্লিখিত চতুর্দশ লিঙ্গোৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে, কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

(১) প্রণবেশ্বর—এই লিঙ্গ পিতামহ ব্রহ্মার তপঃ সমুত্ত । এই লিঙ্গ অর্চনা করিলে মানব মুক্তিলাভ করে । মৎস্তোদরী-তীরে এই মহালিঙ্গ দর্শন ও পূজাকারী মানবের যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন তাহার মুক্তি অবশ্যস্তাবী ।

(২) ত্রিলোচনেশ্বর—পুরাকালে মহাদেব সমাধিস্থ হইলে সহসা এই লিঙ্গের আবির্ভাব হয় । ভূতভাবন ভবানিপতি ঐ লিঙ্গমধ্যে লুকায়িত থাকিয়া ভগবতীকে তৃতীয় নেত্র প্রদান

তীর্থ-কাহিনী ।

করেন, তাহাতেই জিলোচনেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হন । মানবগণ পিলপিলা তীর্থে স্নান, তর্পণানন্তর এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া সকল কলুষ বিমুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করে ।

(৩) মহাদেব—সত্যযুগে দেবর্ষিগণের স্তুতি দ্বারা এই লিঙ্গ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সহস্রা সমুৎপন্ন হন । তদৃষ্টে ঋষিগণের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার মহাদেব নামে অভিহিত হন । ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্বলিঙ্গ স্বরূপ । ইহাকে দর্শন ও পূজা করিলে যে স্থানেই পূজকের মৃত্যু হউক না কেন, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার শিবলোকে জন্ম হয় ।

(৪) কুতিবাসেশ্বর—গজাসুর নামক অসুরের দেহ হইতে ভগবানের অনুগ্রহে মহাদেব এই লিঙ্গরূপে প্রকটিত হন । এই লিঙ্গের নিকটেই হংসতীর্থ, তাহাতে অবগাহনানন্তর সমস্ত লিঙ্গের প্রধান এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে, অত্র স্থানে মরিলেও তাহার কাশী মৃত্যুর ফল হইবে । কুতিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

(৫) রত্নেশ্বর—গিরিরাজ আনীত এবং নিষ্কিপ্ত রত্নালঙ্কার হইতে এই লিঙ্গ সমুৎপন্ন । যে মানব ভক্তি পূর্বক রত্নেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিবে, সেই মানব দেহান্তে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে ।

(৬) চক্রেশ্বর—সোমনাথের তপঃ সমুত্ত স্বনামখ্যাত লিঙ্গ । এই লিঙ্গ সমীপে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয় । যাহারা এই লিঙ্গের পূজা করেন তাঁহারা যেখানেই দেহত্যাগ করণ না কেন, অন্তিমে তাহার চক্ৰলোক লাভ হয় ।

কাশী ধাম ।

(৭) কেদারেশ্বর—শৈবশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষি কর্তৃক এই লিঙ্গের আবির্ভাব । হিমালয়ে কেদারেশ্বরের সমীপে যে সকল তীর্থ আছে, কাশীক্ষেত্রে কেদারেশ্বরের নিকটেও সেই সমুদয় তীর্থই বর্তমান আছে । কেদারেশ্বরের পূর্বদিকে হরপাপ হ্রদ, সুরধুনী সংলগ্ন হইয়া ভক্ত মানবের কোটি জন্মার্জিত পাপ সকল হরণ করিতেছেন । পুরাকালে গিরি রাজকুমারী গৌরী এই কুণ্ডে স্নান করায় ইহার নাম “গৌরী কুণ্ড” হইয়াছে । এই গৌরি-কুণ্ডে স্নান মাত্রেই মানব মুক্তি পাইত । কিন্তু দেবগণের ইহা অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা একত্র হইয়া পরামর্শ পূর্বক তন্নিবারণ করতঃ এই বিধি করিলেন যে, যে মানব এই কুণ্ডে স্নানান্তর কেদারেশ্বর দর্শন ও পূজা করিবে সে অন্ত্র মরিলেও মুক্তি পাইবে ।

(৮) ধর্মেশ্বর—ইহা ধর্মরাজ যমের তপঃ সমুত্ত স্বনামখ্যাত লিঙ্গ । এই মহালিঙ্গ দর্শন মাত্রেই মানব সকল কলুষ বিমুক্ত হইয়া মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয় । ধর্মকূপে স্নান, ধর্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন ও পূজার ফল অসীম । হরিদ্বারে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এবং বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে নর্মদায়, সরস্বতীতে, গোমতীতে স্নানে যে ফল হয়, এক ধর্মকূপে স্নান করিলেই সেই সমুদয় ফল হয় ।

(৯) বীরেশ্বর—বীরেশ্বর নামক কোন এক ব্যক্তির তপোবল সমুত্ত স্বনামখ্যাত লিঙ্গ । এই লিঙ্গ বিনা মস্ত্রে ভক্তিসহকারে পূজা করিলেই মানবের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয় ।

(১০) কামেশ্বর—এই মহালিঙ্গ দুর্কাসা মুনির তপসোৎপন্ন । সকলের কামনা সিদ্ধ করেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম কামেশ্বর ।

তীর্থ-কাহিনী ।

কামকুণ্ডে স্নান করিয়া কামেশ্বর দর্শন ও পূজা করিলে তাহার সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হয় ।

(১১) বিশ্বকামেশ্বর—ইহা বিশ্বকর্মার তপ উদ্ধৃত স্বনামখ্যাত লিঙ্গ । এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে নিশ্চয় মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

(১২) মণিকর্ণিকেশ্বর—মহাবিশ্বুর তপস্যাৎপর মহালিঙ্গ । মণিকর্ণিকাতে স্নানান্তর এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে, মানব যদি অন্যত্র গমন করিয়া মৃত হয় তথাপি তাহার মুক্তি হয় ।

(১৩) অবিমুক্তেশ্বর—এই লিঙ্গ স্বয়ং মহাদেব স্থাপন করতঃ লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন । এই লিঙ্গই আদিলিঙ্গ । ইহার পূর্বে কেহ কখনও কোন লিঙ্গ স্থাপন করেন নাই । এই লিঙ্গ দর্শনে ব্রহ্মাদি সকলে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ স্থাপন করেন । অত্যা এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ অবিমুক্ত ফলপ্রদ । এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজান্তে অন্য স্থানে মৃত্যু হইলেও নিশ্চয়ই মুক্তির লাভ হয় ।

(১৪) বিশ্বেশ্বর—দেবাদিদেব ইচ্ছাময় মহেশ্বরের স্বেচ্ছানুসারে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া এই বিশ্বেশ্বর নামক সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ সহস্রা সমুদ্ভূত হন । ভক্ত মানব একমাত্র এই সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া কাশীস্থ বাবতীয় লিঙ্গ পূজার ফল লাভ করিয়া থাকেন । এই মহালিঙ্গ পূজক ব্যক্তি যদি অন্য স্থানেও দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব সুখভোগান্তে জন্মান্তরে কাশী প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন । এই বিশ্বেশ্বরের তুল্য লিঙ্গ, মণিকর্ণিকা তুল্য তীর্থ এবং কাশীসদৃশ ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর নাই ।

কাশী ধাম ।

সমস্ত কাশীই তীর্থময়ী,—বারাণসী তত্তীর্থেরও তীর্থ । এই কাশী মধ্যে মণিকর্ণিকা ও বিশ্বেশ্বর অদ্বিতীয় । যাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি সমন্বিত হইয়া এই জ্যোতির্ময় সনাতন বিশ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ মহাদেব দর্শন করেন । এই মহালিঙ্গের নাম শ্রবণ মাত্রেই জন্মার্জিত দুরিতরাশি দূরীভূত হয় । এই লিঙ্গ মনে মনে স্মরণ করিলে জন্ম জন্মার্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় । এই লিঙ্গ দর্শনোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই জন্মত্রয়ের পাপ বিলুপ্ত হয় । এই সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে শতাব্ধিমেধ যজ্ঞের ফল এবং স্পর্শ করিলে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ভক্তিপূর্বক গঙ্গা যাত্রা গঙ্গাজল ও একটীমাত্র বিষপত্র দ্বারা পূজা করিলে, শত স্বর্ণপুষ্প ও বিষপত্র দ্বারা পূজার ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি এই বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শনানুমোদন করেন,—যে মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তি শিবমাত্র নমস্কার করেন, দেবদানবাদিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করেন ।

দণ্ডপানির আবির্ভাব—মহাতপা হরিকেশ বোমকেশের আরাধনা করিয়া তাঁহারই বরে কালভৈরবের অধীন থাকিয়া কাশীক্ষেত্রবাসী পাপীগণের পাপানুযায়ী দণ্ডদাতা দণ্ডপানি নামে খ্যাত হইয়াছেন । যে ব্যক্তি জ্ঞানতীর্থে স্নান করতঃ অগ্রে দণ্ডপানির আরাধনা না করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করেন, তিনি কিছুতেই বিশ্বনাথের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন না । এই জন্তই বিশ্বনাথের পূজার পূর্বেই দণ্ডপানির পূজা করা কর্তব্য ।

দুর্গা দেবীর আবির্ভাব—মহামায়া ভগবতী দুর্গ নামক মহা-

তীর্থ-কাহিনী ।

সুর বিনাশ করতঃ দুর্গাদেবী নামে বিখ্যাতা হইয়া কাশী ক্ষেত্র রক্ষা জন্য কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণসহ এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন । কাশীবাসী ও যাত্রিগণের দুর্গা দেবী দর্শন এবং পূজা করা একান্ত কর্তব্য ।

জ্ঞানবাণী—পূর্বোত্তর দিগ্ভ্যাবর্তী দিকপতি ঈশান, কাশীস্থ জ্যোতির্ময় সনাতন বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনে পূজনাভিলাষী হইয়া জলাভাব বশতঃ স্বীয় হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা ঐ মহালিঙ্গের দক্ষিণে একটি জলময় কুণ্ড নির্মাণ পূর্বক উক্ত কুণ্ডস্থ বারি দ্বারা বিশ্বনাথের স্নান ও পূজা করেন । তাহাতে বিশ্বনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, ত্রিলোক মধ্যে এই তীর্থ প্রধান তীর্থ হইবে, আর ইহার নাম জ্ঞানদ বা জ্ঞানবাণী হইবে । এই জ্ঞানবাণীর বারি স্পর্শ এবং আচমন মাত্রেই জীবের কলুষরাশি বিনষ্ট হইয়া অশ্বমেধ ও রাজস্বয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে । শুক্রবার পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতিপাত যোগ হয়, সেই দিনে এই স্থানে শ্রাদ্ধ কার্য্য গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটি গুণাধিক ফলপ্রদ হইবে । ঐহাদের পুত্র এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করেন তাঁহাদের পিতৃগণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে অবস্থিতি করেন । যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাসি থাকিয়া পরদিবস এই জ্ঞানবাণীর বারি গণ্ডুষত্রয় পান করেন, তাঁহার হৃদয়ে শিবলিঙ্গত্রয় উৎপন্ন হয় । যথাকালে সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়, এই ‘জ্ঞানদ’ তীর্থে সন্ধ্যোপসনা করিলে সে পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় । এই তীর্থের নাম শিবতীর্থ, জ্ঞানদতীর্থ,

কাশী ধাম ।

তারকতীর্থ ও মোক্ষতীর্থ । অন্ত্র দেশে থাকিয়া এই তীর্থের নাম মনে মনে স্মরণ করিলেও পাপরাশি বিলুপ্ত হয় ।

মণিকর্ণিকা—মহাবিশ্ব স্বীয় হস্তস্থিত সূদর্শন চক্র দ্বারা একটি পুষ্কর্ণী খনন করতঃ স্বীয় দেহের ঘর্ষাষু দ্বারা তাহা জলপূর্ণ করিয়া তন্তীরে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন । অতঃপর মহামায়া সহ মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হর্ষে শিরঃকম্পন পূর্বক তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন । মন্তুকান্দোলনবশতঃ মহাদেবের কর্ণ হইতে মণিময় কর্ণিকা নামক আভরণ ঐ জলাশয়ের মধ্যে পতিত হয়, তদবধি উক্ত জলাশয় মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত হইয়াছে (১) । বিশ্ব চক্রোৎপন্ন বলিয়া পুরাকালে চক্রতীর্থ নামে খ্যাত ছিল । ব্রহ্মাণ্ডে

(১)—মণিকর্ণিকা কুণ্ডের সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ আছে । এই প্রবাদটি মহাকবি স্বর্গীয় হেমচন্দ্রের “মণিকর্ণিকা” শীর্ষক কবিতার পাদ টীকায় সন্নিবেশিত আছে । প্রবাদটি এই,—“মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিয়ত ছিলেন, একদিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মানুষ মরিলে পর কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপ জপ ব্রতাদিই বিধেয় । তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিশ্ব তীর্থস্থান ছিল সেই স্থানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন । শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা উহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই ; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া উহাদিগকে কূপে নামিতে দিল । স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে “কর্ণিকা” ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে “মণি” ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম “মণিকর্ণিকা” হইয়াছে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

এই তীর্থের সমান আর তীর্থ নাই । পূর্বদিকে সুরধুনী গঙ্গা সংমিলিত হওয়ায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । কাশী ক্ষেত্র মধ্যে “পবিত্র মণিকর্ণিকা” তীর্থেরও তীর্থ । বিশ্বনাথের মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণ স্থিত তিনশত হস্ত, দক্ষিণে দুইশত হস্ত এবং গঙ্গামধ্যে পঞ্চশত হস্ত পরিমিত স্থান মণিকর্ণিকা । অপিচ গঙ্গামধ্যে, হরিশ্চন্দ্রের মণ্ডপ, গঙ্গাকেশব এবং স্বর্গদ্বার এই সীমার মধ্যস্থান মণিকর্ণিকা । এই স্থান ত্রৈলোক্যের সার,—পরমাত্মার আশ্রয় ভূমি । যাহারা মণিকর্ণিকায় স্নানান্তে স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করেন, তাহাদিগের সমস্ত পাপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং স্বর্গও দূরে থাকে না । যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকাতে পিতৃগণের তর্পণ করেন তিনি স্বীয় উদ্ধৃতন ও অধঃস্তুন সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন । এই তীর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য ত্রিলোকবাসী সকলেই অত্যাগ্রহে যত্ন করিয়া থাকেন ।

বিন্দুমাধব—চন্দ্রশেখরের আজ্ঞা গ্রহণান্তে গরুড়বাহন ভগবান বিষ্ণু কাশীতে আগমন করতঃ মায়াবলে কাশীরাজ দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদূরিত করিয়া কাশীস্থ তীর্থ বিচারপূর্বক “পঞ্চনদতীর্থ” সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দু-নামা ঋষি পঞ্চনদতীরস্থ ভগবান মাধবকে স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করায় ভগবান প্রীত হইয়া ঋষির প্রার্থনা ক্রমে বর দেন যে উক্ত ঋষির অর্দ্ধ নাম সম্বলিত “বিন্দুমাধব” নাম ধারণ পূর্বক আকল্লকাল পঞ্চনদ সমীপে থাকিয়া পঞ্চনদ তীর্থ-স্নায়ী ও বিন্দুমাধব দর্শনকারীকে মুক্তিদান করিবেন । যে

কাশী ধাম ।

মানব পঞ্চনদে স্নানান্তে বিন্দুমাধব দর্শন ও পূজা করেন, তিনি দেশান্তরে মৃত হইলেও মুক্তি লাভ করিবেন ।

দশাশ্বমেধ ঘাট—পিতামহ ব্রহ্মা এইস্থানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তদবধি এইস্থানের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে । এইস্থানে স্নান, দান, যজ্ঞ যাহা কিছু পদনুষ্ঠান করা যাইবে তাহার ফল অক্ষয় হইবে । এই ঘাটে স্নান, তর্পণান্তর দশাশ্বমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে তাহার আজন্মকৃত পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । দশাহরায় এই ঘাটে স্নান করিলে দশ জন্মার্জিত দশবিধ পাপ নষ্ট হয় এবং তাহার আর জন্ম হয় না ।

পঞ্চতীর্থ কার্য—প্রাতঃকালে নৌকারোহণ করতঃ প্রথমতঃ অসির ঘাটে যাইয়া স্নান তর্পণান্তর একটি মূন্ময় শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া, অসিসঙ্গমেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজাকরতঃ দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া স্নান তর্পণান্তর দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিবে । তৎপর তথা হইতে বক্রগার সঙ্গম স্থানে যাইয়া স্নান, তর্পণ করিবে এবং তথায় আদিকেশব নামক বিষ্ণু মূর্তি দর্শন ও পূজাকরতঃ নৌকারোহণে পঞ্চগঙ্গার ঘাটে আসিয়া স্নান, তর্পণ করিয়া বিন্দুমাধব বিষ্ণুমূর্তি দর্শন ও পূজা করিবে । তৎপর মণিকর্ণিকাতে আগমন করতঃ স্নান, তর্পণ করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন ও পূজা করিলেই পঞ্চতীর্থ কার্য সম্পন্ন হয় । যাত্রী মাত্রেরই এই পঞ্চতীর্থ কার্য অবশ্য কর্তব্য ।

শিবগয়া—সচরাচর ইহাকে “কপিলধারা” বলে । রাজঘাট হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই মাইল দূরে প্রান্তর মধ্যে এইস্থান ।

তীর্থ-কাহিনী ।

যদিও এইস্থান কাশীক্ষেত্রের বহির্দেশে, তথাপি কাশীখণ্ডে এইস্থানের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ইহা একটি পিতৃতীর্থ,—এই স্থানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়স্বর্গ ভোগ হয় । মৌনস্ক্রিয়াতে অর্থাৎ রবি সোমবার যুক্ত অমাবস্যাতে এই স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয় । প্রবাদ আছে যে, আত্মঘাতীর মুক্তি নাই কিন্তু এই শিবগয়াতে পিণ্ডদান করিলে আত্মঘাতীরও উদ্ধার হয় । পিতৃ-ষোড়শী, মাতৃষোড়শী পিণ্ডদান করিলে পিতৃ-মাতৃ-ঋণ মুক্ত হওয়া যায় । মৌনী অমাবস্যাতে একটি মেলা বসিয়া থাকে । সেই সময় কাশীস্থ দোকানদার ও বহুতর যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে । একটি প্রশস্ত সরোবর আছে তাহাতে স্নান, তর্পণানন্তর তত্বীরে পিণ্ডদান করিতে হয় । পিণ্ডদানের দ্রব্য ও ব্রাহ্মণ ঐ স্থানেই পাওয়া যায় । শাস্ত্রে এই তীর্থের অপর একটি নাম “কাম্পিলা তীর্থ” । পিণ্ডদানানন্তর তথায় কাম্পিলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে হয় ।

ষাতিগণের দর্শনীয় ও পূজনীয় সংক্ষেপে শেষ করা হইল । এই কাশীক্ষেত্রে দর্শনীয় ও পূজনীয় এতই শিবলিঙ্গ আছেন যে, স্বয়ং ব্রহ্মাই তাহার নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তখন অন্তপরে কা কথা । যে স্থানে সমস্ত জীবন দর্শন ও পূজা করিয়া শেষ করা যায় না, তথায় ৪।৫ দিনে কত কি দর্শন হইবে ? সে যাহা হউক, কাশীতে কুমারী, সধবা, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী ভোজন যাত্রী-গণের অবশ্য করণীয় মহৎকার্য্য । কাশীস্থিতা ব্রাহ্মণকুমারী গৌরী স্বরূপা জ্ঞান করতঃ বিধিপূর্বক বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া ভোজন

কাশী ধাম ।

করাইবে এবং রজত, কাঞ্চন, মুক্তা প্রভৃতি সাধ্যমত দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবে (১) । সম্বাক্ষেও উক্ত প্রকারে ভোজন করাইবেন । ব্রাহ্মণকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে । ব্রাহ্মচারী এবং দণ্ডীকে গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু প্রদান করতঃ উপযুক্ত ভোজ্যদ্বারা ভোজন করাইবে । অন্যত্র কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হয়, কাশীতে একটিমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সমস্ত দেবতার ভোজন করান হয় (২) । এই কাশীক্ষেত্রে বহুতর কাঙ্গালী আছে ; উহারা অপর তীর্থের কাঙ্গালীর ছায় বিরক্ত করে না । মণিকর্ণিকায়, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার বাড়ীর গমন পথে, দশাশ্বমেধ ঘাটে, কেদারেশ্বরের বাড়ী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে বস্ত্রাঞ্চল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে । যাত্রীগণ স্ব স্ব শতাব্দ্যসূত্রে যথাকথঞ্চিৎ চাউল বুট ইত্যাদি উহাদের বিস্তৃত বসনোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে । কিছু কিছুতেই প্রায় অর্ধসের পরিমাণ চাউলে বুটে প্রাপ্ত হয় । সমাগত যাত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা দুই একমণ চাউল লইয়া মুষ্টি প্রমাণ ভিক্ষা দিয়া থাকেন । সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দানে যে ফল হয়, কাশীস্থ ভিক্ষুকগণকে যত্নপূর্ব্বক মুষ্টিভিক্ষা দানে সেই ফল হয় ।

কাশী অতি পুরাতন সহর । ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত মনোহর সৌধসকল অত্যাচ্চ ভাবে গঙ্গার গহ্বর হইতে সমুখিত হইয়া সূত্র-

(১) পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রজতং স্বর্ণ মৌক্তিকান্ ।

(২) সৰ্বদেবময়ো বিপ্র, নৈতচ্চনমন্যথা ।

তীর্থ-কাহিনী ।

প্রথিত মালার গ্রার ধনুকাকারে বিরাজিত থাকায় গঙ্গার সেতু পার হইবার সময় অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন হয়(১) । বিবিধ রাগে সুরঞ্জিত ও পরিশোভিত উচ্চ উচ্চ সুরম্য হর্ম্যরাজী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিরাজিত থাকায় বোধ হয় ফল পুষ্পমালা আকাশশরীরে স্থাপিত হইয়াছে । ঐ সকল সমুন্নত প্রাসাদশ্রেণীর মধ্যে যে অত্যুচ্চ স্তম্ভদ্বয় দৃষ্ট হয়,

(১) বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ মহাকবি স্বর্গীয় হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর “কালীদৃশ্য” অতি উৎকৃষ্ট কবিতা । তাহাতে কালীর স্নন্দর বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

“হে দুর্গে দুর্গতিহরা কালীধর গৃহিণী—

ভিখারী শিবের তরে

স্থাপিলে কি মন্ত্ৰ’পরে

এ স্নন্দর বারণসী, ওগো শিব-মোহিনী !

বিশাই গঠিলা কিনা জানিলা এ নগরে,

দেখি নাই ফাঁসী পুরি

“পারিস”—ধরা স্নন্দরী ;

কিস্ত যা দেখেছি চক্ষে

এ ভুবনে—কারো বক্ষে

এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে ।

যাই থাক তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—

একত্র করিলা ভব

কালীতলে দয়াময়ী দীন-দুঃখী-পালিকে !

কাশী ধাম ।

উহাকে লোকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে । বাস্তবিক উহা বেণী-
মাধবের ধ্বজা নহে । ঔরঞ্জীব বাদসাহের কৃত মনুমেন্ট । বেণী-
মাধবের দেবালয়ের সন্নিকট বলিয়াই লোকে উহাকে বেণীমাধবের
ধ্বজা বলে । নগরের মধ্যস্থলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির । পূর্বতন মন্দির
হিন্দুঘোষী পাপিষ্ঠ যবনাধীশ্বর ঔরঞ্জীব ধ্বংস করিয়া তথায়
মসজিদ গঠন করে । অদ্যাপি মন্দিরের স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তর নির্মিত
পূর্বস্তম্ভন প্রকাণ্ড বৃষটী জ্ঞানবাণীর নিকট উক্ত মসজিদ দিকে
মুখ করিয়া আছে । পরে পুণ্যশীলা খ্যাতনামা মহারানী অহল্যা
বাই কর্তৃক বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়া বিশ্বনাথ : স্থাপিত

হিমাদ্রি-ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে

নাহিক এমন প্রাণী,

হেন জাতি নাহি জানি,

কি বাণিজ্য ব্যবসার

ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার

আশা কার যে না আসে অন্তর্পুরা নগরে,

আমিও ভিখারী এই ভব রাজ্য ভিতরে,

কে দিবে আমারে শিক্ষা—

পাব কি আমার দীক্ষা

প্রবেশিলে ঐ পুরে অর্দ্ধ দক্ষ অন্তরে ?—

হু'ধারে বরণা অসি,

অই কাশী—বারাণসী,

বিরাজে গঙ্গার ফুলে ধ্বজা তুলে অম্বরে ।”

তীর্থ-কাহিনী ।

হন । তৎপরে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ উক্ত মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন । ইদানীন্তন ভক্ত ধনীমণ্ডলী দ্বারা মন্দির-তলস্থ সমস্ত প্রাঙ্গণ মন্দির প্রস্তর মণ্ডিত হইয়াছে । নগরের সমস্ত স্থানই পরিষ্কার করণের ব্যবস্থা হওয়ায় পূর্বের ত্রায় পুতিগন্ধানুভূত বড় হয় না । রাত্রিকালে দীপালোক দ্বারা রাজপথ সকল উদ্ভাসিত হয় । জলের কল হওয়ায় সাধারণের জলকষ্ট দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীরা করভারে প্রপীড়িত হইতেছে । নানাদেশ হইতে নানাজাতীয় লোক আসিয়া কাশীতে সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে । দিন দিনই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । বাঙ্গালী, নেপালী, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, ইংরেজ, খৃষ্টান, হিন্দু, মুশলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলজাতীয় সকল সাম্প্রদায়িক লোকের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে । বাঙ্গালীর শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি পঞ্চ সাম্প্রদায়িক লোকই এইস্থানে বাস করিতেছে । কাশীতে ধর্মের যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায়, অন্য কোন তীর্থে সেরূপ আড়ম্বর দেখা যায় না । নানাदिदेशাগত রাজা, মহারাজা, জমিদার, ধনী, মহাজন প্রভৃতি দেবালয় স্থাপন করতঃ সত্র দিয়া বাস করিতেছেন । ঐ সকল সত্রে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্বারা দুঃখী কাঙ্গালীর ভোজন করান হয় । এইরূপে বহুতর লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতেছে ।

কাশীর বাণিজ্যও অত্যন্ত বিস্তৃত । এতদুপলক্ষেও বহুলোক আসিয়া বাণিজ্যালয় স্থাপন পূর্বক বসবাস করতঃ বাণিজ্য করিতেছে । এইস্থানে বেনারসী শাড়ী নামে অত্যাশুষ্ক শাড়ী প্রস্তুত

কাশী ধাম ।

হয় তাহা ভারতবিখ্যাত । জরির শাল, কুমাল বহুতর আমদানী হইয়া বিক্রয় হয় । সাধারণ কাপড় ধৌত করিয়া নানাবিধ রঞ্জে রঞ্জিত করতঃ দেশ দেশান্তরে প্রেরিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে । লৌহ, পিত্তল, তাম্র, রজত প্রভৃতি ধাতুজাত দ্রব্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়ার্থে দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে । কাশীর শিল্পকার্য্য দেশবিখ্যাত ।

সহরতলীতে অনেক বাজার আছে । তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরগঞ্জের বাজার, ত্রিলোচনগঞ্জের বাজার, চেতগঞ্জের বাজার, চকবাজার, পুরাতন চকবাজার, শেঠীর বাজার, দশাশ্বমেধের বাজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । বাঙ্গালী সকলে দশাশ্বমেধের বাজারেই দৈনন্দিন আহারীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া থাকেন । পরন্তু বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্য—তাহা কেবল এই বাজার ভিন্ন, অন্য বাজারে বিক্রীত হয় না ; বিশেষতঃ এই বাজার বাঙ্গালীটোলার নিকটে হওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । সকল প্রকার তরিতরকারী, ফল, মূল, শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় । কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই,—যিনি যেমন খাদ্য চাহিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন । চাকর, চাকরাণী, পাচক, পাচিকা, মজুর, গুটে বথেষ্ট । গাড়ী, ঘোড়া, পাকী এমন কি হস্তীও ভাড়ায় মিলিয়া থাকে । সহরের স্থানে স্থানে অনাথ আশ্রম, ধর্ম্মশালা, ডাক্তারখানা, হস্পিটাল, স্কুল, কলেজ, বেদবিদ্যালয়, পোষ্টাফিস, থানা, টাউনহল, চর্চ প্রভৃতি আছে । সহর হইতে এক ক্রোশ দূরে শিকরোল নামক স্থানে ইহার

তীর্থ-কাহিনী ।

জেলা—বেনারস । এইস্থানে আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের
প্রধান ষ্টেশন আছে । উহার নাম “বেনারস Cantonment
ষ্টেশন ।”



বিক্র্যাচল ।

বৈবস্বতেন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে ।
শুভোনিশুভশ্চৈবান্য বুৎপৎস্মেতে মহাসুরৌ ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদা গর্ভ সন্তুবা ।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিক্র্যাচল নিবাসিনী ॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

অর্থঃ

দেবী বলিলেন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে আবার
শুভ নিশুভ নামক অন্ত মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে । সে সময়
আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ বিক্র্যাচলে
অবস্থান পূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিব ।

মিরজাপুর জেলার পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে তীর্থ-স্থান দুইটি ।
একটি ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে সহরের মধ্যে, ইনি চতুর্ভুজা
কালিকা মূর্তি । অপরটি বিক্রা পর্বতোপরি অষ্টভুজা বিক্র্যবাসিনী
মূর্তি ।

হাওড়া হইতে ৪৬৩ মাইল—ভাড়া (৪৥৭/১০) চারি টাকা সাড়ে
দশ আনা । কাশী হইতে মোগল সরাই হইয়া বিক্র্যাচল ষ্টেশন
৪৫ মাইল, রেল ভাড়া—আট আনা ।

তীর্থ-কাহিনী ।

আমরা ষাটটার সময় ট্রেনে অবতরণ করিলাম । গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিবা মাত্রই পাণ্ডার দর্শন (১) পাইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম । প্রায় ১ মাইল গমন করিয়া সহরের মধ্যে পাণ্ডা-ঠাকুরের আনয়েই জিনিসাদি রাখিয়া মাতৃ দর্শনার্থ চলিলাম । সহরের মধ্য দিয়া উচ্চ নিম্ন প্রস্তর নির্মিত পথ অতিবাহিত করিয়া মায়ের বাড়ীতে পৌঁছিলাম । পথিমধ্যে ফুলবিষপত্রের দোকান হইতে কিছু কিছু ফুল ও বিষপত্র লইলাম । অঙ্গনের মধ্যস্থলেও আসে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে । মধ্যস্থলের মন্দিরে চতুর্ভুজা মা কালিকা বিরাজিতা । মন্দিরের দ্বারটি অতি ছোট, পুষ্প হস্তে এই দ্বার দিয়া ঢুকিয়া দেখিলাম,— মন্দিরের মধ্যে মা লৌহ শিক দ্বারা বেষ্টিত আছেন । “মা যেন অপরাধিনী হইয়া চির কারাবাস ভোগ করিতেছেন” ॥ হায় ! যার নাম স্মরণে, দর্শনে, পূজনে ভব-কারা মোচন হয়—তিনি আজ কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়া চির কারাগৃহে বাস করিতেছেন !!!

আমি উক্ত লৌহ শিকের মধ্য দিয়া চতুর্ভুজা বিদ্যাবাসিনী মায়ের নিকটে যাইয়া পুষ্প মাল্য অর্পণ করতঃ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলাম । প্রাঙ্গণে অত্যাশ্রয় দেব দর্শন করিয়া সন্ধ্যা অতীত সময়ে বাসায় ফিরিলাম । আসিবার কালে বাজার হইতে জলযোগের দ্রব্যাদি লইয়া আসিলাম । সে রাত্রে আমাদের তদ্বারাই একরূপ জলযোগ হইল ।

বিক্র্যাচল ।

পরদিবস আমরা কয়েকজনে মিলিত হইয়া মায়ের পূজা ও ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলাম । আহারাশ্বে অষ্টভূজা দেবী দর্শনার্থ পাণ্ডা-ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম । সহর পরিত্যাগ করতঃ ষ্টেশন বাম-ভাগে রাখিয়া রেল লাইন অতিক্রম পূর্বক পশ্চিম মুখে এক মাইল গমন করিয়া সঙ্কীর্ণ পথ পাইলাম । এই পথ ধরিয়া আরও এক মাইল পরিমাণ যাইয়া পর্বতারোহণ করিতে হইল । এই উঁচু-নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়াই সিঁড়ি প্রাপ্ত হইলাম । এই সোপানাবলী দ্বারা অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম । প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট ছোট গৃহ, পার্শ্বেই পর্বত খোদিত ছোট মন্দির । ক্ষুদ্র দ্বারপথে এই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম মা ভয়ঙ্করী অষ্টভূজা মূর্তিতে বিরাজিতা আছেন । মূর্তিখানি অতি ছোট । তুমি কি মা শুভ নিশ্চুভ মহাদৈত্যঘাতিনী !! তবে কেন, মা, তোমার এত ক্ষুদ্র মূর্তি ? যথোপযুক্ত পূজা ও ভোগের অভাবেই কি মূর্তি খর্ব করিয়াছ ? আমরা তথায় আরও কয়েকটি মূর্তি দর্শন করিয়া তথা হইতে অন্য পথে বিক্র্যাচলের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । এ ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোরম । আমরা রমণীয় ক্ষেত্রে সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে আরও কয়েকটি দেব মন্দির দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম । এই স্থানের কার্য শেষ করিয়া পর দিবসেই প্রয়াগ অভিমুখে রওনা হইলাম ।

প্রয়াগ ।

সর্বৈভ্যো পিহি তীর্থেভ্য স্তীর্থরাজ বিশেষ্যতে ।

স্বর্গদো মোক্ষদশৈব সর্বকামফলপ্রদঃ ॥

সিতাসিত্তে সরিছেষ্ঠে যত্রাস্তাং সুর দুর্লভে ।

যাত্রাপ্লুতো নরঃ পাপঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

ক্ষেত্রং প্রজাপতেঃ পুণ্যং সর্বেষামেব দুর্লভং ।

লভ্যতে পুণ্য সন্তারৈ নান্যথার্থস্য রাশিভিঃ ॥

দময়ন্তীং কলিং কালং কলিহতনয়া শুভা ।

আগত্য মিলিতা যত্র পুণ্যা স্বর্গ তরঙ্গিণী ॥

প্রকৃষ্টং সর্বযজ্ঞেভ্যঃ প্রয়াগমিতি গীয়তে ।

যজ্ঞনাং পুনরাবৃন্তি ন প্রয়াগার্জবজ্রনাং ॥

যত্র স্থিতঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ শূলটঙ্কোমহেশ্বরঃ ।

তত্রাপ্লুতানাং জন্তুনাং মোক্ষধর্মোপদেশকঃ ॥

যজ্ঞাগতানি পাপানি বহু জন্মার্জিতান্যপি ।

প্রয়াগ নামশ্রবণাৎ ক্ষীয়ন্তেতীব বিহ্বলং ॥

ইয়ং বেনীহি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণো বত্স্যাস্ততঃ ।

জন্তোর্বিশুদ্ধ দেহস্য শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাপ্লুতস্য চ ॥

প্রয়াগ ।

যত্র লক্ষ্মীপতিঃ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠাদেত্যমানবান্ ।

শ্রীমন্মাধবরূপেণ নয়েদ্বিষ্ণোঃ পরংপদং ॥

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ স্নানাৎ গঙ্গায়মুনা সঙ্গমে ।

নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্যঃ সেবনাৎ স্মরণাদপি ॥

মোহ নিবর্ততে সদ্যো জন্মান্তর শতোদ্ভবঃ ॥

(কানীথণ্ডে)

অর্থাৎ

অপরাপর সমস্ত তীর্থ হইতে এই বিশিষ্ট “প্রয়াগ তীর্থ” মোক্ষ এবং সর্বকামফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই জন্তই ইহাকে তীর্থরাজ বলে। এইস্থানে সুরগণেরও তুল্য গুরু ও কৃষ্ণ বর্ণা শ্রেষ্ঠা নদী (গঙ্গা ও যমুনা) অবস্থিত। এইস্থানে পাপী নরও স্নান করিলে পরমব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। যেখানে পবিত্রা সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া কলি এবং কালভয় দমন করিতেছেন, প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই পুণ্যক্ষেত্র সকলের পক্ষেই অত্যন্ত তুল্য। বহুতর পুণ্যবল ভিন্ন কেবল অর্থরাশি ব্যয় দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না। সমস্ত যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে “প্রয়াগ” বলিয়া থাকে। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের পুনরাবৃতি (জন্ম) হয়; কিন্তু প্রয়াগস্নাত ব্যক্তির পুনরাবৃতি হয় না। এই প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্বয়ং মহাদেব শূলটঙ্করূপে বিরাজিত থাকিয়া প্রয়াগস্নাত জীবগণের মোক্ষধর্মোপদেশ করিতেছেন। বহুজন্মার্জিত মজ্জাগত

তীর্থ-কাহিনী ।

পাপরাশিও প্রয়াগ নামের মহিমা শ্রবণ মাত্রেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । এইখানে শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় স্নান করিলেও জীবগণ বিগুহ-দেহী হইয়া ব্রহ্মপথে গমন করে । এই ত্রিবেণীই ব্রহ্মস্থান গমনের পথ । প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া শ্রীমন্মাধবমূর্তিতে বিরাজিত থাকিয়া মানবদিগকে বিষ্ণুর পরমপদ প্রদান করিতেছেন ; তাঁহাকেই বেণীমাধব বলে । গঙ্গা, যমুনা, সঙ্গম দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গম স্থানে স্নান, এবং সেবন ও স্মরণ করিলে শত জনের মোহও বিদূরিত হয় ।

হাওড়া হইতে এলাহাবাদ ৫৬৪ মাইল,—রেলভাড়া পাঁচ টাকা সোওয়া সাত আনা । কাশীধামে শিকরোল ষ্টেশন হইতে এলাহাবাদ ভাড়া এক টাকা এক আনা । ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে এই তীর্থরাজ—প্রয়াগ । এলাহাবাদ দুর্গের পূর্বদিকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন স্থানেই স্নানের ঘাট । ষ্টেশন হইতে ঘোড়গাড়ী বা পদব্রজে যাওয়া যায় ।

আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করতঃ গেটে টিকিট দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম । ধর্মশালায় একটি কক্ষে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া তালাবন্ধ করতঃ তিনজনে ছয় আনা ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া একাযোগে প্রসিদ্ধ তীর্থ ঘাটে পৌঁছিলাম । সঙ্গমস্থলে উত্তরদিক হইতে গঙ্গা ও পশ্চিমদিক হইতে যমুনা আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন ; সরস্বতী অন্তঃসলিলা । স্নানের ঘাটে প্রয়াগীরা—স্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা ও অশ্ব, হস্তী, গজ,

প্রয়াগ ।

পক্ষী প্রভৃতির প্রতিমূর্তি দ্বারা নিজ নিজ স্থান সকল পরিচিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন । ঐ সকল পতাকা উচ্চ উচ্চ বংশদণ্ডাগ্রে সংযোজিত হইয়া বায়ুতে পং পং করিয়া উড়িতে থাকায় দূর হইতে অতি সুন্দর দেখা যায় ; বোধ হয় যেন বাণিজ্যতরীতে নিশান উড়িতেছে । ঘাটে অসংখ্য লোক গণ্ডগোল করিতেছে । গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত, নাপিত, ভিক্ষুক প্রভৃতি যাত্রীদিগকে লইয়া বচসা ও টানাটানি করিতেছে । বচসা কখন কখন হাতাহাতীতেও পরিণত হয় । পাণ্ডা প্রভৃতির কাণ্ড কারখানা দেখিয়া যাত্রীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে । এদিকে কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছেন, কেহ সর্বাস্থে গঙ্গামূর্তিকার লেপন করিতেছেন, কেহ শ্রদ্ধ করিতেছেন, কেহ দান করিতেছেন । কোথাও নাপিত যাত্রীদের মস্তকাক্ষি মুণ্ডন পূর্বক পূর্ব বন্দোবস্ত অস্বীকার করতঃ কাষদা করিয়া নুতন বন্দোবস্ত করিতেছে । কোন পাণ্ডা দক্ষিণার অর্থ লইয়া নানা অনর্থ করিয়া বেশী দক্ষিণা লইতেছে । তীর্থকণ্টকদিগের মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে । সকলেই স্বার্থানুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছে । এ হেন মহা গোলযোগের মধ্যে আমরা যেন চিরপরিচিত ভাবে মুণ্ডনাস্তে স্নান করিলাম । হুই একজন পাণ্ডা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের কথাবর্ত্তা শুনিয়া ও হাবভাব দেখিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন । আমরাও তখন “যঃ পলায়তি স জীবতি” এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিলাম । পরে স্নযোগ-

তীর্থ-কাহিনী ।

মত একজন ব্রাহ্মণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তৈরিক কার্য ও ব্রাহ্মণভোজনাদি সম্পন্ন করিলাম ।

এইস্থানের প্রয়াগীরা যেরূপ অর্থপিশাচ, অভদ্র, জগতে বোধ হয় অন্য কোন তীর্থে এরূপ নাই । পাণ্ডাগণ যাত্রী লইবার জন্য ষ্টেসনে পূর্বেই উপস্থিত থাকে । এই সহরে তিনটা ষ্টেসন আছে, এলাহাবাদ, নাইনী ও প্রয়াগ । এই সকল ষ্টেসনে গাড়ী-ওয়ালা, একাওয়ালা ও অন্যান্য দালালগণ সর্বদা যাত্রীগণকে ধোকা দিয়া যে কোন পাণ্ডার নিকট লইয়া যায় । সেই পাণ্ডা যাত্রিকে আপন কায়দায় পাইয়া নানারূপ জোরজুলুম করিয়া তাহাদের অনিচ্ছায় সাধ্যাতীত অর্থ আদায় করতঃ উক্ত দালালগণের সহিত ভাগ করিয়া লয় । অনেক মুসলমান দালালগণ দাড়ী গোপ মুণ্ডন করতঃ স্বয়ং পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিয়া যাত্রীগণকে ধোকা দেয় । যদি কোন যাত্রী ধর্মশালায় যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ধর্মশালাতে প্লেগাদি বহু সংক্রামক রোগের ভয় প্রদর্শন করতঃ অন্য ধর্মশালার নাম করিয়া যে কোন পাণ্ডার বাড়ীতে লইয়া গিয়া পাণ্ডার নিকট হইতে অগ্রিম উচ্চ মূল্য লইয়া সেই যাত্রিকে বিক্রয় করে ।

উক্ত দালাল ব্যতীত কানীবাসী ও গয়ালী দালালগণ রাস্তায় যাত্রীর সঙ্গ লইয়া প্রয়াগে আসিয়া আপন মিলের পাণ্ডার নিকট লইয়া গিয়া সেই পাণ্ডার নিকট হইতে দালালী গ্রহণ করে । এতদ্ব্যতীত যাত্রীগণের সহিত তাহাদের প্রতিবেশী আত্মীয় সুপরিচিত “সেঁতো” নামধারী আরও এক প্রকার দালাল থাকে ।

প্রয়াগ ।

তাহারা প্রত্যেক তীর্থেই আপন আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকট লইয়া যাইয়া যাত্রী দ্বারায় সেই সেই তীর্থের ক্রিয়াকাণ্ড বাবদ অত্যধিক অর্থ প্রদান করাইয়া স্বয়ং অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে । ধর্মপ্রাণ সরল যাত্রীগণ ঐ সকল দুষ্ট দালালগণের চাতুরী বুদ্ধিতে না পারিয়া প্রায়ই লাক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শেষ ঋণপত্র দিয়া থাকেন । এ জন্ত যাত্রীগণ তীর্থে আসিবার পূর্ব হইতেই সর্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন । এই তীর্থে নাইনী কিম্বা প্রয়াগ নামক ষ্টেশনে যাত্রীগণ অবতরণ করিলেই ঐরূপ কোন না কোন দালালের হস্তে পড়িতেই হইবে । এ কারণ এই তীর্থের টিকিট খরিদ করিবার সময়ই এলাহাবাদ ষ্টেশনের নাম বলিয়া টিকিট খরিদ করিবেন এবং এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়া তত্রত্য ধর্মশালায় থাকিয়া প্রয়াগের কার্য্য করাই নিরাপদ । এই ধর্মশালায় আগন্তুক ব্যক্তি মাত্রেই তিন দিবস বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান পাইয়া থাকেন । পূর্বোক্ত দুষ্ট প্রতারকগণের এইস্থানে প্রবেশের অধিকার নাই । সময় সময় অত্যধিক যাত্রীর সমাগম হওয়ায় ধর্মশালায় স্থানান্তর হয় । এরূপ অবস্থায় দারাগঞ্জে যাইয়া বাসা ভাড়া লইয়া প্রয়াগের কার্য্য করাই উচিত । এইস্থানের কার্য্য মুণ্ডন, স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দান, দর্শন, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি । এই তীর্থে আসিয়া কেবল মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেলেই তীর্থের কার্য্য হয় না । অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস এবং সাধ্যানুসারে উপরোক্ত কার্য্যসকল করা একান্ত কর্তব্য । পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ মুণ্ডন করিবেন । সধবা স্ত্রীগণ সমস্ত কেশভূষণ

তীর্থ-কাহিনী ।

অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলি ছেদন করিবেন । তৎপর গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনস্থানে কামনাশীল হইয়া স্নানান্তর তর্পণ করিয়া যথাসাধ্য দানাদি উৎসর্গ পূর্বক শ্রদ্ধা করিবেন । তদনন্তর ত্রীশ্রীবেণীমাধব দর্শনার্থ দারাগঞ্জে যাইতে হয় । দারাগঞ্জ ত্রিবেণীর ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবহিত । তত্রত্য বেণী-ঘাটে স্নানান্তর বেণীমাধব নামক বিষ্ণুমূর্তি দর্শন কর্তব্য । তিনটি মহা মাধব মধ্যে ইনি একতম । বেণীঘাটের পর পারে কিছুদূরে গুহকাণয় । দশরথাস্বজ শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে এই গুহক চণ্ডালের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ললিতাদেবী (১)—বিষ্ণুচক্রেচ্ছদিত সতীর হস্তদ্বয়ের দশাঙ্গুলি তীর্থরাজ প্রয়াগের যেস্থানে পতিত হয় ঐ পীঠস্থানে ললিতা দেবী বিরাজিতা এবং তৎপাশ্বে ভব ভৈরব আছেন । যাত্রিগণ তথায় গমন করিয়া দর্শন ও পূজা করিবেন । তদনন্তর সপরাঙ্গ বাসুকি দর্শন করিবেন । ইনি গঙ্গার বাঁধাঘাটের উপরিস্থ একটি মন্দির মধ্যে আছেন । মন্দিরটি একটি বৃহৎ কৃত্রিম সর্প দ্বারা ঘোড়িত । এই বাসুকিরাজের ঘাট নগর মধ্যে সকল ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । তথা হইতে যাইয়া শিবকাটি দর্শন করিতে হয় । ত্রিবেণী ঘাটে দুর্গমধ্যে অক্ষয় বট ও ভীমের গদা আছে ।

স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে বেণীমাধব দর্শন করিয়াই অক্ষয় বট দর্শনের নিয়ম থাকিলেও তাহা কাহার ভাগ্যে ঘটে না । কারণ

(১) অঙ্গুলীকৃত হস্তস্থ প্রয়াগে ললিতা ভবঃ । পীঠমালা ।

প্রয়াগ ।

ইংরেজ রাজের আধুনিক আইনানুসারে বিনানুমতিতে তথায় প্রবেশ করিতে পারা যায় না, সুতরাং দর্শন হয় না । ত্রিবেণীর ঘাট হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আলোপী দেবী আছেন । প্রয়াগের উত্তর-পশ্চিম দিকে দুই ক্রোশ দূরে ভরদ্বাজ মুনির পবিত্র আশ্রম । পদব্রজে কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া যায় । এই তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রতি বার বৎসর অস্তে কুম্ভ মেলা হয় । প্রতি বৎসর মাঘমাসে কল্লবাস উপলক্ষে বহুতর যাত্রী আগমন করতঃ বাসা ভাড়া করিয়া থাকিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগের সেবা করেন । তৎকালে স্থানীয় লোকে ভাড়া দিবার জন্য বহুতর গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখেন ।

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন সহর ; ইহা পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান জাতির রাজধানী ছিল । কেলাটি হিন্দু রাজার সময়ে গঠিত । বিভিন্ন জাতীয় রাজার অধিকার কালে তাহাদেরই স্বেচ্ছামত কিছু কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র । ভারতের কত দেশ, কত রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু কেলাটি আজ পর্য্যন্তও বর্তমান আছে । এই সহরে অনেকগুলি দেখিবার বিষয় আছে । লাইব্রেরী, মিয়র্স কলেজ (Muir Central College), খসরুবাগ্ বাগান, ডিউক অব্ এডিনবরা সাহেবের এলফেড্ পার্ক নামে বাগান, মেয়ো হল (Mayo Hall) থর্নহিল্ন্স মেমোরিয়াল নামক মনোহর গৃহ প্রভৃতি দর্শনীয় । এখানে বাদসাহী মণ্ডাই, রানী মণ্ডাই, দারাগঞ্জ, সাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, মুটগঞ্জ, প্রভৃতি অনেকগুলি উপনগর আছে । বহুতর বাঙ্গালী বিদ্যকর্মোপলক্ষে বসবাস করিতেছেন । আহারীয় দ্রব্য সমস্তই পাওয়া যায় ; জলবায়ুও অতি স্বাস্থ্যকর ।

মথুরা ।

মথুরেতিচ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম ।
স। রম্যাচ সুশান্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম ॥
শৃণু দেবি ! যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীং ।
তন্নিবাসি নরোযাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
মহামাঘ্যাং প্রয়াগেতু যৎফলং লভতে নরঃ ।
তৎফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং দিনে দিনে ॥
পূর্ণ বর্ষ সহস্রেতু বারানস্তান্তু যৎফলং ।
তৎফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং ক্ষণেন হি ॥
মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোন্যত্র কুরুতে রতিং ।
মুঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মায়য়া মম ॥
মথুরাং সমনুপ্রাপ্য শ্রদ্ধাং কৃৎস্না দিনে দিনে ।
তৃপ্তিং যাস্তীহ পিতরো যাবৎ স্থিত্যগ্রে জন্মনঃ ॥
যে বসন্তি মহাভাগে ! মথুরা মিতরে জনাঃ ।
তেপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং যৎ প্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥
বৈবস্বত স্বসা রম্যা যমুনা লোকপূজিতা ।
তত্র স্নান পরো দেবি ! মম লোকে মহীয়তে ॥

তথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ মম কৰ্ম্মপরায়ণঃ ।
 ন জায়তে স মৰ্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুৰ্ভুজঃ ॥
 বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং ।
 তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি ! মম লোকে মহীয়তে ॥
 সৰ্ব্ব তীর্থেষু যৎস্নানং সৰ্ব্ব তীর্থেষু যৎফলং ।
 তৎফলং লভতে দেবি ! দৃষ্টাদেবং গতশ্রমং ॥
 ন চ যজ্ঞেন তপসা ন ধ্যানেন চ সংযমৈঃ ।
 তৎফলং লভতে দেবি ! স্নাতো বিশ্রান্তি সংজ্ঞকে ॥

অৰ্থাৎ

আমার জন্মভূমি অতি রমণীয়, শাস্তিপ্ৰদ মথুরা নামক ক্ষেত্র—
 অতি শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র । ইহার তুল্য আমার প্রিয়ক্ষেত্র আর নাই । এই
 ক্ষেত্রবাসী মানবের মোক্ষ নিশ্চিত । মাঘমাসে প্রয়াগবাসে যে ফল
 হয়, মথুরাবাসী প্রতিদিনই তৎফল প্রাপ্ত হয় । পূর্ণ সহস্র বৎসর
 কাশীধামে বাস করিলে যে ফল হয়, মথুরা ক্ষেত্রে ক্ষণমাত্র অবস্থিতি
 করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হয় । যে মানব মথুরা পরিত্যাগ করতঃ
 অন্য স্থানে বাস করে, সেই মূঢ়মতি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া
 পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করে । মথুরা প্রাপ্তি মাত্রে যে আদ্বৈত করে
 তাহার পিতৃগণ মথুরা স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন । যে
 সকল ইতর প্রাণী মথুরাতে অবস্থিতি করিতেছে তাহারাও অল্পে
 মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । ধৰ্ম্মরাজ-ভগিনী লোকপূজিতা যমুনায় যে

তীর্থ-কাহিনী ।

মানব জ্ঞান করে সে অন্তে আমার ধামে গমন করে । মথুরাতে মৎকর্ষপরায়ণ মানবের মৃত্যু হইলে তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না । ত্রৈলোক্যবিখ্যাত বিশ্রামঘাটে জ্ঞান ও বিশ্রামঘাট দর্শন করিলে যে ফল হয়, কোন যাগযজ্ঞ তপস্যাতেই সে ফল হয় না ।

হাওড়া হইতে মথুরা ৮৮৬ মাইল,—রেলভাড়া আট টাকা এক আনা । হাওড়া হইতে হাতরস জংসন পর্য্যন্ত এক গাড়ীতে আসিয়া, পরে অন্য গাড়ীতে উঠিয়া মথুরা যাইতে হয় । নিজ মথুরা ধামেই ষ্টেশন ।

এই স্থানের কার্য্য জ্ঞান, তর্পণ এবং বিশ্রামঘাটে ও কুব্জঘাটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান ; আর প্রধান প্রধান লীলাস্থলসকল দর্শন । মথুরাবাসী পাণ্ডাগণই পৌরহিত্য কার্য্য জন্য প্রতি যাত্রীর নিকট এক টাকা হিসাবে লইয়া থাকেন । হীনাবস্থা দরিদ্র ব্যক্তির নিকট কিছু কমও লইয়া থাকেন । পাণ্ডাগণের কোনরূপ জোরজুলুম নাই । যাত্রীদের সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহাদিগের বিদ্যাভ্যাস চর্চ্চা অতি কম । সকলেই ছুষ্ঠ, পুষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও ভোজনপটু । যাত্রীর আয় দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় ।

আমরা ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক জনৈক পাণ্ডার সঙ্গে সহরের মধ্য দিয়া বিশ্রামঘাটে উপনীত হইলাম । দেখিলাম যমুনার যতগুলি ঘাট আছে তাহার মধ্যে এই বিশ্রামঘাটই শ্রেষ্ঠ । ইহার শোভা অতি মনোহারিণী । সন্ধ্যার সময় এই স্থানে যমুনা আরতি দর্শন করিলে মনঃপ্রাণ একেবারে আনন্দে বিভোর হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া যায় । ঘাটটী যমুনার মধ্য



বিশ্রামঘাট, মথুরা ।

মথুরা ।

হইতে প্রস্তর দ্বারা বহুদূর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে বাঁধান । স্থানে স্থানে ষাণ্ডিগণের বিশ্রাম জন্য প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ । তথায় বসিয়া বেশ পূজা পাঠ করা যাইতে পারে । যমুনার জলে বা তন্ত্রীরে থুথুফেলা, বস্ত্রাদি ধোত করা, পাছকা রাখা, ধূম পান করা একেবারে নিষিদ্ধ । যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত আচরণ করে তবে স্থান-বাসী যিনি দেখিবেন তিনিই তাহাকে নির্যাতন পূর্ব্বক দূর করিয়া দেন । জলে অসংখ্য কচ্ছপ সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে । সময় সময় কোতুকদর্শী ষাণ্ডিগণ ভাজাছোলা ছিটাইয়া দিয়া উহাদের নির্ভীক ভাব দর্শন করিয়া থাকে । জনজন্তুগণের যেরূপ উদার ও অমায়িক ভাব, বৃক্ষবিহারী শাখামৃগগণের ব্যবহার কিন্তু সেরূপ নয় । উহারা বানর—চিরদিনই বানর । তীর্থবাস করিয়াও বাঁহুরে বুদ্ধি বদলায় নাই, বরং বদমায়েসী কিছু বেশী বাড়িয়াছে । ষাণ্ডিগণ একটু অসাবধান হইলেই তাহাদের ঘাটী, বাটী, পোটলা-পুটলী লইয়া গৃহের ছাদে উঠিয়া বসে । কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়া স্তব-স্ততি করিলে তবে দয়া করিয়া অপহৃত দ্রব্য পুনঃ প্রদান করে ।

সে যাহা হউক, আমরা অতি সতর্কতার সহিত একে একে জলে নামিয়া সশঙ্কচিত্তে অবগাহন করিয়া উপরে উঠিলাম । তথায় সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া ঋবঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম । আহারাঙ্তে প্রধান প্রধান স্থান দর্শনে বহির্গত হইলাম । ঋবঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পশ্চিমমুখে রেলরাস্তা পার হইয়া

তীর্থ-কাহিনী ।

ভূতেশ্বর (১) উপস্থিত হইলাম । যাইবার সময় পশ্চিমধ্যে ধ্বংসাবশিষ্ট কংসালয় ও দেবকীর কারাগার দেখা যায় । ভূতেশ্বর, ইনি এই স্থানের ক্ষেত্রপাল দেবতা, ইহার দর্শনে সমস্ত বৃন্দাবন দর্শনের কাজ হয় (২) । একটি মন্দির মধ্যে ইনি বিরাজিত আছেন । তৎসন্নিহিত অপর মন্দির মধ্যে পাতাল-তলবাসিনী দেবী, বোধ হয় ইনিই উমা নাম্নী পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী । স্থানীয় লোকে বলে ইনি কংসোপাসিতা—বহু কাল হইতেই ইনি পাতাল-তলবাসিনী নামে খ্যাতা । তথায় দর্শন ও প্রণামান্তে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে বালকৃষ্ণ দর্শন করিলাম । ইনি চতুর্ভুজ—বিষ্ণুমূর্তি । কংস-কারাগৃহে বসুদেব এই মূর্তিই প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন । তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কংসের চিপি দর্শন করিলাম । এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন পুরাকালের দর্শনীয় অল্প কিছুই নাই । সহরের মধ্যে অনেক স্থানে স্থাপিত দেবালয় আছে । পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে সেগুলি দর্শন করাইয়া থাকেন । দোলযাত্রা সময়ে ঐ সকল দেবালয়ে ভারি ধুম হইয়া থাকে । সে সময় ফাগ-খেলায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মাতোয়ারা হইয়া উঠে ।

(১) বৃন্দাবনে কেশজলে উমা নাম্নী চ দেবতা ।

ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ ॥ (পীঠমালা ।)

(২) মথুরায়াঞ্চ দেবদ্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যতি ।

ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব সম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥ (বরাহ সংহিতা ।)

তখন পাণ্ডাগণের ও স্থানবাসীর আনন্দের পরিসীমা থাকে না । আমরা ঐ সকল বিগ্রহ দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় যমুনায় আরতি দর্শনার্থ বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম । ক্ষণকাল মধ্যেই যাত্রীগণ এবং স্থানবাসী জনগণ দ্বারা বিশ্রামঘাট পূর্ণ হইয়া গেল । শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাসর প্রভৃতির যুগপৎ বাদ্যোদ্যমে দিগ্‌মণ্ডল শকারমান হইল ; ঠিক এমি সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ একটা বহুদীপ বিশিষ্ট প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের কাড় হস্ত-দ্বয়ে ধারণ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন । চতুর্দিক্ হইতে লাজ ও পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল । আহা ! তখন যে সেই স্থান কি এক অপূর্ব শোভায় পরিশোভিত হয় তাহা বর্ণনাশীত । প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে যমুনার বহু দূর পর্যন্ত উদ্ভাসিত ও লাজপুষ্প দ্বারা জল সমাচ্ছন্ন হইল । সেই ভাসমান লাজ ভক্ষণার্থে কচ্ছপমণ্ডলী একত্র হওয়ায় জলভাগ অদৃশ্যপ্রায় হইয়া উঠিল । জলে কচ্ছপের মহা মহোৎসব, স্থলে দর্শকমণ্ডলীর অপার আনন্দোৎসব ; উভয় আনন্দ মিলিয়া মিশিয়া এক অপূর্ব মহানন্দে পরিণত হইল । এই সকল দেখিয়া কোন্ পাষাণের হৃদয় জ্বব না হয় !! কাহার হৃদয়েই বা ভক্তিরসের উদ্বেক না হয় !!! এই সকল দেখিয়া মহামহিমাবিত, প্রেমাধার শ্রীশ্রীমথুরানাথের প্রেম-জ্যোতিঃ ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ে বিকীর্ণ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ধন্তবাদ ও প্রণিপাত করিয়া কৃতার্থ হইলাম । কিয়ৎক্ষণ পরেই দর্শক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে গুরুগম্ভীর রবে জয় জয় ধ্বনি সমুথিত হইয়া আকাশ ও মেদিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া আরতি নিবৃত্ত হইল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

দর্শকমণ্ডলী দীপাগ্নি স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেল ।
আমরাও যমুনার পুতবারি মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতঃ বাসায় প্রত্যা-
বৃত্ত হইলাম ।

মথুরা সহরের পারিপাট্য বিচিত্র ; দর্শক মাত্রেই নয়নরঞ্জন ।
সহরটা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । ইহা ইংরাজ রাজের একটা
জেলা, সুতরাং রাজকীয় কার্যালয় প্রভৃতি আছে । স্থানীয় জন-
বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ । নিরামিষ আহাৰ্য্য সমস্তই সুলভ মূল্যে প্রচুর
পাওয়া যায় । স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নয় ।

মথুরা হইতে আট ক্রোশ দূরে গিরিগোবর্দ্ধন । তথা হইতে
এক ক্রোশ দূরে রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড । মথুরা হইতে আড়াই ক্রোশ
দূরে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ;—তিন ক্রোশ দূরে মহাবন । তথা হইতে অর্ধ
ক্রোশ ব্যবধানে গোকুল । উল্লিখিত সমস্ত স্থান পদব্রজে বা গাড়ীতে
যাওয়া যায় । পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা চারি জনে এক টাকা
ভাড়া বন্দোবস্তে ঘোড়গাড়ী যোগে গিরিগোবর্দ্ধন দর্শনে রওনা
হইলাম । বেলা প্রায় বারটার সময় গিরিগোবর্দ্ধন পৌঁছিলাম ।

গিরিগোবর্দ্ধন—ইহা অপ্রশস্ত অলৌচ একটা পর্বত ।
দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ হইবে । ভূগর্ভেই প্রায়ভাগ প্রোথিত
আছে । পর্বতের এক প্রান্ত মানসরোবরে নিমজ্জিত । তথায়
একটা ছোট মন্দির মধ্যে গিরিধারী দেব বিরাজিত আছেন ।
তাঁহাকে দর্শন জন্য স্থানীয় পাণ্ডারা প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে
এক টাকা হিসাবে লইয়া থাকেন । গিরিধারীকে দর্শন করিতে হইলে
গোবর্দ্ধন পর্বতের উপর উঠিতে হয়, তজ্জন্যই অধিকাংশ যাত্রীর

মথুরা ।

ভাগ্যে দর্শন ঘটে না । ভক্ত মানবগণ গোবর্দ্ধনকেও নারায়ণ বোধে তদারোহণে ক্ষান্ত থাকে । মানসরোবরে স্নান করিয়া তদুদ্দেশে প্রণাম করিয়াই তাঁহার দর্শন শেষ করে । আমরাও তাহাই করিলাম । তারপর আহারান্তে রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড উদ্দেশে রওনা হইলাম । এইস্থান হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড । প্রশস্ত সড়ক পথে পদব্রজে বা ঘোড়গাড়ীতে যাওয়া যায় । আমরা পদব্রজে রওনা হইলাম ।

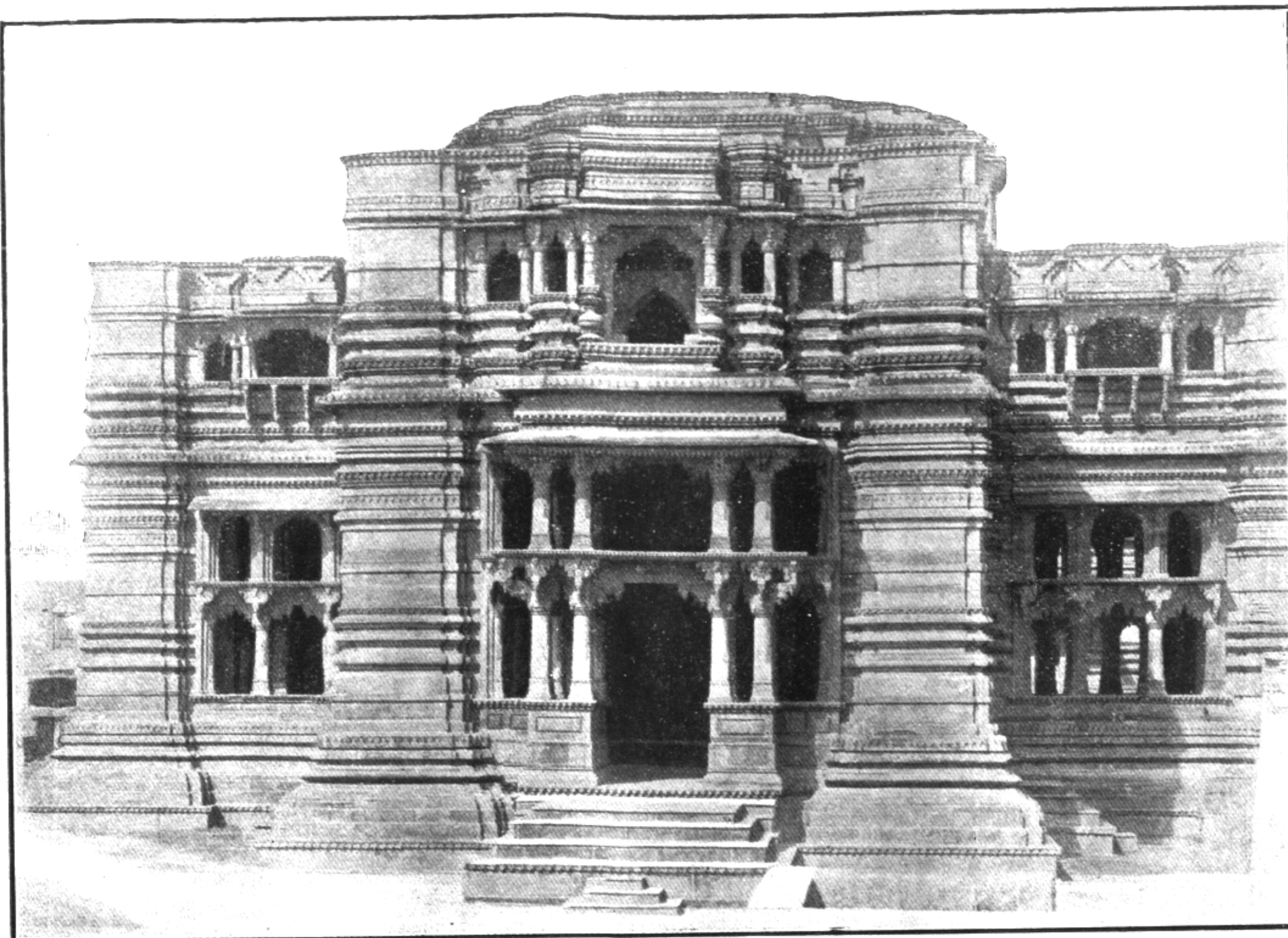
রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড—ইহা প্রশস্ত সরোবরদ্বয়, পাশাপাশি ভাবে নির্মিত । চতুর্দিক প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাধান । উভয়ের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরনির্মিত সেতু থাকায় তদ্বারা গমনাগমনের বেশ সুবিধা আছে, এবং এক কুণ্ডের জল অপর কুণ্ডে অনায়াসে যাতয়াত করিতে পারে । রাধাকুণ্ডের জল অপেক্ষা শ্রামকুণ্ডের জল অত্যন্ত মলিন । প্রথমে এই রাধাকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিয়া পরে শ্রামকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিতে হয় । এই স্নান তর্পণ জন্য তথাকার পাণ্ডাগণ প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে এক টাকা করিয়া লইয়া থাকেন । আমরা তত্রস্থ পাণ্ডা শ্রীশ্রামলাল সিদ্ধিঘোটাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম । তিনি আমাদের সহিত অভদ্রাচরণ করেন নাই । তিনি পূর্বোক্ত বন্দোবস্তের কিছুই লন নাই ; আমরা স্বেচ্ছায় যাহা দিয়াছিলাম তাহাই সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন । এস্থানের কার্য্য কেবল স্নান, তর্পণ ও দর্শন ।

এই স্থানটিকে সাধারণ পল্লী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না । পাবনা জেলার তাড়াসের প্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত

তীর্থ-কাহিনী ।

শ্রীল শ্রীবনমালী রায়, রায় বাহাদুর, এই স্থানে তদীয় পৈতৃক
বিগ্রহ শ্রীশ্রীবিনোদরায় জিউকে স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা
উপলক্ষে সপরিজনে বাস করিতেছেন । এই বাড়ী এখানে
সর্বপ্রধান এবং সুদৃশ্য । আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই এই স্থানে
উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত পাণ্ডার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া
দর্শনীয় যাহা কিছু দর্শন করিয়া পাণ্ডার আলয়েই রাত্রি অতি-
বাহিত করতঃ প্রাতে পূর্বোক্ত কুণ্ডদ্বয়ে স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যা
বন্দনাদি করিয়া পুনরায় গিরিগোবর্দ্ধন আসিয়া একা যোগে
মথুরা আসিলাম । তথা হইতে একা যোগে শ্রীবৃন্দাবন ধাম
রওনা হইলাম ।





গোবিন্দজৌর প্রাচীন মন্দির, বৃন্দাবন।

শ୍ରীରূন্দাবন ।

গুহ্যং গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দ কারকং ।
অত্যদুতং রহঃ স্থানমানন্দং পরমং পরং ॥
দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং মোহনং পরং ।
সর্বশক্তিময়ং দেবি ! সর্বস্থানেষু গোপিতং ॥
সুরাণামপি মূৰ্দ্ধন্যং বিষ্ণোরপ্যতি-দুর্লভং ।
নিত্য-রূন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং ॥
পূর্ণ-ব্রহ্ম-সুখৈশ্বর্য-স্থানমানন্দমব্যয়ং ।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং রূন্দাবনং ভূবি ॥

*

*

*

রাধা-ষোড়শ-নাম্নাঞ্চ রূন্দা-নাম শ্রুতৌ শ্রুতং ।
তস্যাঃ ক্রীড়া-বনং রম্যং তেন রূন্দাবনং স্মৃতং ॥
গোলকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেণ নির্মিতং পুরা ।
ক্রীড়ার্থং ভূবি তন্মাম্না বনং রূন্দাবনং স্মৃতং ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তে)

গোবিন্দাজি-রজঃ-স্পর্শান্নিত্যং রূন্দাবনং শুচিঃ ।
যস্য স্পর্শনমাত্রেন পৃথী ধন্যা জগত্ত্রয়ে ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

গোবিন্দ-দেহতো ভিন্নং পূর্ণ-ব্রহ্ম-সুখাশ্রয়ং ।
মুক্তিস্তত্র যতঃ স্পর্শাৎ তন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে ॥
(পাদ্যে)

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবন গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তর, পূণ্যপ্রদ, পরম আনন্দকর, অতস্মর্য্য স্থান । এই স্থান বিষ্ণুরও অতি চর্তুভ । এই স্থান নিত্য বৃন্দাবন অর্থাৎ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই বিহার করেন বলিয়া ইহার নাম নিত্য বৃন্দাবন । ইহা পূর্ণব্রহ্মের সুখৈশ্বর্য্য স্বরূপ অব্যয় আনন্দদায়ক স্থান । বৈকুণ্ঠাদি ইহার দশাংশের একাংশের সমানও নয় ।

শ্রীরাধার ষোড়শ নাম মধ্যে বৃন্দা একটি নাম । তাহার ক্রীড়ন ক্ষণেই ভগবান তন্মানে এই বৃন্দাবন ধাম নির্মাণ করেন ।

ভগবানের পাদপদারজঃ স্পর্শে বৃন্দাবন ধাম নিত্যই শুচি । এই পবিত্র বৃন্দাবন ধাম দর্শন ও তৎস্পর্শঃ স্পর্শমাত্রে ত্রিজগৎ পবিত্র এবং পৃথিবীও ধন্যা হইয়াছেন । এই পবিত্র রজঃ স্পর্শে জীবের মুক্তি নিশ্চয়, তাহার মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব ।

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ধাম পাঁচ মাইল । পদব্রজে, একা যোগে, কিম্বা রেলগাড়ীতে যাওয়া যায় । ভাড়া এক আনা । বৃন্দাবন ধামেই রেলষ্টেশন । ষ্টেশনে নামিবামাত্র ব্রজবাসিগণ আসিয়া যাত্রীগণকে লইয়া যায় । যাত্রীগণ নিজ নিজ সুবিধামুসারে থাকিয়া এ স্থানের কার্য্যসকল করিতে পারেন ।

শ্রীবৃন্দাবন ।

এই স্থানের কার্য—যমুনাতে স্নান, পূজা, ঠাকুর দর্শন এবং সাধ্যানুসারে ঠাকুরদের ভেট দেওয়া । এই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না ; তন্মধ্যে গোবিন্দজি, গোপীনাথজি, মদনমোহনজি, এই তিন মূর্তিই প্রধান । পৃথক পৃথক দেবালয়ে এই তিন ঠাকুর স্থাপিত আছেন । বৃন্দাবনের আদি গোবিন্দজি, গোপীনাথজি, মদনমোহনজি জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন । কথিত আছে ঔরাঙ্গজেব বাদসাহের ভয়ে জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা বিগ্রহদিগকে রজনীযোগে লুকাইয়া লইয়া যাইয়া স্বীয় রাজধানী জয়পুরে স্থাপিত করেন । পরে ঔরাঙ্গজেব আসিয়া শূন্য মন্দিরই ধ্বংস করিয়া যান । অদ্যাপিও সেই ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির বিদ্যমান আছে । পরে নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া পাণ্ডাগণ পূর্বোক্ত নামে তিনটি মূর্তি গঠিত করিয়া পুনঃ স্থাপন করেন এবং পূজাদিও যথারীতি করিয়া আসিতেছেন ।

যাত্রিগণ বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হইয়া আদৌ যমুনার কেশী-ঘাটে স্নান তর্পণ করিয়া সাধ্যানুসারে বস্ত্রালঙ্কারে যমুনাকে পূজা করিবেন । তৎপর বৃন্দাজি অর্থাৎ তুলসীদেবীকে সাধ্যানুসারে পূজা করিয়া পূর্বোক্ত ঠাকুর দর্শন করিবেন । ঠাকুরদর্শনার্থ যাইয়া প্রণামী বাবদ কিছু কিছু দিতে হয়,—তাহাকেই ভেট বলে । এই ভেট ছয় স্থানে দিতে হয় । প্রথমে এক স্থানে যে পরিমাণ ভেট দিবেন অপর পাঁচ স্থানেও তাহাই দিতে হইবে, তাহার ন্যূনাধিক্য নাই । ঐ ভেটের ধরা-বাঁধা কিছু নিয়ম নাই, নিজ শক্ত্যানুসারে দিতে হয় । পূর্বোক্ত তিন ঠাকুরের তিন বাড়ীতে তিনটি ভেট

তীর্থ-কাহিনী ।

দিয়া দর্শন করতঃ স্বীয় গুরুকুঞ্জে আসিয়া ঐ হারেই ভেট দিবেন । তৎপর ব্রজবাসী পাণ্ডাকে একটি এবং যে কুঞ্জে অবস্থিতি করিবেন তাঁহার গৃহভাড়া স্বরূপ একটি ভেট দিতে হইবে । এই ভেট সমাধা হইলেই যাত্রীগণ ইচ্ছামত ঠাকুর দর্শন করিতে পাইবেন, তাহাতে আর কোন ব্যয় নাই । যাত্রীদিগকে একদিন ব্রজবাসীদের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়, এই ভিক্ষার নাম “মাধুকুরি” । রাজাধিরাজ হউন না কেন, তাঁহাকেও এইরূপ “মাধুকুরি” করিতে হয় । এই উপায়ে পূর্বে বহু গরিব দুঃখী বৃন্দাবনে বাস করিত—এক্ষণে আর সে দিন নাই । ব্রজবাসীদের যেরূপ অর্থ-লালসা হইয়াছে তাহাতে যাত্রীগণের বৃন্দাবনের সম্পূর্ণ কার্য্য করাই কঠিন । সে যাহা হউক, আর এক দিবস শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দিক পরিক্রমা ও প্রধান প্রধান ঘাটে স্নান এবং লীলাস্থলসকল দর্শন করিতে হয় । ব্রজনাথের ব্রজলীলার প্রধান ও প্রীতিকর এই শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবন ও নিকুঞ্জবন অদ্যাপি বর্তমান আছে । বনদ্বয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর । বহুবিধ লতা গুল্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় অভ্যন্তরভাগ পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে । এমন শান্তিসৌন্দর্য্য সম্পন্ন বন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । নিকুঞ্জ নামক বনमध्ये একটি ছোট অট্টালিকা আছে । তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি অঙ্কিত আছে । সন্ধ্যাকালে ব্রজবাসিনী রমণীগণ একত্র হইয়া তথায় ভজন গান করেন । পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রতি জনে পাঁচসিকা ভেট লইয়া উক্ত গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাত্রিবাস জন্ত পুষ্পাঘ্য রচনা করিবার অধিকার প্রদান করেন । বৃন্দাবনের নিকটে

শ্রীবৃন্দাবন ।

বিষবন ও অন্যান্য বন আছে, তথায়ও যথাসাধ্য ভ্রমণ করিতে হয় ।

বৃন্দাবনের পূর্বোত্তর পশ্চিম দিক্‌ত্রয়ে যমুনা নদী পরিধারূপে অবস্থিত। শ্রীধামের পরিমাণ চতুর্দশীতি ক্রোশ। মথুরা প্রভৃতি স্থান এই চতুর্দশীতি ক্রোশের অন্তর্গত বিধায়, ইহার প্রত্যেক স্থানই মুক্তিপ্রদ। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজধাম মধ্যে চল্লিশটি বন আছে। তন্মধ্যে দ্বাদশটি বন আর অষ্টবিংশতটি উপবন। ঐ সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে হইলে ভাদ্রমাসই প্রশস্ত সময়। আরণ্য পথ অতি দুর্গম, হিংস্র জন্তুর ভয় তাদৃশ না থাকিলেও হিংস্র মনুষ্যের ভয় বিলক্ষণ আছে। বনমধ্যে দোকানপাট না থাকায় ভ্রমণকারীদের অসুবিধার কারণ হয়, সেইজন্য ভ্রমণাভিলাষী যাত্রিগণ বড় বড় রাজা মহারাজগণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। রাজাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার থাকিয়া যায়। সুযোগ মত তাঁহাদের অনুগামী হইয়া নিঃস্বার্থে ভ্রমণ করা যায়। এই বন-ভ্রমণ অবশ্য কর্তব্য, কথায় বলে “যে না ভ্রমে বন, তার বৃথা বৃন্দাবন”।

বৃন্দাবনের আদিম অধিবাসীদিগকে ব্রজবাসী বলে। আধুনিক বাঙ্গালী ঔপনিবেশিকগণকে কুঞ্জবাসী বলে। কুঞ্জবাসীগণের প্রত্যেক কুঞ্জেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি নানাবিধ নামে প্রতিষ্ঠিত আছেন ; ঐ সকল ঠাকুরের যথারীতি পূজা ও সেবা হইয়া থাকে। সায়ংকালে আরতির সময় সমগ্র বৃন্দাবনময় অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অবলোকিত হয়, তখন গোলকবিহারী শ্রীহরির সম্পূর্ণ বিদ্যমানতা ও লীলামাহাত্ম্য সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। “বৃন্দাবনং পরি-

তীর্থ-কাহিনী ।

তাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি” এই মহাবাক্যের স্বার্থকতা তখন বিশদরূপে প্রতীয়মান হয় । বৃন্দাবনবাসী সকলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত । অপর সম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নাই । এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে গৃহী অপেক্ষা ভিক্ষাপঞ্জীবি বৈরাগীই অধিক । ইহারা নামে মাত্র বৈরাগী ; কিন্তু বিরাগের চিহ্নমাত্রও নাই, বরং পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচতা তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে । প্রকৃত ভক্ত বৈষ্ণবও আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম । এই স্থানে দরিদ্রের ভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক । একটি পয়সার প্রত্যাশায় যাত্রীদের পাছে পাছে এক মাইল পর্যন্ত যাইয়া থাকে, এবং পয়সার জন্য যাত্রীদিগকে বিরক্তের এক শেষ করে ।

বৃন্দাবন ধামে নিরামিষ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় । স্থানীয় জলবায়ু মন্দ নয় । বৃন্দাবনে পোটোফিন্, টেলিগ্রাফ্, অফিন্ ও থানা আছে । ইহার জেলা মথুরা । শাস্তি-রক্ষক পুলিশ প্রহরিগণের সুবন্দোবস্তে দম্ম্য তস্করাদির ভয় নাই বলিলেই চলে । কিন্তু বানরের উৎপাত দম্ম্য তস্করাদি অপেক্ষাও কম নহে । সর্বদাই গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে হয় । বাজারে যাইতে হইলেও লাঠী হাতে করিয়া চলিতে হয় । স্থানীয় পাণ্ডাগণ যাত্রীর সহিত সদ্যবহার তাগ করিয়াছেন । কিরূপে অর্থ বেশী লওয়া যাইতে পারে সতত তাঁহারা সেই চেষ্টায় থাকেন ।

এই স্থান হইতে কুরুক্ষেত্র হইয়া হরিদ্বার যাওয়া যায় । কোন কোন যাত্রী এই স্থান হইতে জয়পুর হইয়া পুষ্কর যাইয়া থাকেন ।

শ্রীবৃন্দাবন ।

বৃন্দাবন হইতে জয়পুরের রেলমাস্তুল আট আনা । তথা হইতে
পুষ্করের ষ্টেশন আজমীর—রেলভাড়া (২।৮০) দুই টাকা ছয়
আনা ।



পুষ্কর ।

উত্তরে ইন্দ্র-মার্গাচ্চ যাবৎ প্রাচী সরস্বতী ।
নন্দায়াশ্চাপি পূর্বাচ্চ যাবৎ কন্যা চ পুষ্করং ॥
যোজনাভ্যন্তরে তাবৎ পুণ্যং পুষ্কর-সংজ্ঞকং ।
খ্যাতমেতদ্ধি জন্তুনাং ধর্ম-স্বর্গ-প্রমুক্তি-দং ॥
অপি কীট পতঙ্গা য়ে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ।
যোজনাভ্যন্তরে চৈব মৃত্যু যান্তি পরাং গতিং ॥
দেবতানাং যথা শত্ৰুভূতানাঞ্চ যথা ধরা ।
তদ্বৎ সমস্ত তীর্থানামাদ্যং পুষ্করমিষ্যতে ॥
পর্বতানাং যথা মেরুঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা ।
তদ্বৎ সমস্ত তীর্থানাং বরং পুষ্করমিষ্যতে ॥
পুনন্তি সর্বতীর্থানি স্নানদানৈ ন সংশয়ঃ ।
পুষ্করা লোকনাদেব সদ্যঃ পাপ-প্রণাশনং ॥

(পুষ্কর মাহাত্ম্যং)

অর্থাৎ

ইন্দ্রপথ হইতে উত্তরে পশ্চিমে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত এবং
নন্দার পূর্ব হইতে কুমারী পর্য্যন্ত—এই চতুঃসীমান্তবর্তী যোজন-
পরিমিত স্থানকে পুষ্কর ক্ষেত্র বলে । এই স্থান প্রাণী মাত্রেই

পুষ্কর ।

ধর্ম, স্বর্গ এবং মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর মৃত্যু হউক না কেন সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । দেবগণ মধ্যে যেমন শম্ভু, পঞ্চভূত মধ্যে যেমন পৃথিবী ; তেমনই সমস্ত তীর্থ মধ্যে পুষ্কর তীর্থ । পর্বতের মধ্যে যেমন সূমেরু, পক্ষিগণ মধ্যে যেমন গরুড় ; সেইমত সমস্ত তীর্থ মধ্যে পুষ্কর তীর্থই শ্রেষ্ঠ । অত্যাশ্রু তীর্থ জ্ঞান-দানে পবিত্র করে ; পুষ্কর তীর্থ দর্শন মাত্রেই সদ্য সকল পাপ বিনাশ হয় ।

এই স্থান রাজপুতনায়—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত । আজমীর জেলার চারি ক্রোশ ব্যবধানে পর্বতান্তর্গত সমতলক্ষেত্র মধ্যস্থ একটি জলাশয়ের নাম পুষ্কর হ্রদ বা পুষ্কর তীর্থ ।

হাওড়া হইতে আজমীর ১২২৭ মাইল—রেলভাড়া (১০।/০) দশ টাকা নয় আনা । বৃন্দাবন হইতে জয়পুর রেলভাড়া (১।০) আট আনা, তথা হইতে আজমীর রেলভাড়া (২।৮০) দুই টাকা ছয় আনা । আজমীর হইতে পদব্রজে বা একা যোগে পুষ্কর পৌঁছিতে হয়, একার ভাড়া প্রায় (৮০) দুই আনা ।

আমরা এলাহাবাদের কার্যান্তে (৫৮/১০) পাঁচ টাকা সাড়ে তের আনায় আজমীরের টিকিট লইয়া রেলপথে রওনা হইয়া কানপুর, আগরা, জয়পুর প্রভৃতি পরিদর্শনানন্তর তৃতীয় দিবসের রাত্রিশেষে আজমীর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম । টিকিট দিয়া গেটের বাহির হইবামাত্রই জনৈক পাণ্ডা আমাদেরকে বিশ্রাম জন্য ধর্মশালায় লইয়া গেল । তথায় ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করিতেই রাত্রি প্রভাত হইল । তখন একা যোগে

তীর্থ-কাহিনী ।

রওনা হইয়া প্রায় ৪ মাইল যাইয়া উচ্চ পর্বত প্রাপ্ত হইলাম । একা হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলাম, একা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল । প্রায় এক মাইল উচ্চে উঠিয়া পর্বতের শিরোদেশ অতিক্রম পূর্বক ক্রমে ক্রমে নিম্নে আসিয়া সমতল পথে পুনরায় একারোহণে চলিলাম । অনুমান আরও চারি মাইল পথ যাইয়া প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ প্রাপ্ত হইলাম । তখন বেলা দশটা হইয়াছে । ধর্মশালায় আমাদের স্থান হওয়ার তথ্য পোটলা-পুটলী রাখিয়া স্নানার্থ পাণ্ডার সঙ্গে পুষ্কর হ্রদে উপনীত হইলাম । দেখিলাম হ্রদের এক ধারের তীর সম্পূর্ণই প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । হ্রদের মধ্যে পশ্চিমোত্তর ভাগে দ্বীপাকার কিঞ্চিৎ স্থানের উপর ছোট একটি শিবমন্দির । তথ্য গমন জন্ত সেতু আছে । সেতুটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত । উক্ত অংশের জল পরিষ্কার এবং গভীর । জলে বৃহৎ বৃহৎ কুস্তীর আছে, কূলে অসংখ্য মৎস্য । কেহই সাহস পূর্বক নামিয়া স্নান করে না । পূর্ব-দক্ষিণাংশে জল-অল্প জন্ত সেখানে কুস্তীর থাকিতে পারে না । যাত্রীগণ অতি সতর্কতার সহিত হাঁটুপরিমিত জলে অবতরণ করিয়াই স্নানাবগাহনের কার্য্য কোনরূপে শেষ করে ।

এই তীর্থের প্রধান কার্য্য স্নান, তর্পণ, দান, শ্রাদ্ধ ও দেব-দর্শন । যাহার যেমত সাধ্য তিনি তদনুসারে উল্লিখিত কার্য্য করিতে পারেন । তাহাতে পাণ্ডাগণের কোনরূপ জোর-জুলুম নাই । পাণ্ডাগণ অতি ভদ্র, যাত্রীগণের সহিত অতি সদ্যবহারে সমস্ত কার্য্য করাইয়া থাকেন । আমরা স্নান, তর্পণ ও যথাগাধ্য

পুষ্কর ।

শ্রাদ্ধাদি করনানন্তর বাসায় আসিলাম । আহারাশ্বে পুষ্কর প্রদক্ষিণ ও দেবদর্শনে চলিলাম । অটমটেশ্বর শিব হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্করের চতুর্দিকে শিব, ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবদর্শন পূর্বক বাসায় আসিলাম । পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট হইতে ‘পুষ্কর-মাহাত্ম্য’ লইয়া পড়িয়া দেখিলাম—পুষ্কর তিনটী—ব্রহ্ম পুষ্কর, রুদ্র বা জ্যেষ্ঠ পুষ্কর এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর । যাত্রিগণ এই ব্রহ্ম পুষ্করে স্নানাদি করিয়া কার্য্য শেষ করতঃ চলিয়া যান । জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুষ্করে কেহই যান না, কেন যে যান না বলিতে পারি না । উল্লিখিত পুষ্করদ্বয়ের মাহাত্ম্যও অসীম । তদর্শনে আমাদের ইচ্ছা বলবতী হইল, পাণ্ডা ঠাকুরকে বলায়, আমাদের সঙ্গে বাইবার জন্য একজন গোমস্তাকে অমুমতি করিলেন । আমরা রজনী-শেষে পাণ্ডার গোমস্তার সঙ্গে চলিলাম । প্রায় তিন মাইল বালুকা-ময় মরুভূমি অতিক্রম পূর্বক কনিষ্ঠ পুষ্করে উপস্থিত হইলাম । দিনমণিও সেই সময় পূর্বগগনে রক্তিমাতায় দর্শন দিলেন । কনিষ্ঠ পুষ্কর একটি ছোট পুষ্করী । চারি ধার প্রস্তর দ্বারা বাঁধান, জল নিতান্ত অপেক্ষ । পশ্চিম তীরে দুইটী সাধুর আশ্রম ; তখনও দ্বার বন্ধ থাকায় আমাদের ভাগ্যে সাধুদর্শন হইল না । আমরা পূণ্যতোয়া বোধে কনিষ্ঠ পুষ্করের সলিল কিঞ্চিৎ শিরে ধারণ করিয়া তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে জ্যেষ্ঠ পুষ্করে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলাম । ইহাও একটি অপরিষ্কার প্রশস্ত জলাশয় । দামদলে প্রায়স্থানই অধিকার করিয়াছে, পূর্ব ও উত্তর দিকে কিছু স্থান ফাঁক আছে । তথায় অবগাহন করা যাইতে পারে,

তীর্থ-কাহিনী ।

কিন্তু জলের যেরূপ শীতলতা অনুভব হইল তাহাতে অবগাহন করিতে আমাদের সাহস হইল না । তীর হইতেই দর্শন, প্রণাম ও তদ্বারি মস্তকে ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল । পরে বাসায় ফিরিলাম ।

আসিবার কালে পশ্চিমদিকটে অদূরে সাবিত্রীর পাহাড় দৃষ্ট হইল । উচ্চ পর্বতশিরোপরি ছোট একটি মন্দিরাভ্যন্তরে সাবিত্রী দেবী আছেন । সধবা স্ত্রীগণ অবৈধব্যকামনার ইহাকে শঙ্খ সিন্দুরাদি প্রদান করেন । তথাকার পাণ্ডারা প্রতি স্ত্রী যাত্রীর নিকট হইতে সাবিত্রীদর্শনাদির কর স্বরূপ এক টাকা বার আনা করিয়া লইয়া থাকেন । পর্বতারোহণোপযোগী ভাল পথ নাই, বিশেষ সাবধান সতর্কতায় উঠিতে হয় । ব্যয়বাহুল্য করিলে তথাকার পাহাড়ীদের স্কন্ধে চড়িয়া উঠা যায় । গায়ত্রী পাহাড় ব্রহ্ম পুঙ্কের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অল্প ব্যবধানে । পর্বতের শিরোদেশে ছোট একটি মন্দিরমধ্যে গায়ত্রী মাতা আছেন । সে স্থানটাও অতি দুরারোহ জন্য গমনে বিরত হইলাম । জ্যেষ্ঠ পুঙ্করাদি হইতে ফিরিয়া আসিতে বেলা প্রায় ১০টা বাজিল । তখন আহারাদির অনুষ্ঠান করতঃ মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম ।

বৈকালে বাজার পরিদর্শনে চলিলাম । বাজারে দর্শনের উপযুক্ত কিছুই নাই, লোকের বসতিসংখ্যা নিতান্ত অল্প ; কাজেই কয়েকখান মাত্র মুদীর দোকান ও দুই তিনখান লুচি মিঠাইএর দোকান ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই নাই । তরিতরকারী সামান্য আমদানী হয়, কিন্তু সমস্ত জিনিষই সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় । সমস্ত পথগুলি

ধূলিময় । সাধারণ পল্লী ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না । আগন্তুক যাত্রী মাতেই প্রায়ই স্নানাহারান্তে চলিয়া বান । ত্রিরাত্র বাস দূরের কথা—এক রাত্রিই প্রায় কেহ বাস করেন না । জলবায়ু তত ভাল বলিয়া বোধ হইল না । বার বৎসরান্তে এই স্থানে কুস্তমেল হইয়া থাকে, তখন ইহা মহানগরীতে পরিণত হয় । এই স্থানে পোষ্টাফিস ও একটি সাধারণ স্কুল আছে । আমরা এদিক সেদিক ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া ধূলিধূসরিত পদে বাসায় ফিরিলাম । সন্ধ্যার পর পাণ্ডা ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া সফল গ্রহণ পূর্বক বিদায় হইয়া থাকিলাম । শেষরাত্রে একা যোগে পুনরায় আজমীর পৌছিলাম ।

আজমীর প্রকাণ্ড সহর—দেখিবার যোগ্য । রেল ষ্টেশনটিও বিস্তৃত, অনেকগুলি লাইন নানাদিকে গিয়াছে । ওঁকারেশ্বর তীর্থে যাইতে হইলে এই স্থান হইতে যাওয়া যায় । আর একটি লাইনে পোড়বন্ধর হইয়া দ্বারকা ধামে যাওয়া যায় । জিতালের জংসন হইতে ব্রাহ্ম লাইনে প্রভাসের ষ্টেশন ভেরাভিল দিকে গিয়াছে । আমরা পথে বিন্দুসরোবর দর্শন করিয়া দ্বারকা ধাম যাইব স্থির করিলাম ।



বিন্দু সরোবর ।

ভদ্রীরাসীং পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং ।

নান্না সিদ্ধিপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুযী ॥

তস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ধ্যাপতন্ হর্ষ বিক্ৰবঃ ।

কৃপয়া সং পরীতশ্চ প্রপন্নে পিতয়া ভৃশং ॥

তদ্বৈ বিন্দুসরো-নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতং ।

পুণ্যং শিবামৃত জলং মহর্ষিগণ সেবিতং ॥

(ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধঃ)

অর্থঃ

দেবাহুতি যেখানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই পুণ্যতম ক্ষেত্র “সিদ্ধিপদ” ক্ষেত্র নামে ত্রিলোকবিখ্যাত । সেই স্থানে শরণাপন্ন ঋষিবর কর্দ্দমের প্রতি ভগবানের হৃদয় করুণায় আর্জ হওয়ায় নয়ন হইতে যে আনন্দাক্রবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, তাহাতে সরোবর হয়, উহারই নাম বিন্দুসরোবর । তাহা সরস্বতী জলে পরিপ্লুত হওয়ায় অতি পুণ্যপ্রদ । সেই জল অমৃত তুল্য স্বাদু এবং মহর্ষি-গণ সেবিত ।

স্কন্দ পুরাণে কুমারী খণ্ডে এই স্থান “মাতৃগয়া” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । এই স্থানে মাতৃষোড়শী করিলে মাতৃ-ঋণ মুক্ত হওয়া যায় ।

বিন্দু সরো বর ।

এই স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশে বরদা প্রান্তে সীতাপুর জেলায় সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত । পুরানে “সিক্কিপদ ক্ষেত্র” নামে ইহার উল্লেখ আছে । জেলা হওয়াতে ইহার সীতাপুর নাম হইয়াছে । বোধ হয় “সিক্কিপদ” শব্দ রূপান্তরিত হইয়া সীতাপুর হইয়া থাকিবে । এই স্থানকে কেহ কেহ “মাতৃগয়া”ও বলে । সীতাপুর ষ্টেশনই বিন্দুসরোবরের বা মাতৃগয়ার রেল ষ্টেশন ।

হাওড়া হইতে সীতাপুর ষ্টেশন রেলভাড়া (১২৮/০) বার টাকা চৌদ্দ আনা । আজমীর হইতে সীতাপুর ভাড়া (২১/০) দুই টাকা ছয় আনা ।

আমরা আজমীর হইতে একেবারে পোড়বন্দর পর্যন্ত ভাড়া (৫৮/০) পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা দিয়া টিকিট লইয়া পশ্চিমধ্যে সীতাপুর আসিয়া নামিলাম । টিকিট দেখাইয়া গেটের বাহির হইবা মাত্রই দুইজন পাণ্ডা আমাদের পিছু লইল এবং বাধ্য করিবার জন্য নানা প্রলোভন-বাক্যে যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল । পাণ্ডাদের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমরা ষ্টেশন ও থানার নিকটবর্তী ধর্মশালায় থাকিলাম । ধর্মশালার একটা কুঠারিতে স্ব স্ব দ্রব্যাদি রাখিয়া স্নানার্থ পাণ্ডার সঙ্গে সরস্বতী নদীতে চলিলাম । ষ্টেশন হইতে বাজারের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল গমনের পর সরস্বতী নদী প্রাপ্ত হইলাম । নদীর পরিসর প্রায় অর্ধ মাইল হইবে । সরস্বতী শুকতোয়া, কিন্তু সীতাপুরের নিম্ন দিয়া কিঞ্চিৎ প্রবাহ দৃষ্ট হয় । অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন স্থানে

তীর্থ-কাহিনী ।

হাঁটুজলের উপর জল দেখিলাম না । জল অল্প হইলেও বালুকার উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় অতি স্বচ্ছ ও সুস্বাদু । একপ আবি-লতাবর্জিত, জীবনতোষণ, সুগন্ধ, সুস্বাদু জল কোথাও পান করি নাই বলিয়াই মনে হয় । পানাবগাহনে পূর্বলিখিত বচনের সার্থকতা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হয় ।

এই স্থানের কার্য্য স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও দেবদর্শন । যাহার যেমত সাধা তদনুসারেই হইতে পারে ; কিন্তু পাণ্ডাদের অনুগত হইলে বা তাহাদের নির্দেশানুসারে সরস্বতীর কূলে ধর্ম্মশালায় থাকিলে পাণ্ডারা নানা বাহনা করিয়া অর্থ লইতে ছাড়ে না ; ফলতঃ এই স্থানে ব্যয় কিছুই নাই, উর্দ্ধসংখ্যা আট গণ্ডা পয়সা । কেবল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের মূল্য আর পৌরহিত্যের দক্ষিণা, এইমাত্র ব্যয় ।

সরস্বতীগঙ্গায় স্নান, তর্পণ করতঃ তত্ত্বীরে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী দেবী, নীলকণ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং বিন্দুমাধব প্রভৃতি দর্শনীয় । তিনটি মহা মাধবের মধ্যে ইনি একতম,—বিন্দুমাধব নামে খ্যাত । দর্শনান্তর বাসায় আসিয়া আহারাদি করিতে দিবা শেষ হওয়ায় আর কোথাও যাওয়া হইল না । পর দিবস প্রাতেই আটা, ঘৃত, তিল, তুলসী, কুশ প্রভৃতি শ্রাদ্ধদ্রব্য লইয়া পাণ্ডা ঠাকুর উপস্থিত হইলেন ; আমরাও মাতৃগয়া করনার্থে পাণ্ডার সমভিব্যাহারে চলি-লাম । রেলরাস্তা অতিক্রম পূর্বক প্রায় দুই মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া বিন্দুসরোবরের নিকট জ্ঞানবাণীতে উপনীত হইলাম ।

কপিলদেব মাতা দেবাহনিকে এই স্থানে সাংখ্য জ্ঞানযোগ

বিন্দু সরোবর ।

উপদেশ করায় এই কূপের নাম জ্ঞানবাণী হইয়াছে । প্রস্তর দ্বারা একপ ভাবে বাঁধান যে, পার্শ্বের সিড়ি দিয়া অনায়াসেই ভিতরে নামিয়া অবগাহন করা যায় । আমরা উক্ত সোপানশ্রেণী অবলম্বনে ভিতরে নামিয়া জ্ঞান করতঃ তথা হইতে অল্প ব্যবধানে অগ্না সরোবরে সংকল্প পূর্বক পুনরায় জ্ঞানানন্তর বিন্দুসরোবরে যাইয়া জ্ঞান, তর্পণ শেষ করিলাম । বিন্দু সরোবর অল্পপরিসর চতুষ্কোণবিশিষ্ট পুষ্কর্ণী । চারিধারই প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান এবং সোপানসংযুক্ত । দক্ষিণ তীরে শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট মন্দির মধ্যে কপিলদেব, তৎপিতা কর্দ্দম ঋষি, কপিল-মাতা দেবাহতির মূর্তি স্থাপিত আছে । দর্শন, প্রণামান্তে অদূরে বিন্দুসরোবর-তীর-স্থিত যে কোন স্থানে বসিয়া মাতৃষোড়শী করিতে হয় । পিণ্ড দানের পরে অগ্না সরোবরে উক্ত পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া রামচকে আসিয়া রাম, লক্ষ্মণ, জানকী ও শ্রীনাথজি এবং অপর মন্দিরে অনন্ত শয্যাশায়ী অনন্তদেব দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম । এই সকল কার্য শেষ করিতে অপরাহ্ন হওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম । কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে রন্ধনাদি করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পাণ্ডা ঠাকুর আসিয়া বিদায় জ্ঞাত্য ভারি উৎপাত করিতে লাগিলেন । আমরা কিন্তু তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জঠরানলে আহুতি দিয়া সুস্থির হইয়া, অস্থির পাণ্ডাকে স্থির করিতে বসিলাম ; কিন্তু পাণ্ডার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম—কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, আমরাও এখন চতুর হইয়াছি, সহজে পাণ্ডা ঠাকুরের আশানুরূপ আকাজক্ষা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত

তীর্থ-কাহিনী ।

হইলাম না । অনেক ঝকঝকির পর যৎকিঞ্চিৎ সাহা দিলাম শেষ তাহাই গ্রহণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন । পাণ্ডা বিদ্যায়ের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকাল তথায় বিশ্রামের পর চারিটার সময় ট্রেনে বাইরা গাড়ীতে উঠিয়া দ্বারকা ধামাভিমুখে রওনা হইলাম । জেতালেশ্বর, মেসেনা, ঢোলা প্রভৃতি জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ তৃতীয় দিবস অপরাহ্ন চারিটার সময় পোড়বন্দর পৌছিয়া ধর্মশালায় বাসা লইলাম । পোড়বন্দরকেই “সুদামা-পুরী” বলে ।



সুদামা পুরী ।

এই স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন, পোড়বন্দর জেলায়—
মাগরকুলে অবস্থিত । সুদামা ব্রাহ্মণের নামানুসারেই ইহার নাম
সুদামাপুরী হইয়াছে । ইদানীন্তন ইংরেজ রাজের জেলা হওয়াতে
পোড়বন্দর নাম হইয়াছে ।

হাওড়া হইতে পোড়বন্দর রেলভাড়া (১৬।৮০) ষোল টাকা এগার
আনা । এলাহাবাদ, আগরা, আজমীর, মেসানা, ঢোলা প্রভৃতি
জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ পোড়বন্দর পৌঁছিতে হয় ।

পৌরাণিক ঋতি যে, সুদামা ব্রাহ্মণ বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত
এক বিদ্যাগরে বিদ্যাভ্যাস করায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা হয় ।
কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ধামে রাজা হইয়া যজ্ঞাদি উপলক্ষে দীন
দরিদ্রকে বহু ধন দান করিতেছিলেন । দীনহীন সুদামা ব্রাহ্মণ
লোকপরম্পরায় উক্ত কথা শুনিয়া বাল্যভাব স্মরণ করতঃ স্বকীয়
দারিদ্র্য পরিহার মানসে অর্থপ্রাপ্তি আশয়ে দ্বারকা ধামে শ্রীকৃষ্ণ
সমীপে ভিক্ষার্থী হইয়া উপনীত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ সমাগত বাল্যবন্ধু
সুদামাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে যত্নের সহিত নিজ ভবনে লইয়া
গেলেন এবং দাস দাসী দ্বারা সেবা ও নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যো-
পকরণে ভোজন করাইতে লাগিলেন । সুদামা ব্রাহ্মণ রাজভোগ
প্রাপ্ত হইয়া বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেলেন । কিছুকাল এইরূপে
গত হইলে একদিন হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে হইল । তখন অত্যন্ত

তীর্থ-কাহিনী ।

ব্যস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি দীর্ঘকাল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীর কি দশা হইয়াছে জানি না। এখানে অনেকদিন রাজভোগে কাটাইলাম, এক্ষণে বাড়ী যাওয়াই কর্তব্য— এই স্থির করিয়া দ্বারকানাথের নিকট মনোগত ভাব জানাইলেন। ভগবান দ্বারকানাথ একান্ত দুঃখের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বিদায় করিলেন, অর্থাৎ কিছুই দিলেন না। সুদামা ব্রাহ্মণ অর্থলাভে বিফলমনোরথ হইয়া ভগ্নোৎসাহে দীনচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। স্বীয় বাসস্থান সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বকার সে ঘর দ্বার কিছুই নাই; তৎপরিবর্তে সেই স্থানে দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকাময় এক বৃহৎ পুরী। বহু লোকজন, দাস দাসী, বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ। সে সুশীলা পত্নীই বা কোথায়, কিছুই স্থির নাই। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিতল অট্টালিকা হইতে সুশীলার দৃষ্টি স্বামীর উপর পতিত হওয়ায় দানী দ্বারা ডাকাইয়া পুরী মধ্যে লইয়া গেলেন। তখন পরম্পরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া “ইহা ভগবান্ দ্বারকানাথের কৃপায় হইয়াছে” বুঝিতে পারিয়া, অতি ভক্তিসহকারে দ্বারকানাথের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক গুণকীর্তন করতঃ তদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন। তদবধি এই স্থান সুদামাপুরী নামে খ্যাত হইল।

যাত্রীগণ এই স্থানকে অতি পবিত্র বোধে আগমন করতঃ মন্দিরস্থ সুদামা ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী সুশীলার ধাতুময়ী মূর্তি দর্শন করেন।

সুদামা পুরী ।

আমরা রেলগাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পদব্রজে বন্দরের (বাজারের) দিকে আসিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম এবং আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া সুদামা দর্শনার্থ গমন করিলাম । দেখিলাম নূতন গঠিত একটি মন্দিরমধ্যে ধাতুময় ছোট মূর্তিদ্বয় স্থাপিত আছে । ইহার সেবার জন্য জমী জায়গীর ও লোকজন নিযুক্ত আছে । ইহা ভিন্ন অত্র স্থানে দর্শনার্থ অন্য কোন দেবমূর্তি নাই ।

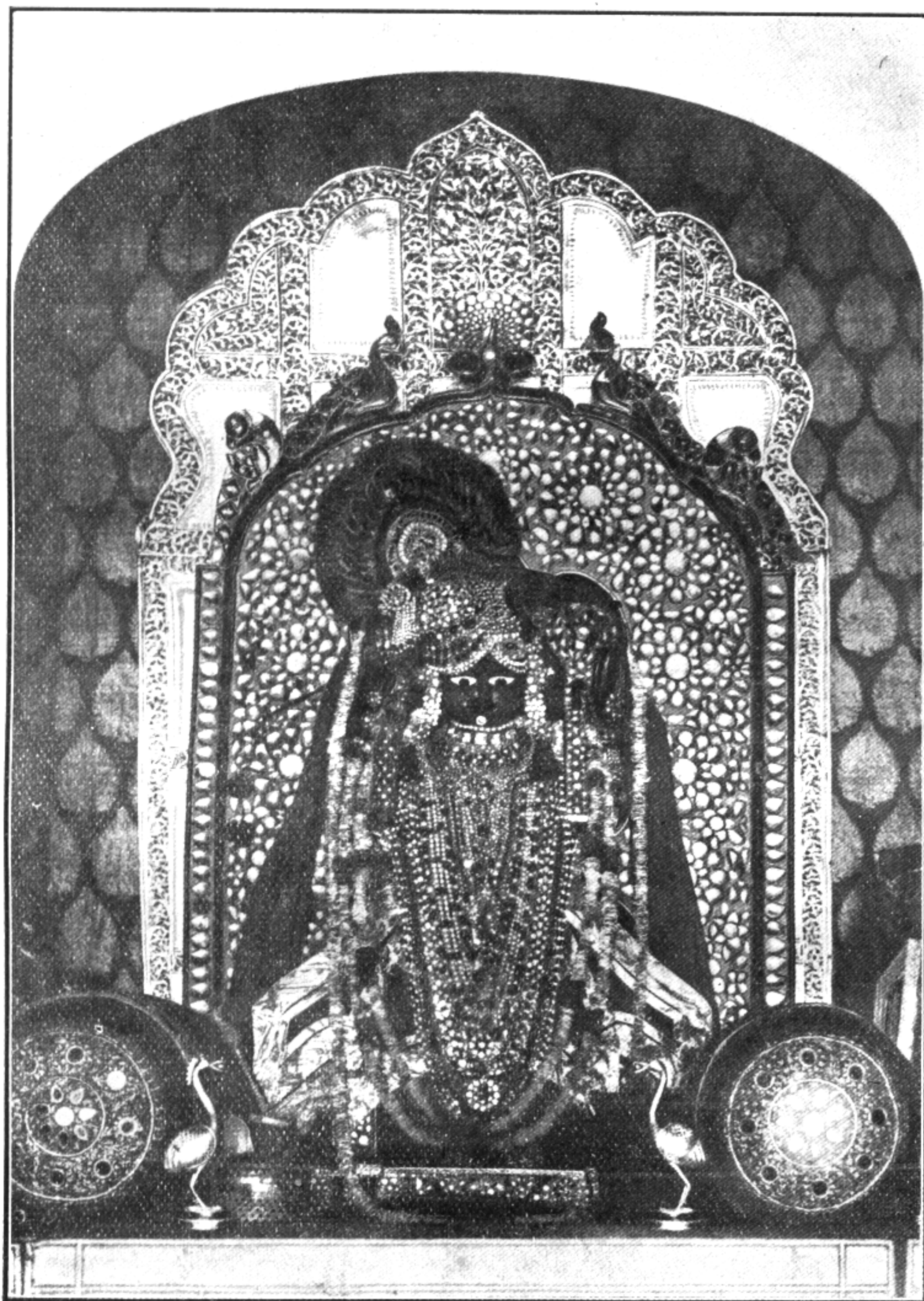
পোড়বন্দরটী মন্দ নহে । সমুদ্রকূলে অতি পরিষ্কার স্থান । রাস্তা, ঘাট, দোকান-পাট, বাড়ী-ঘর সকলই পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খল । কালে আরও উন্নতি হইবে ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হয় । বোম্বাই হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন মেল ষ্টীমার এখানে যাতায়াত করে । উক্ত ষ্টীমারে দ্বারকা এবং প্রভাস যাওয়া যায় । ঐ ষ্টীমারে নানা দিগ্দেশ হইতে মাল আমদানী-রপ্তানী হইতেছে । এই স্থানের বাণিজ্যপ্রসার ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে । বাজারে নানাবিধ ফল-মূল, তরিতরকারী সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় । কোন বিষয়েই অসুবিধা দেখিলাম না । বাজারে সমস্ত খাদ্যই পাওয়া যায়, বিশেষতঃ এই স্থানে অতি বড় বড় পেঁপে অনেক আমদানী হয়, মূল্যও সুলভ ।

এই স্থান হইতে গুম্ভিয়ারকা চল্লিশ ক্রোশ ব্যবধান । পদব্রজে বা গো-শকটে যাওয়া যায় । জন প্রতি ভাড়া (৮) আট টাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় । সমুদ্রপথে জাহাজে সাত আট ঘণ্টায় গুম্ভিয়ারকা পৌছা যায় । ভাড়া (২) দুই টাকা । স্থলপথ

ভীথ-কাহিনী।

অপেক্ষা সমুদ্রপথে জাহাজে গমন অতীব ক্লেশজনক এবং নিরাপদও নয়। যিনি জাহাজে গিয়াছেন তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন। তদ্বিবরণ প্রভাসগমন বর্ণনায় বিবৃত হইবে।

আমরা এই স্থানে দুইদিন অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলাম। দৈবাৎ গুপ্তিহারকার ফেরতা গাড়ী পাওয়ায় তিনজনে আড়াই টাকা বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত গাড়ী যোগে গুপ্তিহারকা রওনা হইলাম। পশ্চিমধ্যে যে যে স্থানে গাড়ী রাখিলে স্নানাহারের সুবিধা হইতে পারে, গাড়োয়ান সেই সেই স্থানে গাড়ী রাখাতে আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। পশ্চিমধ্যে খাদ্যাদি ভাল পাওয়া যায় না এজন্য পোড়বন্দর হইতেই কিছু আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া লইলে আর কোনই কষ্ট হয় না। পশ্চিমধ্যে জামনগরের মহারাজার দুইটা কাছারি আছে। দ্বারকাগামী প্রত্যেক গৃহস্থ যাত্রীর নিকট হইতে পথকর রূপে পাঁচসিকা হারে আদায় জন্য কার্য্যকারক নিযুক্ত আছে। ঐ কর না দিয়া তাঁহার অধিকার মধ্য দিয়া যাইবার উপায় নাই। এই কর গবর্ণমেন্টের জ্ঞাত সত্ত্বেও আদায় হইয়া থাকে, এজন্য স্থলপথে গমনশীল গৃহী যাত্রাই উত্তম কর দিয়া রসিদ লইয়া গমন করেন। কেবল সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের উক্ত কর দিতে হয় না। আমরা ক্রমে আড়াই দিন গাড়ীতে চলিয়া গুপ্তিহারকার পৌছিলাম।



দ্বারকানাথ বা রণছোড় জি।

দ্বারকা ।

দ্বারকাং হরিণাত্যাং, সমুদ্রো প্লাবয়জ্জলৈঃ ।

বর্জয়িত্বা মহারাজ, শ্রীমদ্ভগবদালয়ং ॥

নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র, ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

স্বত্যাংশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গল মঙ্গলং ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে)

চতুর্নামপি বর্ণানাং যত্র দ্বারানি সর্বশঃ ।

ততো দ্বারবতীভ্যাক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্র দর্শিভিঃ ॥

অশ্লীণ্যপিচ জন্তুনাং যত্র চক্রাক্ষিতান্যহো ।

কিং চিত্রং তত্র যে বৈথুঃ শঙ্খচক্রাক্ষিতাঃ করাঃ ॥

অন্তকঃ শিক্ষয়ত্যেবং নিজ দূতান মুহুমুহুঃ ।

তে ত্যজ্যা যেষাং দ্বারবত্যা নামাপি পরিগৃহতা ॥

শ্রীখণ্ডে ক স আমোদঃ স্বর্ণেবর্ণ ক তাদৃশঃ ।

তৎ পবিত্রং কুতস্তীর্থে তদগোপীচন্দনে যথা ॥

দূতাঃ শৃণুত যদ্যালং গোপীচন্দন লাক্ষিতং ।

জ্বলদিস্কনবৎ সোপি দূরন্ত্যাজ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥

(কাশীখণ্ড ৭ম অধ্যায়)

তীর্থ-কাহিনী ।

দ্বারকাং নগরীং দৃষ্ট্বা নরোনারায়ণো ভবেৎ ।
দ্বারকায়াং মৃতোযশ্চ গর্দভোহপি চতুভূজঃ ॥
পশ্যান্ শৃণ্বান্ কথাং তস্মা দ্বারকেতি বদন কচিৎ ।
দৃষ্টা দত্বা তৃণং মৃত্যুঙ্গতো যাতি পরাং গতিং ॥

(দ্বারকা মাহাত্ম্যে)

বাসুদেব উবাচ ।

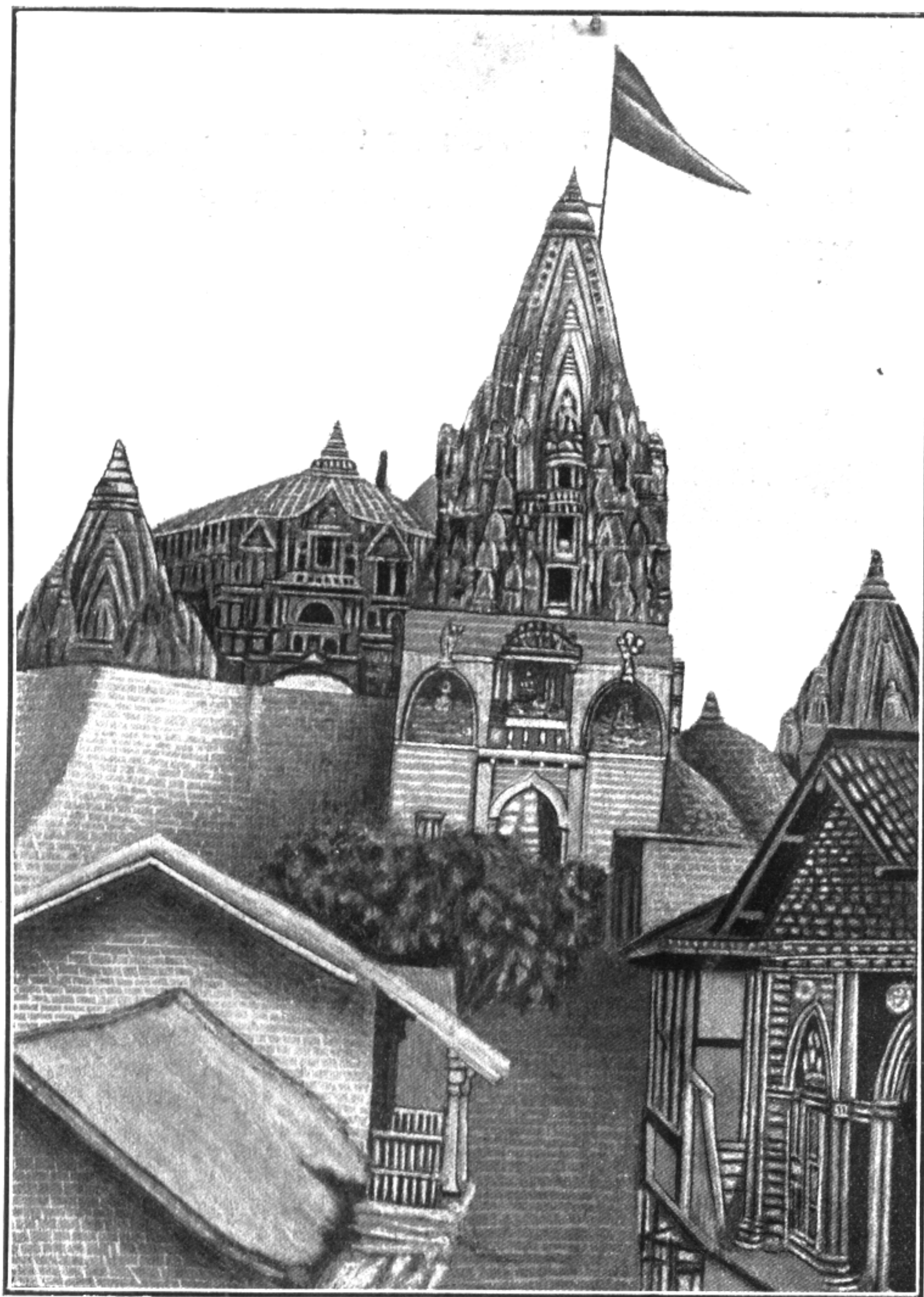
পৈতৃকীতীর্থ তুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরং ॥
সর্বতীর্থ পরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা ।
যস্যঃ প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনং ॥
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনং ।
চতুগুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড)

অর্থাৎ

মহারাজ ! ভগবান মধুসূদন যে দ্বারকাধামে সতত বাস করিতেন এবং বাহার (যে দ্বারকাধামের) নাম স্বরণে মানবের অশেষ অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া মঙ্গল সাধন হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার নিজ আলয়টী ব্যতীত সমস্ত দ্বারকা ধামই সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইয়া গেল ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের উন্নতির দ্বার যে স্থানে বর্ত্তমান তাহাকেই পণ্ডিতগণ দ্বারাবতী বলেন । যে



ગુજરાત દર્ગચામ્હેર શ્રીમંદિર ।

দ্বারকা ।

স্থানের প্রাণিগণের দেহাঙ্ঘি সকল চক্রদ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে, তথাকার জীবগণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদাধারী বিষ্ণুস্বরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ধর্ম্মরাজ যম এই বলিয়া বারম্বার আপন দূতগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, যাহারা দ্বারাবতীর নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করে তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিও না । তথাকার গোপীচন্দনে যে প্রকার গন্ধ, বর্ণ ও পবিত্রতা আছে অল্প চন্দনে সে গন্ধ কোথায় ? স্বর্ণেই বা সে বর্ণ কোথায় ? এবং অশ্রু তীর্থেই বা সে রকম পবিত্রতা কোথায় ? যমরাজ নিজ দূতগণের প্রতি এমনত আদেশও করেন যে, হে দূতগণ ! যাহার ললাটে গোপীচন্দনাক্ত দৃষ্ট হইবে তোমরা তাহাকে জলস্ত অনল সদৃশ পরিত্যাগ করিও ।

দ্বারকা নগরী দৃষ্ট হইলেই নরগণ নারায়ণস্বরূপ হয় । দ্বারকায় মরিলে গর্দভও চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয় । মনুষ্যের আর কথা কি ? দ্বারকা দর্শন করিলে, দ্বারকা কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণে, “দ্বারকা, দ্বারকা” শব্দোচ্চারণে এবং দ্বারকা দর্শনান্তে তৃণমাত্রও দান করিয়া মরিলে পরমা গতি লাভ হয় ।

পিতৃতীর্থ তুল্যা সেই দ্বারকাপুরী সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বহু পুণ্য দান করেন । দ্বারকায় প্রবেশ মাত্রই মনুষ্যের পুনর্জন্ম হয় না । দ্বারকায় দান, শ্রদ্ধা, দেবপূজা করিলে গঙ্গাদি তীর্থে দানাদি হইতে চতুর্গুণ ফল লাভ হয় ।

এই মহাতীর্থ দুইটি পৃথক নামে অভিহিত হইয়া দুইটি পৃথক স্থানে অবস্থিত । একটির নাম শ্রুতিদ্বারকা অপরটির নাম

তীর্থ-কাহিনী ।

ভেটদ্বারকা । বোধাই প্রেসিডেন্সের অধীন গুজরাট প্রদেশে
বরদা রাজ্যে সাগরকূলে গোমতী নদীর তীরে গুমতীদ্বারকা ।
অপরটী এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ ব্যবধানে কচ্ছ উপসাগরের
মধ্যস্থ দ্বীপেপিরি অবস্থিত ।

হাওড়া হইতে পোড়বন্ধর (সুদামাপুরী দেখ) রেলভাড়া
(১৬।৮০) ষোল টাকা এগার আনা । তথা হইতে সমুদ্রপথে জাহা-
জের ভাড়া (১।০) দেড় টাকা । অথবা স্থলপথে চল্লিশ ক্রোশ দূরে
গুমতীদ্বারকা ।। পদব্রজে বা গো-শকটে যাওয়া যায় । গো-শকটের
ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় । আমরা সুদামাপুরী হইতে
আড়াই দিনে প্রশস্ত পথে গো-শকটে গুমতীদ্বারকায় পৌঁছিয়া
ওঙ্কারেশ্বরের পূজারির মন্দিরে বাসা লইলাম । বাসাভাড়া প্রতি-
জনে দৈনিক (২৫) এক পয়সা হিসাবে বন্দোবস্ত হইল । ভাড়াটিয়া
বাসার অভাব নাই, তত্ত্বিন্ন ধর্মশালাও আছে । যিনি যেমন
ইচ্ছা মনে করেন তিনি সেইরূপেই থাকিয়া এ স্থানের কার্য্য
করিতে পারেন । এ স্থানের কার্য্য গুমতী (১) নদীতে স্নান ও
ভেট এবং দ্বারকানাথ দর্শন । দান, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি
যাত্রীগণের ইচ্ছাধীন ।

গৌতম ঋষির পালিতা কন্তা গৌতমী । তাঁহার নামানুসারেই
ইহাকে গৌতমী বা গুমতীদ্বারকা বলে । গৌতম-ঋষি যেখানে

(১) গুমতী নদীর এক নাম গোদাবরী । অন্য নাম গোমতী । বায়ীকি
রামায়ণে একাদশস্কন্ধ সর্গের ১০ম শ্লোক অষ্টব্য ।

দ্বারকা ।

সাগরের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন, ততীরস্থ স্থানকেই গুমতীদ্বারকা বলে । ইহার বিশেষ বিবরণ গোতমী পুরাণে বর্ণিত আছে ।

এই তীর্থস্থানে আসিয়া সর্বাগ্রে গোতমীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিতে হয় । তৎপর দ্বারকানাথকে দর্শন করিতে হয় । যদি কেহ অগ্রে গোতমীগঙ্গাতে স্নান না করিয়া দ্বারকানাথ দর্শন করেন তবে তাহার দর্শন জন্ম ফল হয় না । দ্বারকানাথের এইরূপ আদেশ থাকায় যাত্রীমাত্রেই অগ্রে গোমতী নদীতে স্নান করিয়া থাকে । বরদার মহারাজা গোমতী-স্নানার্থ প্রতি গৃহস্থ যাত্রীর নিকট হইতে (১০) পাঁচসিকা করিয়া ভেট আদায় করিয়া থাকেন । ইহা গবর্ণমেন্টের জানিত । ঐ কর আদায় জন্ম লোক নিবৃত্ত আছে । কর না দিয়া কেহ গোপনে স্নান করিলে তাহার নিকট হইতে দণ্ডের সহিত কর আদায় হয় । অর্থবান্ সাধুর অর্দ্ধেক, অর্থহীন সাধু-সন্ন্যাসীর উক্ত কর দিতে হয় না । সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি মহারাজার এ অনুগ্রহ বিশেষ ধার্মিকতার পরিচায়ক । উক্ত কর আদায় হইলে অনুজ্ঞাস্বরূপ বাহতে রবারের শীলমোহর দ্বারা রংযুক্ত ছাপ দেওয়া হয় । তদৃষ্টে প্রহরিগণ অবগাহনের বাধা জন্মাইতে পারে না । স্নানের সংকল্প দিবার জন্য পুরোহিত-ব্রাহ্মণ স্নান-ঘাটেই উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে দুইটা পয়সা দিলেই সংকল্পের মন্ত্র বলিয়া স্নান ও তর্পণ করান । তদ্ব্যতীত পুরোহিতের অন্য কোন কার্য নাই । উক্ত পুরোহিত জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থের এক, তিলি মালি প্রভৃতির এক, গোয়ালার এক ইত্যাদি । স্নানান্তর ততীরে মন্দির মধ্যে গোমতী মায়ী দর্শন

তীর্থ-কাহিনী ।

করিয়া দ্বারকানাথ দর্শন করিতে হয় । ইহার অপর একটা নাম রণছোড় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন মগধাধিপতি জরাসন্ধ তাঁহার অবধ্য, তাহাতেই জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা বোধে রণ ছাড়িয়া মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া এই স্থানে আইসেন, সেই হইতে এ দেশবাসীরা দ্বারকানাথকে “রণছোড়” নামে অবিহিত করেন । দ্বারকানাথের মন্দিরটী গোতমীগঙ্গার তীরে, সাগরের উত্তরকূলে । গুম্ভীতে যতগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে দ্বারকানাথের মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রস্তরনির্মিত সুনিপুণ শিল্পকার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ । উচ্চে প্রায় ৮৯ হস্ত, পঞ্চতলবিশিষ্ট চারি অংশে গঠিত— চূড়াসকল স্বর্ণমণ্ডিত । বহুদূর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য সুন্দর রূপে দেখা যায় । গুজরাটী ভাষায় মন্দিরটীর নাম জগৎঘুট । মন্দিরাভ্যন্তর গর্ভগৃহে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী কৃষ্ণ-পাষাণনির্মিত ভগবান রণছোড়জি চতুর্ভুজ মূর্তিতে রত্নতাসনে বিরাজিত । বিগ্রহটী দ্বিহস্ত পরিমিত দণ্ডায়মান । বিগ্রহটী আপাদমস্তক বহুমূল্য মণিমুক্তাজড়িত, হীরকখচিত নানাবিধ রত্নালঙ্কারে উত্তমরূপে সুশোভিত হইয়া দীপ্তিতে মন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে । রত্নালঙ্কারে এমনি জড়িত যে দ্বারকানাথের শ্রীমুখারবিন্দ ভিন্ন অন্য অঙ্গ দর্শন হয় না । মহা মরকত রত্নরাজি বিরাজিত হীরকমণ্ডিত শিখিপুচ্ছ সমন্বিত রত্নময় কীরিট শিরোপরি শোভিত হইয়া শ্যামকান্তি শ্রীমুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ অধিকতর বিকশিত হইতেছে । শ্রুতিমূলে মকরাকৃতি মণিময় কুণ্ডলদ্বয় বিলম্বিত হওয়ায় কপোলদ্বয়ের যে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে তাহা বর্ণনাভীত । কণ্ঠ

বারকা ।

হইতে বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া মণি-মুক্তা হীরকখচিত রত্নময় মালা-
দাম অভিন্ন ভাবে গ্রথিত হইয়া পাদপদ্ম পর্য্যন্ত লব্ধিত হওয়ায়, বোধ
হয় মালাদাম পাদপদ্ম-মকরন্দ লোভেই কণ্ঠ হইতে নামিয়া পাদপদ্ম
চুষন করতঃ আনন্দে আন্দোলিত হইতেছে । এ শোভা দর্শনে যে
প্রীতি জন্মে তাহা বর্ণনা করা যায় না । এক বদরিনারায়ণ ভিন্ন
এ রূপের তুলনা বুঝি জগতে আর নাই । ইনি যথার্থই ভক্তজনের
পাপতাপহারী চিত্তরঞ্জনকারী । দর্শকগণ সকলেই পুলকিতাত্তঃ-
করণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক একে একে চরণামৃত পান করিয়া
আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল ।

তৎপর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণানন্তর পার্শ্বস্থিত মন্দিরে অন্যান্য মূর্তি
দর্শন করিলাম । ভগবান্ হারিকানাথের মন্দিরের বামপার্শ্বের
মন্দিরে কল্যাণজি অর্থাৎ কামদেব । দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে
টিকনজি অর্থাৎ বলরাম । সঙ্কুথের মন্দিরে দেবকী, তৎবামপার্শ্বে
বেণীমাধব—দক্ষিণপার্শ্বে পুরুষোত্তমদেব । সকলেই পৃথক পৃথক
মন্দিরে বিরাজিত । দক্ষিণ ভিত্তিতে মহামায়া অম্বিকা দেবী আছেন ।
বলরামের সঙ্কুথে বিনতানন্দন গরুড় জোড়করে বিরাজিত । শ্রীমন্দি-
রের চারিদিকে পৃথক পৃথক মন্দিরে চারি পটুমহিষী ; যথা—রুদ্রিনী,
জাম্ববতী, সত্যভামা, ও লক্ষণা বিরাজিতা আছেন । ঐ সকল
দর্শনানন্তর পুরী হইতে আসিবার সময় কয়েকটী সোপানশ্রেণী
অতিক্রম করিলেই দক্ষিণ দিকে সারদামঠে সারদাদেবী ও তৎ-
সন্নিহিত শিবলিঙ্গ দেখিলাম । শঙ্করাচার্য্য কৃত মঠচতুষ্টয়ের মধ্যে
ইহা একতম মঠ । সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকট সারদামঠ নামে

তীর্থ-কাহিনী ।

প্রসিদ্ধ ও পবিত্র । মঠে আশ্রমী না থাকায় অযত্নে রক্ষিত দৃষ্ট হইল । তৎপর তথা হইতে ফিরিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া গোমতী-তীর দিয়া চলিলাম । এইতীরে বহুতর দেবস্থান ও সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে । স্নানঘাটের উপরই গোমতী মায়ী, তৎপর সত্যনারায়ণ হনুমানজি, রামচন্দ্রজি এবং সঙ্গমস্থলের উপর মন্দির মধ্যে সঙ্গম-নারায়ণজি দর্শন করিলাম । এই স্থানকেই সঙ্গমতীর্থ বলে এবং অনতিদূরেই চক্রতীর্থ স্থান । এই চক্রতীর্থে নিয়ত স্থানীয় লোকের শবদেহ দগ্ধ হওয়ায় ঐ স্থান মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে । ঐ শ্মশানে অসম্যক দগ্ধ অস্থিসকল সাগরজলে পতিত হইয়া পুনরায় লহরী দ্বারা বেলাভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তখন উহার গাত্রে চক্রাকার চিহ্নসকল স্পষ্ট লক্ষিত হয় । শাস্ত্রে উহাকে স্তম্ভীচক্র বলে । সাধু-সন্ন্যাসী এবং যাজিগণ মধ্যে কেহ কেহ ঐ চক্র লইয়া শালগ্রাম তুল্য যত্র ও তুলসী চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন । সঙ্গীয় প্রদর্শকের নিকট শুনিতে শুনিতে সহর মধ্যে ভদ্রকালীর মন্দিরে আসিলাম । মন্দির মধ্যে বদ্রালঙ্কারে ভূষিতা চন্দনে চর্চিতা মা ভদ্রকালী বিরাজিতা আছেন । তৎপাশ্বে আশা দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন । আমরা সমস্ত দেব-দেবী দর্শন ও প্রণামান্তে বাসায় আসিলাম ।

আহারান্তে বৈকালে সহর দর্শনার্থ বাসা হইতে বাহির হইলাম । সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সহরে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই বসতি আছে । লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও স্বভাব মন্দ নহে, অভিমান বা বিলাসিতা

দ্বারকা !

কিছুমাত্র নাই। হলচালনা, পশু রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যই অনেকের জীবনোপায়। নিম্নশ্রেণীস্থ লোক প্রায় বিদ্যাশিক্ষা করে না। বয়াল গরু দ্বারা হাল চাষ ও গাড়ী চালায়। এক একটা বয়াল যেমন উচ্চ, দেখিতে তেমনি সুন্দর; পরিশ্রমেও বেশ পটু। এরূপ গো অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। বোগদাদের গো অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহা তদপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান। গাভী কদাচিৎ দোহন করে, বৎসেরাই প্রায়শঃ দুগ্ধ পান করে। গাভী (গাইয়া) মহিষ প্রায় সকলের বাড়ীতেই আছে, তাহাই দোহন করিয়া দুগ্ধ পান করে ও বাজারে বিক্রয় করে। মহিষের দুগ্ধ বলিয়া কোন রূপ গন্ধ নাই, বরং সুস্বাদুই বোধ হইল। দুগ্ধ যথেষ্ট পাওয়া যায়,—মূল্যও অতি সুলভ। বাজারে তরিতরকারী, ফল, মূল, চাউল, দাইল অতি অল্পই পাওয়া যায়,—মূল্যও বেশী। ময়দা অতি সুলভ; স্থানীয় লোকে ময়দাই অধিক ব্যবহার করে। মিঠাই সন্দেশের দোকান দুই তিনখান মাত্র; তাহাতে দেশীয় খাদ্যই প্রস্তুত হয়। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী কূপোদক ব্যবহৃত হয়। যাত্রিগণ স্থানীয় লোকের নিকট হইতে পানীয় জল খরিদ করিয়া লয়।

আমরা এই স্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া ভেটদ্বারকা রওনা হইলাম। গুমতিদ্বারকা হইতে আমরা পর্য্যন্ত আট ক্রোশ পথ পদব্রজে বা গো-শকটে যাইতে হয়। গো-শকটের ভাড়াও বেশী নহে; এক টাকার মধ্যেই প্রায় হয়। ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়।

রামরা—এটা প্রাচীন তীর্থস্থান বটে, কিন্তু দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নাই। ইহা একটা ছোট পল্লী। যাত্রিগণ এইখানে শঙ্খ, চক্র,

তীর্থ-কাহিনী ।

গদা, পদ্ম দণ্ডছাপ অঙ্গে ধারণ করেন । ভক্তমাল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সময়ে মহারাজ পীপাজি সস্ত্রীক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া দ্বারকা ধামে আসিতেছিলেন ; পথিমধ্যে এই স্থানে দ্বারকা-নাথের আদেশ হয় যে “তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দণ্ডছাপ দেহে ধারণ না করিয়া আমাকে দর্শন করিও না ।” এই আদেশ হওয়ার মহারাজ পীপাজি এই স্থানে দণ্ডছাপ ধারণ করেন ; তদবধি উক্ত স্থানে ছাপ ধারণের প্রথা প্রচলিত হয় । দ্বারকাগামী ষাণ্ঠী মাট্রেই এই স্থানে দণ্ডছাপ বাহতে ধারণ করিয়া তৎপর দ্বারকায় গমন করেন । ছাপ গ্রহণের ব্যয়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই বটে, কিন্তু চারি আনার ন্যূন নহে । অদ্যাপি উক্ত ভক্ত পীপার প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে, তৎসহ একটি ধর্মশালাও আছে । অতিথি-অভ্যাগতকে সিধা দেওয়া হইয়া থাকে । এই স্থান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে কচ্ছ উপসাগরের মধ্যে ভেটদ্বারকা । নৌকা যোগে বাইতে হয়, ভাড়া প্রতি জনে এক আনা ।

ভেটদ্বারকা (১)—গুজরাতি ভাষায় ভেট শব্দের অর্থ দ্বীপ । এই স্থান কচ্ছ উপসাগরের দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টিত থাকায় বোধ হয় “ভেটদ্বারকা” নাম হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুস্থানী লোকেরা বলেন “ভেট” শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ । বৃন্দাবন হইতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসে আসিয়া এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত ।

(১) অপর নাম শঙ্খদ্বীপ, শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাস্বরকে এই দ্বীপের উপর বিনাশ করায় ইহাকে শঙ্খদ্বীপ বলে ।

দ্বারকা ।

এইজন্য উহাকে “ভেটদ্বারকা” বলে । এ উভয় অর্থই সঙ্গত এবং সার্থক ।

সে বাহা হউক, আমরা প্রাতে সাতটার সময়ে রামরা হইতে রওনা হইয়া নৌকা যোগে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নয়টার সময় ভেটদ্বারকায় পৌঁছিলাম ; পৌছা মাত্র জটনৈক পাণ্ডা হাজির । তাহার সঙ্গে যাইয়া দৈনিক প্রতিজনে (২৫) এক পরমা হিসাবে বাসাভাড়া স্থির করিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিলাম । এখানেও বহুতর ভাড়াটিয়া বাসা পাওয়া যায়, তন্মিহ্ন ধর্মশালাও আছে । এস্থানের প্রধান কার্য দর্শন ও ভেট । দর্শনার্থ ব্রাহ্মণভোজন ও ক্রীড়গবানের ভোগ দেওয়া যাত্রিগণের ইচ্ছাধীন । পাণ্ডার কোনই কার্য নাই ; তবে জটনৈক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা নামে পরিচর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শনের সাহায্য করেন, এজন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দিতে হয় ।

আমরা বাসায় আপন আপন বস্ত্রাদি রাখিয়া স্নানান্তর পবিত্র বসন ধারণ পূর্বক পাণ্ডার সঙ্গে শ্রীদ্বারকানাথের পুরীর সদর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম । বরদার মহারাজের সশস্ত্র রক্ষক দ্বারা অহোরাত্র এই দ্বার রক্ষিত হইতেছে । এই দ্বারের পুরোভাগে অশ্বখ-মূলে ছোট একটি মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে । দ্বারের দক্ষিণ ভাগে একজন রাজকার্য্যকারক ভেট আদায় জন্য তাকিয়া ঠেস দিয়া উপবিষ্ট আছে । প্রতি গৃহী-যাত্রীর নিকট সাতসিকা ভেট লইয়া প্রবেশের অনুমতি স্বরূপ বাহতে রবারের ষ্ট্যাম্প দ্বারা রক্ষযুক্ত ছাপ দিতেছে । অর্থবান্ সন্ধ্যুগণের উক্ত করের অর্দ্ধ এবং অর্থহীন

তীর্থ-কাহিনী ।

ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের উক্ত ভেট দিতে হয় না । আমরা প্রথম দ্বার অতিক্রমণ পূর্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপর একটা দ্বার অতিক্রমণ করিয়া একটা প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম । এই প্রকোষ্ঠের দক্ষিণে বিঘ্নবিনাশন গণপতি, বামে রাধারাণীর শ্রীমন্দির, সম্মুখে মহালক্ষ্মী কৃষ্ণিণী দেবীর শ্রীমন্দির, তৎসন্নিহিত গোবর্দ্ধননাথ ও গোপালজি প্রভৃতি মন্দিরস্থ অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী দর্শন করিতে হয় । তৎপর তৃতীয় দ্বার অতিক্রম পূর্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম । এই প্রকোষ্ঠে প্রথম সাক্ষীগোপাল মন্দির ; পুরোভাগে চন্দন কাষ্ঠের অপূর্ব স্তম্ভ । প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুরঃসর মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ ও জাম্বুবতীর দর্শন করিতে হয় । ইহার পার্শ্বে সত্যভামা দেবী ও তৎপার্শ্বস্থিত মন্দির মধ্যে তুলসী দেবী বিরাজিতা দৃষ্ট হন । তৎপর দেবকীজি, এবং বামপার্শ্বে বেণীমাধবজি, তৎসম্মুখে অম্বাদেবী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন । তদনন্তর শ্রীদ্বারকানাথের শ্রীমন্দির মধ্যে কৃষ্ণ-পাষণ বিনির্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদধারী শ্রীদ্বারকানাথকে চতুর্ভূজ মূর্তিতে কারুকার্যবচিত রজতাসনে বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজবেশে বিরাজিত দেখিলাম । পুরোভাগে বিনতানন্দন গরুড় যুক্তকরে অনুচ্চ স্তম্ভোপরি বিরাজমান আছেন । ভগবান্ দ্বারকানাথের আগাদমস্তক মণি মুক্তা হীরক প্রভৃতি দ্বারা এক্রপ আচ্ছাদিত যে, শ্রীমুখপদ্ম ভিন্ন অণু অঙ্গ দর্শন হয় না, এমন কি চতুর্ভূজ—দ্বিভূজ-বলিয়া প্রতীতি হয় । শিরে বহুমূল্য ময়ূরপুচ্ছ-সমন্বিত মরকত অগ্নিমণ্ডিত অত্যুজ্জল কিরীট শোভিত । ভগবানের বদনকমলের মনোহর শোভা

বর্ণনাতীত । একে কিরীটস্থ মণিমুক্তার দীপ্তিতে শ্রামকান্তি শ্রীমুখ-
মণ্ডল সতত উদ্ভাসিত, তাহাতে দীপ্তিশালী মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের
সঞ্চালন জনিত কপোলদ্বয় সর্বদাই ছাতিমন্ হওয়ায় শ্রাম-
কান্তির মিন্থোজ্জ্বল জ্যোতিঃ অধিকতর বিকাশ পাইতেছে । উন্নত
নাসিকাগ্রে মনোহর অধরপল্লবের শোভার সীমা নাই । এই অপ-
রূপ রূপ নিরীক্ষণে দর্শক মাত্রেই আত্মহারা হয় । আ মরি মরি !!!
কণ্ঠ হইতে মহা-মরকত হীরকখচিত মণি মুক্তাজড়িত বহুবিধ
রত্নরাজি গঠিত মাণ্যদাম লব্ধিত হইয়া বক্ষঃস্থল শোভিত করতঃ
মুক্তিপ্রদ চরণপ্রান্তে পতিত হইয়াছে । পরিধান চম্পক-কেশর তুল্য
পীতকৌষেয় পট্ট বসন, তদুপরি স্বর্ণমেখলা দ্বারা কটিতট শোভ-
মান ; চরণে হীরকজড়িত মহা-মরকত-বিনিন্দিত রত্নময় কিঙ্কিনী
প্রভৃতি আভরণে নখপল্লবাগ্নি পর্য্যন্ত ভূষিত হইয়া রাতুল চরণের
অতুল শোভা বিকাশ করিয়াছে । আজানুগম্বিত বাহুচতুষ্টয় অত্যা-
জ্জ্বল মহারত্নময় কেয়ুর বলয় প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
হইয়াছে । ফলতঃ এমন বিশ্বজন-বিমোহন মূর্তি আর দুইটী আছে
বলিয়া বোধ হয় না । দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, “অদ্য
মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং । সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাম-
পশুম্নিজ চক্ষুষা” । সেই বিশ্ব-বিমোহন রূপ দর্শনে রোমহর্ষ হইল—
চক্ষে জল আসিল । তখন পুলকিতান্তঃকরণে, বাষ্পাকুল লোচনে,
গলগলগ্নীকৃতবাসে, যুক্তকরে, গদগদ বাক্যে আত্মনিবেদন পূর্বক
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর চরণামৃত গ্রহণ করতঃ আত্মাকে কৃতার্থ
বোধ করিলাম ।

তীর্থ-কাহিনী ।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে কল্যাণজি অর্থাৎ কামদেব, তদক্ষিণ মন্দিরে টিকনজি অর্থাৎ বলরাম বিরাজিত আছেন । এ মূর্তিষয়ও বেশভূষায়ু দ্বারকানাথের সমতুল্য ঐশ্বর্যশালী । সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বারই রজতমণ্ডিত এবং প্রত্যেকেই কারুকার্য-খচিত রজতাসনে বিরাজিত । সমস্ত মন্দিরই ঝাড় লগ্ননে উত্তমরূপে সজ্জীকৃত । দর্শনানন্তর বাসায় আসিয়া আহারাদি করিলাম ।

পর দিবস শঙ্খতল্লাও নামক তীর্থ দর্শনে চলিলাম । প্রায় এক মাইল ব্যবধানে এই তীর্থ । ভগবান শঙ্খাসুরকে এই স্থানে বধ করার ইহার নাম “শঙ্খতলওয়া” হইয়াছে । ইহা একটি পুষ্কর্ণী বিশেষ । উক্ত তলওয়াতে স্নান করতঃ সন্নিহিত প্রাসাদ মধ্যে ধাতুময় দশাবতার মূর্তি দ্বারা বেষ্টিত “শঙ্খনারায়ণ” নামক অপূর্ণ মূর্তি দর্শন করিলাম । এই তলওয়া হইতে উত্তরে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে সত্যভামার পুরাতন মন্দির । পুরোভাগে স্বর্গীয় পারিজাত বৃক্ষ অদ্যাপি বর্তমান আছে । ভগবান সত্যভামা দেবীর প্রীতির জন্ত ইন্দ্রালয় হইতে এই বৃক্ষ হরণ করিয়া আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন । ইহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্বভাগে কৃষ্ণ-পাষাণে গঠিত বৃহদায়তন কালীয়-নাগের মূর্তি আছে । লোকে বলে, কিয়দূরে সমুদ্র মধ্যে মেঘমণ্ডলের ত্রায় গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে কালিন্দী হৃদচ্যুত মহানাগ কালীয় বাস করেন । সমুদ্র-পথগামী কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কদাচিৎ সৌভাগ্যবশতঃ উক্ত মহাকায় কালীয় সর্পের দর্শন পান । শাস্ত্রে ঐ স্থানকে “রমণক” বোপ বলে ।

তথা হইতে উত্তরে সমুদ্র-তীরে “পদ্ম” তীর্থ নামক এক মহাশ্মশান । এই স্থান সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী শুনা যায় । মানবের মৃতদেহ দহনের পর ব্রহ্মতালুর দগ্ধ অস্থি সমুদ্রে পতিত হইলে তাহা ভগবানের হস্তস্থিত শোভমান পদ্মরূপে পরিণত হয় এবং পরে লহরীসহ তীরে উথিত হইয়া থাকে । পুরাণে ঐ পদ্মকে বিষ্ণু তুল্য জানে তুলসী চন্দনাদি দ্বারা পূজার বিধি আছে । এই কারণ ঐ স্থানের নাম “পদ্ম তীর্থ” হইয়াছে । বৎসরান্তে ভগবান এই স্থানে আগমন করতঃ এক দিবস অবস্থিতি করেন । এই পদ্ম তীর্থে যাত্রী মাত্রেই গমন করিয়া স্নান তর্পণ করেন ।

যাঁহারা ভেটদ্বারকা পরিক্রমণ করিবেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে গমন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে দেড় ক্রোশ অন্তর দাঁড়িয়া হনুমান্ বাইবেন । গুজরাটী ভাষায় লাজুলকে “দাঁড়ি” বলে । তাই দাঁড়িয়া হনুমান্ নাম । রামায়ত সম্প্রদায়ভুক্ত বহু বৈষ্ণব এই স্থানে আছেন । তথা হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে ডিঙ্কেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ আছেন । ইনিই এই স্থানে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ । শিবরাত্রিতে এই স্থানে মহা সমারোহে মেলা হয় । তথা হইতে পূর্বদিকে দুই ক্রোশ গমন করিয়া বালকেশ্বর দ্বারকানাথ দর্শন কর্তব্য । শ্রীক্ষেত্রের শ্রায় ইঁহার প্রসাদাশ্রয় এখানে বিক্রীত হয় । তথা হইতে আসিবার সময় পশ্চিমধ্যে চৌকী হনুমান নামে খ্যাত হনুমানমূর্তি দৃষ্ট হয় । ইঁহার খিঁচুড়িভোগের প্রসাদ কাঙ্গালী অতিথিকে বিতরণ করা হয় । এতদ্ভিন্ন এই পশ্চিমধ্যে অন্যান্য অনেকানেক দেবদর্শন হয়, বাহুলা বোধে তাহার উল্লেখ হইল

তীর্থ-কাহিনী ।

না । পরিক্রমণ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-ভোজন কর্তব্য । যদি কেহ ভগবানের ভোগ দিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীদ্বারকানাথের কার্য্যকারকের নিকট তদর্থ দাখিল করিবেন । এবং ইচ্ছা হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন । এই মহাতীর্থে ত্রিরাত্র বাস করা কর্তব্য । উল্লিখিত কার্য্যসকল করিতেও ত্রিরাত্র সময় আবশ্যক হয় । অতঃপর গোপীতীর্থ দর্শনীয় ।

গোপীতীর্থ—সাধারণতঃ ইহাকেই গোপীতলওয়া বলে । গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসে বৃন্দাবন হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে গুনিলেন, ভগবান লীলাসম্বরণ করিয়াছেন ; তখন গোপীগণ ভগবানের বিরহে কাতরা হইয়া এইখানেই আপন আপন দেহত্যাগ করিলেন । তাহাতেই এই স্থানের নাম গোপীতীর্থ বা গোপীতলওয়া । এই গোপীতলওয়ার মূর্ত্তিকাই গোপীচন্দন । দ্বারকা গমনশীল যাত্রী মাত্রেই দ্বারকার কার্য্য শেষ করিয়া এই গোপীতীর্থে স্নান তর্পণান্তে এক রাত্রি বাস করেন ।

আমরা প্রাতে নয়টার সময় ভেটদ্বারকা হইতে নৌকা যোগে রওনা হইয়া প্রায় এগারটার সময় গোপীতলওয়ার পথে আসিয়া নামিলাম । নৌকাভাড়া প্রতি জনে এক আনা দিতে হইল । পরে বহু যাত্রী সঙ্গে রাজপথাবলম্বন করিয়া পদব্রজে চলিলাম । প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করতঃ বাঞ্ছিত স্থান প্রাপ্ত হইলাম । অনেক অর্থবান্ যাত্রী বয়াল গাড়ী যোগে আসিলেন । গোপীতলওয়া প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী একটি অগভীর প্রশস্ত জলাশয় । তলওয়ার জল

পরিষ্কার এবং সুস্বাদু । ইহার তলদেশের মৃত্তিকাই গোপীচন্দন । শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ইহা অতি পবিত্র এবং মৃত্যুকালে উক্ত গোপীচন্দন যাহার দেহে থাকে তাহার বিম্বলোক প্রাপ্তি হয় । এই জন্ত যাত্রী মাত্রেই পরম যত্নের সহিত ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন । এই স্থানে অবস্থিতির জন্ত দুইটী ধর্মশালা আছে ; কয়েক ঘর মাত্র লোকের বসতি । একখানি মাত্র দোকান, তাহাতে দেশীয়-দিগের উপযোগী খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না । সময় সময় তাহাও দুপ্রাপ্য হয় ; এ জন্ত দ্বারকা ধাম হইতে আগমন কালে আমরা কিছু কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম । স্নান তর্পণান্তর তদ্বারাই জঠরানল নিবারণ করিলাম । এই স্থান হইতে পোড়বন্দর চল্লিশ ক্রোশ ; গো-শকটে বা পদব্রজে যাওয়া যায় । যাহারা স্থলপথে প্রভাস যান, তাহারা পোড়বন্দর পৌঁছিয়া রেলপথে জিতালেশ্বর হইয়া প্রভাসের ষ্টেশন ভেরাভিল গিয়া থাকেন । আর যাহারা জলপথে প্রভাস যান, তাহারা এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্তী গুমতীদ্বারকা পর্য্যন্ত গো-শকটে বা পদব্রজে যাইয়া তথা হইতে সমুদ্রপথে প্রভাসের ষ্টেশন ভেরাভিল গিয়া থাকেন । গো-শকটের ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় । আমরা পরদিন প্রাতে এক টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া গো-শকটে পুনরায় গুমতীদ্বারকায় আসিলাম । সমুদ্রপথে প্রভাস গমন যে কত কষ্টকর, তাহা প্রভাসের বৃত্তান্ত-মধ্যে বিবৃত হইবে ।

প্রভাস তীর্থ ।

পূর্বে যমেশ্বরং যাবৎ শ্রীসোমেশস্ত পশ্চিমে ।
উত্তরেতু বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং যবাকারং বৈষ্ণবং পাপনাশনং ।
অত্র ক্ষেত্রে মৃত্যুশ্চৈব পাপিনো য়ে নরাধমাঃ ॥
স্বর্গং গচ্ছন্তি তে সর্বের স্বতঃ স্মৃতিনো যথা ।
ক্ষেত্রাণামাদি ক্ষেত্রন্তু বৈষ্ণবং তদ্বিছুর্বুধাঃ ।
তীর্থ কোট্যর্দ্ধ কোটি চ তীর্থানাং প্রবরাণিচ ॥
দিব্য ভৌম্যন্তুরীক্ষঞ্চ তানি চৈবাত্র ভামিনি ।
তত্র ত্রয়ীমূর্তির্মতী স্বয়ং গঙ্গা ব্যবস্থিতা ॥
বিষ্ণুং সংপ্লাবনার্থায় প্রাণিনাঞ্চ হিতায়বৈ ।
গয়াগঙ্গাকুরুক্ষেত্র নৈমিষ পুষ্করাণিচ ।
পুরীং দ্বারবতীং ত্যক্ত্বা অত্রৈব বসতে হরিঃ ॥
অত্রাগত্য নরো যন্তু স্নানং শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।
স যাতি বৈষ্ণবং স্নানং কেশবস্য প্রসাদতঃ ।
সরস্বতী হীরণ্যচ সমুদ্রশ্চৈব ভামিনি ।
ত্রয়াণাং সঙ্গমো যত্র দুপ্রাপ্যো দৈবতৈরপি ॥

প্রভাস তীর্থ ।

ত্রৈলোক্যপাবনী পুণ্যা স্থিতা যত্র সরস্বতী ।

তত্রৈব দুর্লভং জ্ঞানং যত্র সাগরসঙ্গমং ॥

সরস্বতী সমুদ্রশ্চ সোমেশঃ “স” ত্রয়ন্তথা ।

দর্শনং চক্ষুষা জন্তোঃ সকারস্ত্রয় দুর্লভং ॥

(প্রভাস মাহাত্ম্যে)

অর্থঃ

পূর্বভাগে যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তরে বিশালাক্ষী, দক্ষিণে সমুদ্র,—এই সীমা চতুর্দিকের মধ্যে যবাকার ক্ষেত্রে পাপনাশন পবিত্র বিষ্ণু ক্ষেত্র বা প্রভাস ক্ষেত্র বলে। এই বিষ্ণু ক্ষেত্রে নরাধম পাপী ব্যক্তিরও যদি মৃত্যু হয় তবে তাহারও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পুণ্যক্ষেত্র মধ্যে এই ক্ষেত্রই আদি বিষ্ণুক্ষেত্র। পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ মধ্যে দেড় কোটি পুণ্য তীর্থ আছে; সে সকলই এই প্রভাস ক্ষেত্রে বর্তমান আছে; পরন্তু গঙ্গাত্রয় এই স্থানে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান। প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত ভগবান শ্রীহরি গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য এবং দ্বারকাধামও পরিত্যাগ করতঃ এই ক্ষেত্রে সতত বাস করিতেছেন। যে মানব এই স্থানে আগমন করিয়া জ্ঞান ও শ্রদ্ধা করেন তিনি ভগবান হরির প্রসাদাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সরস্বতী, হিরণ্যা এবং সাগর এই তিনের মিলিতস্থান দেবগণেরও অতি দুর্লভ। ত্রৈলোক্যপাবনী পুণ্যা সরস্বতী যে স্থানে সাগরের সহিত সঙ্গত।

তীর্থ-কাহিনী ।

হইয়াছেন, ঐ সমসাময়িক দেবগণও তুল্য বোধ করেন । সরস্বতী, সমুদ্র ও সোমনাথ এই “স”কারত্রয়-সম্মিলিত স্থান অতি তুল্য ।

এই পবিত্র পুণ্যতীর্থ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র (সুরাট) দেশে ভেরাভিল জেলায় । যে স্থানে সরস্বতী ও হিরণ্যা নদীদ্বয় মিশ্রিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই মিলনস্থলের উপর । এই প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র রাজকোট বাজুনাগড়ের রাজার অধিকৃত ।

হাওড়া হইতে তিরাভিল ষ্টেশন রেলমাগুল (১৬০) মৌল টাকা চারি আনা । এলাহাবাদ, আগরা, আজমীর, মেসেনা, ঢোলা, জিলালপুর প্রভৃতি জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া তিরাভিল ষ্টেশনে নামিতে হয় । বৃন্দাবন হইতে মথুরা, আগ্রা, জয়পুর হইয়া আজমীর পৌঁছিতে হয় । রেলমাগুল (২১০) দুই টাকা দশ আনা । আজমীর হইতে উল্লিখিত ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ তিরাভিল ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয় । মাগুল (৫১০) পাঁচ টাকা এগার আনা । গুজরাতিদ্বারকা হইতে সাগরপথে জাহাজে তিরাভিল ষ্টেশন মাগুল (১১০) এক টাকা আট আনা । উপরি খরচ অর্থাৎ জাহাজে উঠা নামার নৌকাভাড়া ইত্যাদি (১১০) আট আনা ।

আমরা গুজরাতিতে তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া দশটার সময় রওনা হইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্তী সাগরকূলে ষ্টেশনে উপনীত হইয়া প্রভাসের টিকিট লইলাম । জাহাজ কোথায়, দেখা গেল না ; ক্রত হইলাম, সাগরতীর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে সমুদ্র মধ্যে আছে । আমরা প্রথমতঃ নাবিকগণকে দুইটা

প্রভাস তীর্থ ।

পরশা দিয়া তাহাদের স্বন্ধে আরোহণ পূর্বক তীর হইতে প্রায় চল্লিশ হাত পরিমিত পথ সাগর-জলের মধ্য দিয়া যাইয়া ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করিয়া তুলিতে লাগিলাম । পাঁচ ছয়টা করিয়া আরোহী লইয়া দোহুল্যমান ছোট ছোট নৌকাগুলি বড় নৌকার অভিমুখে চলিল । প্রায় অর্ধ মাইল যাইয়া দোলায়মান বৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিলাম । পূর্বাপেক্ষা দোলন এবার কিছু বেশী বোধ হইল । উভয় নৌকাভাড়া চারি আনা । ক্রমে চারি পাঁচখানা ছোট নৌকার, আরোহী লইয়া এক একখানি বড় নৌকা বীচিমালার উপর দিয়া তুলিতে তুলিতে সবেগে জাহাজ অভিমুখে চলিল । চাহিয়া দেখিলাম দূরে জাহাজ তরঙ্গাভিঘাতে বিরাট দেহ আন্দোলিত করিয়া ভাসিতেছে । দোলন ক্রমে অসহ্য হওয়ার আরোহি-গণের মধ্যে “ওয়াক্ ও—য়াক্” শব্দে বমন আরম্ভ হইল । যত দূরে যাইতে লাগিলাম দোলনও ততই বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের শরীর অস্থির করিয়া তুলিল । নৌকাতেই যখন এই অবস্থা, তখন না জানি জাহাজে কতই দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে ? দেখিতে দেখিতে সেই নৌকাসকল অতল জলধির বক্ষোপরি ভাসমান জল-যানের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন জাহাজের মধ্য হইতে একখানা অপ্রশস্ত সিঁড়ি নামিয়া আসিয়া নৌকা সংলগ্ন হইয়া তুলিতে লাগিল । এই দোহুল্য ক্ষুদ্র সোপানালম্বনে জাহাজে উঠিতে হইবে । এবার মহা বিপদ । জলখানে আরোহণ করিতে যাইয়া সাগর-জীবনে পতিত হইয়া পৈত্রিক জীবনটী না যায়, এই ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল । জাহাজের খালাসিরা আসিয়া নৌকা হইতে

তীর্থ-কাহিনী ।

আকুল যাত্রিগণের গাটুরি লইয়া ব্যাকুলভাবে অকুল সমুদ্রস্থিত জাহাজের ডেকের উপর ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল । ইতোমধ্যে আরও কতকগুলি নৌকা যাত্রীসহ আসিয়া উপস্থিত দেখিয়া, জাহাজ হইতে আরও কতকগুলি খালাসি নামিয়া আসিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পোঁটলা-পুঁটলী উঠাইয়া জাহাজ মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল । এদিকে যাত্রিগণ জাহাজে আরোহণ জন্ত সমুৎসুক হইয়া সকলেই সোপানের দিকে অগ্র গমনে বাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল । জাহাজের উপর হইতেও কতকগুলি যাত্রী নামিবার জন্য সিঁড়ির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল । দুই একটা করিয়া নামা উঠা আরম্ভ হইতেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল । এই গোলযোগে কে কোথায় কাহার গায়ে পড়ে তাহার স্থিরতা নাই । আমরা ঐ গোলযোগ সময়ে হেলিতে ছলিতে, উঠিতে পড়িতে, কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়া কোন প্রকারে জাহাজের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । জাহাজে উপস্থিত হইয়া দেখি, জাহাজের উপর বিরাট কাণ্ডকারখানা । লোকে লোকারণ্য—“ন স্থানং তিল ধারণং” । জাহাজের দোলনে আরোহী মাত্রেই শরীর অস্থির । সকলেই বেন মদ্যপানে মাতোয়ারা—কাহার গায়ে কে পড়ে, কে কোথায় বমন করে তাহার স্থিরতা নাই । কেহ কেহ মলমূত্র-বমন-সিক্ত বস্ত্র গাত্রে জড়াইয়া অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে । কোথায়ও কেহ “ওয়াক, ও—য়াক” শব্দ করিতেছে । এই সকল দেখিয়া আমরা একেবারে অবাক । বাক্যস্মৃতি নাই—কি করি, স্থান পাই কোথায়—বসি কোথায় ? যখন আসিয়াছি তখন ইহার মধ্যেই থাকিতে

প্রভাস তীর্থ।

হইবে। জাহাজ এমনই ছলিতেছে যে, কেহই ক্ষণকালও দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সুতরাং বসিবার স্থান অব্বেষণ করা সুদুষ্কর। ক্রমে আরও যাত্রী উঠিয়া জাহাজ মধ্যে মহা গোলযোগ আরম্ভ করিল। বকাবকি, মুখামুখি, ক্রমে হাতহাতি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল। অতি কষ্টে একটু স্থানের যোগাড় করিয়া আমরা তিনজনে কোন মতে হাত পা গুটাইয়া শয়ন করিলাম। এইরূপে যে যেখানে স্থান পাইল, সে সেইখানেই পড়িয়া গেল; সুতরাং ক্রমে গোলযোগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। যাত্রী উঠার পর মাল উঠা আরম্ভ হইল। মাল উঠিতে প্রায় একটা বাজিল। মাল উঠা শেষ হইলে, বিশাল বংশীধ্বনি করিয়া জাহাজ অসংখ্য যাত্রী ও জিনিষপত্র লইয়া অতল সাগর-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া ছলিতে ছলিতে সবেগে চলিল। আমি ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভীতি-বিহ্বল চিত্তে হতাশ প্রাণে উদাস নয়নে সুনীল জলধির শোভা দেখিতে লাগিলাম। তখন ভগবানের অনন্ত মহিমা স্পষ্টই উপলব্ধি হইল। মনুষ্য-জীবনে ইহা দেখিবার জিনিষই বটে। অনন্ত অসীম সুনীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া শুভ ফেণপুঞ্জ উদগীরণ করতঃ গভীর গর্জনে নাচিয়া নাচিয়া, হেলিয়া ছলিয়া ছুটিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি—অদ্ভুত কাণ্ড, ভয় ও বিস্ময়ের অপূর্ব সম্মিলন—আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! গুমতী দ্বারকার দিকে চাহিয়া দেখি, তীরের গতিশীল শোভাই বা কত! জীবনে কুত্রাপি এমন শোভা আর আমার নয়নপথে কখন পতিত হয় নাই। ব্যাহত দৃষ্টিতে বিহ্বল

তীর্থ-কাহিনী ।

চিতে দ্বারকার দিকে চাহিয়া রহিলাম । বেলাভূমির উপর শ্বেত লোহিত সৌধাবলীর মধ্যে দেবমন্দিরগুলি মস্তক উন্নত করিয়া আছে, যেন শ্রীদ্বারকানাথ হস্তচতুষ্টয় উত্তোলন পূর্বক অভয় দান দ্বারায় আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিতেছেন । সে এক অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য ! প্রাসাদগুলি একটীর পর একটী করিয়া সরিয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দ্বারকা ধামটী নয়নপথ হইতে অপমৃত হইয়া কোথায় মিশিয়া গেল—এ প্রহেলিকার মীমাংসা কে করে ? আমি এই সব ভাবিতে ভাবিতে বাহকে উপাধান করিয়া মস্তক রক্ষা করিলাম । এমতাবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না । জাহাজের আন্দোলনে অতি সহজেই নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল অশুখের শাস্তি হইল । রাত্রি আটটার সময় চৈতন্যলাভ করিয়া দেখি, জাহাজের গতিরোধ হইয়াছে । গুনিলাম, জাহাজ পোড়বন্দরে লাগিয়াছে । পুনরায় নিদ্রিত হইলাম । রজনী প্রভাতে আরোহীগণের গোলযোগে নিদ্রাভঙ্গ হইল । দেখি, পোড়বন্দর হইতে কতিপয় যাত্রী পূর্বোক্ত প্রকারে নৌকাযোগে আসিয়া জাহাজে উঠিল এবং কয়েকজন আরোহী জাহাজ হইতে নামিয়া ঐ সকল নৌকাতে পোড়বন্দর রওনা হইল । তখন জাহাজ পুনরায় শ্রবণবিদারক বংশীধ্বনি করিয়া সবেগে ধাবিত হইল । আমরা পূর্বাবস্থাতেই শায়িত থাকিলাম—প্রাতঃক্রিয়াদি কিছুই হইল না । ক্রমে সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে উপস্থিত হইলেন । বেলা প্রায় অপরাহ্ন দুইটার সময় প্রভাসের ষ্টেশন ভিরাভিল দৃষ্ট হইল । তীর

প্রভাস তীর্থ।

হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে জাহাজের গতি রোধ করিয়া নঙ্গর করা হইল। কিছুকাল মধ্যেই কয়েকখান নৌকা আসিল। তদর্শনে সুখ-শয্যা ত্যাগ করিয়া আমরা গমনের উদ্যোগী হইলাম। যেমন সুখে আরোহণ—তেমনি সুখে অবতরণ। অল্পক্ষণ মধ্যে নৌকা-যোগে তীরে আসিয়া পরিত্রাণ পাইলাম। নৌকাভাড়া আবার চারি আনা করিয়া দিতে হইল। ইহারই নাম উপরি খরচা।

সে বাহা হউক, আমরা সেখানেই একখানা একা ভাড়া করিয়া প্রভাসের ধর্মশালায় চলিলাম। ভিরাভিল ষ্টেশন হইতে প্রভাসের ধর্মশালা প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান ; গমন জন্ত প্রশস্ত পথ আছে। আমরা অপরাহ্ন চারিটার সময় ধর্মশালায় উপস্থিত হইয়া হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম। পূর্ব দিবস সেই-যে দ্বারকা ধামে স্নান করিয়া জাহাজে চড়িয়াছি আর এ পর্য্যন্ত জলস্পর্শও করি নাই। কুধা তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন, সুতরাং অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রে জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। বরাংটা ভালই, পেঁপে, তরমুজ, রস্তু, খেজুর সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। আমরা তদ্বারা উত্তমরূপে জলযোগ সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রন্ধনাদির অনুরোধে নিযুক্ত হইলাম। সন্ধ্যার পর আহাঙ্গাদি শেষ করিয়া আমরা নিদ্রিত হইলাম।

পরদিবস জনৈক পাণ্ডার সঙ্গে স্নানার্থ সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, উত্তরদিক হইতে হিরণা ও জাম্ববতী নদী এবং পূর্বদিক হইতে কপিলা সরস্বতীর সহিত মিলিতা হইয়া সাগরের সহিত সঙ্গতা হওয়ায়, ঐ স্থানকে ত্রিবেণী বলে। এই

তীর্থ-কাহিনী ।

সঙ্গমস্থলে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় । স্নানের ঘাটের বিস্তৃত সোপানাবলী ঠষ্টেক দ্বারা উত্তমরূপে বাধান থাকাতে যাত্রীগণের স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি করিবার বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে । আমরা তত্রত্য কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করতঃ বাসায় আসিলাম । বাসায় আসিয়া আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সোমনাথ দর্শনে চলিলাম ; এবং প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গ্রাম মধ্যে মন্দির প্রাপ্ত হইলাম । সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করার বহু পরে পুণ্যবতী স্বনামখ্যাতা মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন । কারুকার্য্যখচিত রজতমণ্ডিত দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বর্ডিকাধারী প্রদর্শকের সহিত অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া সোপানাবলী দিয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ একতী অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ-প্রস্তরনিৰ্ম্মিত হস্তদ্বয় পরিমিত উচ্চ অত্যাশ্চর্য্য লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম । দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে সোমনাথ এক-তম সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ । ইহাকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিলে জীবের মুক্তিলাভ হয় । যদিও অল্লায়তন মন্দির মধ্যে এই লিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তথাপি স্থানটী পরম রমণীয় । ইহার দর্শন বড়ই আনন্দপ্রদ ; দৃষ্টিমাত্রেই ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় বিভোর হইয়া, নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয় । ফলতঃ ভক্তজনের হৃদয়ে এমনই ভক্তিরসের সঞ্চার হয় যে, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির লেখনীতে প্রকাশ করা একান্ত অসম্ভব । আমরা দর্শন, স্পর্শন ও আত্মনিবেদন করতঃ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং চরণামৃত গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলাম । তখন সূর্য্যদেব মধ্যাহ্ন গগনে উপনীত

প্রভাস তীর্থ।

দেখিয়া বাজার হইতে কিছু আহাৰ্য্য বস্তু লইয়া বাসায় আসিলাম। মধ্যাহ্নের আহাৰাদির পর কিছুকাল বিশ্রামান্তে মাধবজি দৰ্শনার্থ বাহির হইলাম। গ্রামের মধ্যে অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া ভগবান দ্বারকানাথের ভবনে উপস্থিত হইলাম। ইনি প্রভাসে “মাধবজি” নামে খ্যাত। মাধবত্রয়ের মধ্যে ইনি একতম। এই মাধব দৰ্শন মাত্রেই জীবের নিৰ্বাণ মুক্তি অনিবার্য্য। মূৰ্ত্তিটীও অত্যাশ্চর্য্য দৰ্শনীয়—প্রাবট্‌কালের নবজলধর তুল্য শ্রামবর্ণ পাশাণে গঠিত—হস্তদ্বয় পরিমিত উচ্চ,—সৰ্ব সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। আজানু-লম্বিত বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্রাদি শোভমান। বদনকমল অতি মনোহর। সুন্দর কপোলদ্বয় অলকারঞ্জিত, কর্ণের দোলায়মান কুণ্ডল-দ্বয় অধরপল্লবকে অধিকতর শোভার কারণ করিয়াছে। কঙ্কুকণ্ঠ বিলম্বিত বহু রত্নরাজিত-মালাদাম বক্ষঃস্থলে শোভিত; পরিহিত পীত কোষের বসনোপরি রত্ন মেখলায় কটিতট সুসজ্জিত হইয়াছে। এহেন নয়নাভিরাম মনোহর রূপ দৰ্শন মাত্রেই দৰ্শকমণ্ডলীর চিত্ত বিমুক্ত হইয়া যায়। আমরা দৰ্শন ও প্রণাম করতঃ আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। চরণামৃত গ্রহণ করিতেছি এমন সময় জনৈক সেবাইত আসিয়া ভগবানের ভেট চাহিল। যাত্রীগণ সকলেই দেবদৰ্শনী কিছু কিছু দিয়া থাকেন। উক্ত দানের কোন নিয়ম নাই, যাহার বাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই দিতে পারেন। তদনন্তর সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিবস স্নানার্থ হিরণ্য চলিলাম। এই স্থান ধৰ্ম্মশালা হইতে দেড় মাইল ব্যবধান। তথায় স্নানান্তর বলদেবের দেহত্যাগের

তীর্থ-কাহিনী ।

স্থান ও নিকটস্থ অন্যান্য দেবদর্শন করিলাম । তৎপর সরস্বতী স্নানান্তরে প্রায় দুই মাইল দূরে শরবন দর্শন করিলাম । এই স্থানে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল । তারপর চন্দ্রভাগা, জাম্ববতী, বাণগঙ্গা প্রভৃতিতে স্নান ও তর্পণ করিলাম । তদন্তর সূর্য্যকুণ্ড, পাণ্ডুকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিতীর্থ, কপিলতীর্থ, ভল্লকীকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডতীর্থে স্নান, তর্পণ ও দর্শন করিলাম । ইহার মধ্যে ভল্লকীকুণ্ডের বিষয় উল্লেখযোগ্য ।

ভল্লকীকুণ্ড—সঙ্গমস্থল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে প্রান্তর মধ্যে । ভগবান যজ্ঞ করায় ঐ কুণ্ডের নাম ভল্লকীকুণ্ড হইয়াছে । তন্নিকটে একটি অশ্বখবৃক্ষ । পাণ্ডা বলিল, এই বৃক্ষে ভগবান ব্যাধ-শরে আহত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন ।

এই সকল তীর্থ যথারীতি দর্শন করিতে অনূন তিন দিবস দরকার । শেষ যথাসাধ্য ব্রাহ্মণভোজন এবং পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ দান দ্বারা সম্বষ্টকরণ । এই সব কার্য্য দশ টাকার কমে হয় না ।

স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নহে । বহুতর লোকের বসতি আছে । হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বসতিই বেশি । এজন্ত পল্লী-গুলি নিতান্ত নোঙ্গড়া, পথ ঘাটগুলি আবজ্জনাপূর্ণ—পুতিগন্ধময় । এই স্থান জুনাগড়ের বাদসাহের এলাকা জন্য মুসলমানের প্রাচুর্য্য কিছু বেশি । সাধারণ একটি বাজার । তরিতরকারী, ফল-মূল সুলভ মূল্যেই পাওয়া যায় । গব্যদুগ্ধও এখানে যথেষ্ট আমদানী হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে । ফল কথা, খাদ্যাদি সাধারণ

প্রভাস তীর্থ।

ভাবে সমস্তই পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে কূপোদক ব্যবহার করে।
এখানে স্কুল, থানা, পোষ্টাফিস এবং মুন্সেফী আদালত আছে।
অত্র স্থানের কার্য্য অস্তে দেশে রওনা হইলাম।



অযোধ্যা

বা

রামগয়া

দশকোটি সহস্রাণি দশকোটি শতানি চ ।
এতানি সর্বতীর্থানি ত্রিসাক্ষ্যং নিবসন্তি চ ॥
অন্যদেশোস্থিতযোস্তু অযোধ্যাং মনসাস্মরেৎ ।
নশ্যন্তি সর্ব পাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে ॥
জন্ম প্রভৃতি যৎ পাপং স্থিয়ায়াঃ পুরুষস্ত চ ।
অযোধ্যা স্নানমাত্রেন সর্বমেব প্রণশ্যতি ॥

অর্থাৎ

অযোধ্যায় দশ সহস্র দশ শত কোটি তীর্থ ত্রিসাক্ষ্য বিরাজিত আছে । অন্য দেশে থাকিয়াও বে ব্যক্তি মনে মনে অযোধ্যার বিষয় চিন্তা করে তাহার সমস্ত পাপরাশি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বর্গধামে বাস করিয়া সতত পূজা পাইয়া থাকেন । স্ত্রী কিম্বা পুরুষ জন্মাবধি যে যত পাপসঞ্চয় করুক না কেন, অযোধ্যায় স্নান মাত্রেই তাহার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় ।

মুক্তিদায়ক সপ্ত স্থানের মধ্যে অযোধ্যা একটী মুক্তিদায়ক স্থান । এই স্থানে মৃত্যুতে জীবকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ।

অযোধ্যা বা রামগয়া ।

এই অযোধ্যাতে রাজা দশরথের ঘরে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই তীর্থকে রামগয়াও বলে ।

হাওড়া হইতে মোগলসরাই জংসন ৪৬৯ মাইল—রেলভাড়া (৪।৮৫) চারি টাকা সেওয়া এগার আনা । তথা হইতে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলযোগে অযোধ্যা বা দর্শননগর ১২৬ মাইল,—রেলভাড়া (১।০) দেড় টাকা । দর্শননগর হইতে পুনরায় ব্রাহ্ম লাইনে পাঁচ মাইল অযোধ্যা ঘাট ষ্টেশন, ভাড়া দুই আনা । আর অযোধ্যা ষ্টেশনে নামিলে সরযু তীর্থস্থান দুই মাইল । পদব্রজে, একা কিম্বা পুস্পুস (১) যোগে যাওয়া যায় । ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় । ষ্টেশনে নামিবামাত্রই পাণ্ডাগণ আসিয়া যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া আপন বাসা-বাড়ীতে অবস্থিতি জন্য স্থান প্রদান করেন । তথায় থাকিয়া অযোধ্যার কার্য্য করিতে হয় ।

এই স্থানের কার্য্য সরযু-গঙ্গার রামঘাটে স্নান, তর্পণ ও পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ডদান এবং যথাসাধ্য ব্রাহ্মণভোজন ও দান কর্তব্য । পাণ্ডাগণের বেতনভোগী চাকর যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রধান প্রধান স্থান প্রদর্শন করায় । রামঘাটে যথারীতি স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদান করাইবার জন্য পুরোহিত-ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত থাকেন । ঐ কার্য্যের মোট ব্যয় দুই আনা মাত্র ।

(১) পুস্পুস—ইহা এক প্রকার গাড়ী, মানুষে টানিয়া লইয়া যায় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

তৎপর পাণ্ডাগণের নিয়োজিত চাকর সঙ্গে লইয়া দর্শনে বহির্গত হইতে হয় । ষ্টেশনের প্রায় এক-মাইল দূরে উত্তরদিকে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম আছে । তথায় একটি কুণ্ড আছে । ঐ কুণ্ডকে বশিষ্ঠকুণ্ড বলে । এই স্থানটী নানাবিধ বৃক্ষলতাদি দ্বারা পরি-শোভিত থাকায় পরম রম্য উপবন বলিয়া অনুমিত হয় । কিছুদূর ব্যবধানে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান, মহারাজ দশরথের রাজভবন, হনুমানগড় প্রভৃতি । অযোধ্যায় সর্বত্রই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান ভিন্ন অন্য মূর্তি নাই । এই স্থানের পাণ্ডাগণ অতীব ভদ্র, অন্য কোন তীর্থস্থানে এরূপ ভদ্রস্বভাব পাণ্ডা দেখি নাই । ইহারা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । যাত্রিগণ যে বাহা দেন, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন । পাণ্ডাদের প্রত্যেকের অবস্থাই উন্নত । প্রত্যেকেই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছেন । স্থানীয় অন্যান্য লোকের স্বভাবও মন্দ নহে । জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ, আহাৰ্য্য দ্রব্য সমস্তই যথেষ্ট ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় । স্থান-বাসী সকলেই নিরামিষভোজী । পাণ্ডাগণের সকলের শরীরই হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং প্রায়ই গৌরবর্ণ ।

সহরের পারিপাট্য মন্দ নহে । অযোধ্যা অতি প্রাচীন স্থান । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীসকলের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে । সহরে তিস্তিড়িবৃক্ষই অধিক । বোধ হয় বানরগণের অত্যধিক অত্যাচার বশতঃ অন্যান্য বৃক্ষ জন্মিতে পারে না । বানরগণের এতই উৎপাত যে সতত দ্বারে অর্গল দিয়া রাখিতে হয় । বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইলে লাঠী হস্তে করিয়া যাইতে হয় ।

অযোধ্যা বা রামগয়া ।

এই স্থানে শ্রীরামনবমীতে খুব ধুমধাম হয় । তখন নানা দিগ্-
দেশ হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে । উক্ত তিথিতে সরযুর রামঘাটে
মানের প্রশস্ত সময় । আমরা এই স্থানের কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন
করিয়া আহারাভ্যে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া টিকিট লইয়া নৈমিষারণ্য
দর্শনার্থ রওনা হইলাম ।



নৈমিষারণ্য

ততোপি নৈমিষারণ্যং স্বর্গসাধনমুত্তমং ।
স্বর্গদো মোক্ষদশৈচব সর্বকাম ফলপ্রদঃ ॥
হরির্যথাহি দেবানাং দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ।
কপিলা সর্বধেনুনামোষধীনাং যথা যবাঃ ॥
একাদশী তিথীনাঞ্চ আশ্রমীনাং যথা যতিঃ ॥
তথা সর্বেষু তীর্থেষু নৈমিষারণ্যমুচ্যতে ॥

(স্কন্ধ পুরাণম্)

অর্থাৎ

নৈমিষারণ্য স্বর্গসাধন অত্যুত্তম তীর্থ । এই তীর্থ ধর্ম, অর্থ, স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব-কাম ফলপ্রদ । দেবগণ মধ্যে যেমন হরি, দ্বিপদ প্রাণীগণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, গোসমূহ মধ্যে যেমন কপিলা, ঔষধি মধ্যে যেমন যব, তিথি মধ্যে যেমন একাদশী, আশ্রমী মধ্যে যেমন যতি শ্রেষ্ঠ, তীর্থ মধ্যে তেমনি নৈমিষারণ্য শ্রেষ্ঠ তীর্থ ।

নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্র বৃত্তাকার এবং চতুর্শীতি ক্রোশ । তন্মধ্যে ত্রিভুজাকার দ্বাত্রিংশৎ ক্রোশ পরিমিত স্থানই যজ্ঞভূমি বলিয়া স্কন্ধ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । এই স্থান মধ্যে সার্ব্ব ত্রিকোটি তীর্থ অবস্থিত । বর্তমান সময়ে কেবলমাত্র তিনটি স্থান প্রধান দর্শনীয় আছে । প্রথম হত্যাহরণ, দ্বিতীয় চক্রতীর্থ, তৃতীয় মিশ্রণ-

নৈমিষারণ্য ।

তীর্থ । নৈমিষারণ্য অতি বিস্তৃত ; ইহার একপ্রান্ত শাণ্ডিলাও, অপর প্রান্ত সীতাপুর জেলার অন্তর্গত । এই স্থানে যাইবার জন্য শাণ্ডিলা অথবা বাঘাউলি ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয় । হরিদ্বার হইতে আসিতে হইলে সীতাপুর ষ্টেশনে নামিতে হয় । পূর্ব দক্ষিণদেশীয় যাত্রিগণের পক্ষে শাণ্ডিলা ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়াই সুবিধাজনক, কেননা তাহা হইলে ক্রমে তিনটি তীর্থস্থানই দেখিতে দেখিতে যাওয়া যায় । আমরা প্রথমে হত্যাহরণ দর্শনে চলিলাম ।

হাওড়া হইতে শাণ্ডিলা ষ্টেশন ভাড়া (৭/৫) সাত টাকা মোওয়া পাচ আনা । ই, আই, রেল মোগলসরাই হইয়া কাশী-ধাম ; তথা হইতে অযোধ্যা ভাড়া (১৮/১০) এক টাকা সাড়ে ছয় আনা ; তথা হইতে লক্ষ্মী ভাড়া (১/৫) এক টাকা পাঁচ পয়সা ; তথা হইতে অন্য গাড়ীতে উঠিয়া শাণ্ডিলা ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয় ; ভাড়া (১৮/১০) সাড়ে ছয় আনা । ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে হত্যাহরণ তীর্থ । সড়ক পথে পদব্রজে বা গো-যানে কিম্বা অশ্ব-যানে যাওয়া যায় । ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় ।

আমরা অযোধ্যা ধাম দর্শন করিয়া রাত্রি দশটার সময় লক্ষ্মী পৌছিলাম । তথায় দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রিশেষে শাণ্ডিলা ষ্টেশনে গাড়ী পরিত্যাগ করিলাম । বিশ্রামের অন্য কোন সুবিধা না থাকায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ষ্টেশনেরই মুক্ত মেজের একপার্শ্বে শুইয়া বসিয়া কাটাইলাম । প্রাতে উঠিয়া পদব্রজেই চলিলাম, প্রায় দুই মাইল আসিয়া একটি কূপ দৃষ্ট হইল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

সেই স্থানে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছি, ইতোমধ্যে হত্যাহরণ তীর্থের একজন পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাহার সঙ্গে লইলাম । তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক হওয়ায় পথের আর কোন চিন্তা রহিল না । আমরা একোদ্যমেই পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক একটা আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম । এই বাগান মধ্যে ঘরকয়েক লোকের বাস,—নিকটে একটা বহু পুরাতন ছোট পুষ্কর্ণী—এই পুষ্কর্ণীকেই হত্যাহরণ বলে । এই তীর্থের নামানুসারেই স্থানের নাম হত্যাহরণ হইয়াছে । এই স্থানে আগমনের পূর্বে এই তীর্থের বিষয় মনে মনে কতই কি কল্পনা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে দেখিলাম যে, সে সকল কল্পনা জল্পনামাত্র । হত্যা বা হরণের কোন নিদর্শন পাইলাম না ।

সে যাহা হউক, আমরা মধ্যাহ্নকালে এই স্থানে উপনীত হইলাম । স্বতন্ত্র ঘাটীনিবাস না থাকায় পাণ্ডার গৃহেই আশ্রয় লইলাম । এবং তথায় জিনিষ-পত্র রাখিয়া পাণ্ডা সহ তীর্থ-স্থানে চলিলাম । অধিক দূর যাইতে হইল না ; গৃহের অনতিদূরেই হত্যাহরণ তীর্থ । তীর্থটির চারি ধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল । এখন কেবলমাত্র এক ধারের কিঞ্চিৎ স্থান বাঁধান আছে ; অপর অংশ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । পুষ্কর্ণীর জল এত অপরিষ্কার যে, পূণ্যতোয়া না হইলে কেহ বোধ হয় স্পর্শও করিত না ।

এই তীর্থের কার্য কেবলমাত্র স্নান, তর্পণ ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য বা দর্শনীয় কিছুই নাই । এ স্থানে হাট-বাজার নাই, ভাল খাদ্যদ্রব্য পাইবারও উপায় নাই । স্থানীয় লোকের মধ্যেই

নৈমিষারণ্য ।

কেহ কেহ মোটা চাউল, দাইল, আটা বিক্রয় করিয়া থাকে । আগন্তুক যাত্রীগণের আবশ্যক হইলে উহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইতে হয় । গুড় ভিন্ন অন্য মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায় না । এই স্থানে পাণিফল যথেষ্ট বিক্রয় হয় ; এরূপ বড় বড় পাণিফল অন্য কোথাও দেখা যায় না । আমরা স্নান তর্পণান্তে ঐ পাণিফল ও গুড় খরিদ করিয়া জলযোগ করিলাম । আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য পাণ্ডা ঠাকুরকে বরাত করিলাম । তিনি অনেক চেষ্টায় আটা, দাইল ও ছন্ধ যোগাড় করিয়া দিলেন,—তরিতরকারী কিছুই মিলিল না । এক্ষণে রন্ধনের সময় সকলেই অশক্ত—“রন্ধনং বন্ধনং পুংসাং মরণং পরিবেশনে । ততোধিক বৃহন্মৃত্যু ভোজনস্থান মার্জনে ॥” এইরূপ নানা চিন্তার পর তখন অগত্যা পাণ্ডা ঠাকুরকেই রন্ধনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । তিনি আনন্দের সহিত রন্ধনাদি করিয়া পরমাদরে আমাদের কাছে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন । পাণ্ডা ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে ও যত্নে আহারে পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম ।

এই তীর্থে কার্য্য কিছুই নাই সুতরাং পাণ্ডাগণের পাওনাও বিশেষ কিছু নাই । যাত্রীগণের বিশ্রামের স্থান প্রদান এবং আদর আপ্যায়ন সৌজন্যতায় বাহ্য কিছু লাভ । যাত্রীগণও যত্নে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু দিয়া থাকেন ।

আহারান্তে পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম । পাণ্ডা ঠাকুর ভাল বাদলা না জানিলেও মনোগত ভাব একরূপ প্রকাশ করিতে পারেন । কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম এই তীর্থস্থানে

তীর্থ-কাহিনী ।

হত্যাভ্রানিত পাপ নষ্ট হয় । স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে—রাবণ-বধ-
ভ্রনিত পাপমোচনার্থ শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে স্নান করিয়া পাপমুক্ত
হন । শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এই স্থানে স্নান করিয়া পুরাণবক্তা সূত-
বধভ্রনিত পাপ হইতে মুক্ত হন । এই কারণ এই তীর্থের নাম
“হত্যাভ্রণ” । এইরূপ বিবিধ আলাপে অনেকটা সময় কাটাইলাম ।
এই স্থানেই চক্রতীর্থের পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার
সহিত তত্তীর্থের আলোচনাতে কিছু সময় অতীত হইল । তৎপর
বহির্বিষয় সেবনার্থ বহির্গত হইলাম । সন্ধ্যা পর্যন্ত নানাবিধ কথা-
বার্তায় স্থানীয় বনরাজির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে হত্যা-
ভ্রণতীর্থে আনিয়া সন্ধ্যা বন্দনার পর বাসায় ফিরিলাম ।

চক্রতীর্থের পাণ্ডার নাম গোবিন্দরাম । তাঁহাকেই পাণ্ডা
স্বীকার করিয়া প্রাতেই চক্রতীর্থ গমন স্থির করিলাম । জল-
যোগের উপকরণ কিছু না পাওয়াতে সে রাত্রিতে আমাদের আর
কিছুই আহার হইল না । পরদিবস প্রাতে পাণ্ডাঠাকুরকে কিঞ্চিৎ
প্রণামী দিয়া বিদায় হইলাম ।

এই স্থান হইতে চক্রতীর্থ গমনের জন্ত দুইটি পথ আছে । একটি
প্রশস্ত পথ—সাত ক্রোশ । অপরটি সামান্ত পথ—সড়ে পাঁচ
ক্রোশ ; কিন্তু বালুকাময় ও কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর মধ্য দিয়া বাইতে
হয় । আমরা গোবিন্দরামকে এই শেষোক্ত পথের পথপ্রদর্শকরূপে
অগ্রবর্তী করিয়া পদব্রজেই চলিলাম । বহু পরিশ্রমে ও কষ্টে
মরুভূমি তুল্য প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে আকাজিক
স্থান প্রাপ্ত হইলাম । প্রথমে সূর্য্যতাপ ও পথশ্রম, সঙ্গে সঙ্গে

নৈমিষারণ্য ।

সুংপিপাসায় শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত জন্তু আমরা অগ্রেই স্নানার্থ
চক্রতীর্থ সমীপে উপস্থিত হইলাম ।

চক্রতীর্থ মাহাত্ম্য ।

পুঙ্করেতু তপঃ কৃৎস্না বর্ষাণি শত পঞ্চকং ।
তৎফলং লভতে দেবি চক্রতীর্থস্ম্য দর্শনাৎ ॥
কুরুক্ষেত্রেষু যৎপুণ্যং রাহুগ্রাস্তে দিবাকরে ।
তৎফলং লভতে দেবি চক্রতীর্থস্ম্য দর্শনাৎ ॥
ব্রহ্মহত্যাदि पापानि संक्षितान्यन्य जन्मनि ।
नाशयेत्तत्ক্ষণাদেवि चक्रतीर्थ निमज्जनात् ॥
চক্রস্য নিকটে প্রাপ্তাচমনং কুরুতে যদি ।
ত্রিবিধং পাতকং হত্বা স্বর্গে চ বসতে ক্রুবং ॥

(স্কন্দ পুরাণং)

অর্থ্যৎ

পুঙ্করতীর্থে পাঁচশত বৎসর তপশ্চা করিলে যে ফল হয়, হে
দেবি ! কেবলমাত্র চক্রতীর্থ দর্শনেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
কুরুক্ষেত্রে সূর্যাগ্রহণ সময়ে বাস করিলে যে ফল হয়, হে দেবি !
একমাত্র চক্রতীর্থ দর্শনেই সেই ফল হয় । পূর্বজন্ম সংকীর্ণ ব্রহ্ম-
হত্যাदि पातकराशि কেবল চক্রতীর্থ-জলে স্নান মাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত
হয় । চক্রতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাহাতে আচমন মাত্রও

তীর্থ-কাহিনী ।

করে তাহার ত্রিবিধ অর্থাৎ মানসিক, বাচিক, কারিক পাপ বিনষ্ট হইয়া জীবনান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ।

চক্রতীর্থ একটি ক্ষুদ্রায়তন পুষ্কর্ণী । তাহার এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া একটি গভীর কূপ ইষ্টকদ্বারা মণ্ডলাকারে উন্নত করিয়া বাঁধান । ইহার মধ্যে কোন জীব জন্তুর পড়িবার আশঙ্কা নাই । প্রাচীর-গাত্রে ছোট ছোট ছিদ্র । এই ছিদ্রপথে রজ্জুবদ্ধ ঘটিদ্বারা জল তুলিয়া স্নান করিতে হয় । বর্ষাকালে পুষ্কর্ণীতে জল প্রবেশের পথ আছে । তখন ইহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় স্নানাদি করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । আমরা যে বৎসর গিয়া-ছিলাম সে বৎসর বর্ষা না হওয়াতে পুষ্কর্ণী শুষ্ক হইয়াছিল, কাজেই পূর্বোন্নি খত উপায়ে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল । পুষ্কর্ণীর চারিদিকে ইষ্টকদ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । সোপানশ্রেণী দ্বারা নামিয়া অনায়াসেই কূপের নিকট যাওয়া যায় ।

এই তীর্থে প্রথম স্নানকালে পাণ্ডাগণ যাত্রীর নিকট হইতে এক টাকা হিসাবে ভেট চাহিয়া থাকেন । অবস্থাপন্ন যাত্রী মাত্রেই ঐ ভেট দিয়া থাকেন কিন্তু না দিলে বিশেষ জোর-জুলুম করে না । এই তীর্থের কার্য—স্নান, তর্পণ, দান ও দর্শন । যাত্রীগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই সে সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে ! এই স্থানে আশ্রবৃক্ষ দানের ফলাধিক্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । পাণ্ডাগণ বৃক্ষদান করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকে । বৃক্ষদান জন্য মালীগণ বহুতর আশ্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট খরিদ করিয়া লইতে হয় । ঐ সকল বৃক্ষের মূল্য দুই টাকা হইতে কুড়ি টাকা

নৈমিষারণ্য ।

পর্যাপ্ত নিরুপিত আছে । যাহার যেমন শক্তি তিনি সেইরূপ বৃক্ষ
খরিদ করিয়া দান করিতে পারেন ।

আমরা চক্রতীর্থে স্নানান্তর পাণ্ডা ঠাকুরের গৃহে যাইয়া বাসা
করিলাম । এ স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রী রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখেন । স্থানীয় লোকের অবস্থা উন্নত নহে—
ইষ্টকনির্মিত গৃহ একটাও নাই । সমস্তই মৃত্তিকানির্মিত কোঠাগৃহ—
শালকাষ্ঠের কড়ি—মৃত্তিকার ছাদ । প্রত্যেক গৃহই অল্পচ্ছ এবং
গবাক্ষবিহীন । গৃহ প্রবেশের একটীমাত্র দ্বার । আমরা এইরূপ
একটা গৃহ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই থাকিলাম । পূর্ণাঙ্গ নৈমিষারণ্যের
পরিমাণ চৌরাশী কোশ বলিয়া উক্ত, কিন্তু এই চক্রতীর্থই
নৈমিষারণ্য নামে প্রসিদ্ধ । নৈমিষারণ্য বলিলে এই চক্রতীর্থকেই
বুঝিতে হইবে । ইহা সীতাপুর জেলার অন্তর্গত,—রেলষ্টেশন
বাঘাউলি । ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রশস্ত রাজপথও আছে ।
পাঁচকোশ মাত্র ব্যবধানেই উক্ত রেলষ্টেশন ।

আমরা বাজার হইতে লুচি প্রস্তুত করাইয়া লইয়া আহারের
পর বিশ্রামান্তে, অপরাহ্ন সময়ে পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে ললিতাদেবী
দর্শনে চলিলাম । অনতিদূরে বৃক্ষরাজি পরবেষ্টিত আশ্রবাগান
মধ্যে মায়ের মন্দির । মন্দিরটি ইষ্টকনির্মিত, পুরীর দ্বারের পুরো-
ভাগে জলশূন্য পুকুরী । তত্ত্বরে একটা বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা
বিস্তারপূর্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায়
বোধ হইতেছে যেন যাত্রীগণের ক্লান্তি হরণ নিমিত্ত কর-পল্লব
সঞ্চালন ভঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে । আমরা এই স্থানে, চারিদিকের

তীর্থ-কাহিনী ।

শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দেবীর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম । দেবীর মন্দিরটীর চতুর্দিকে ইষ্টকনির্মিত গৃহদ্বারা প্রাকাররূপে পরিবেষ্টিত । অঙ্গনটী ইষ্টকদ্বারা সম্পূর্ণই বাধান । প্রাঙ্গণের চতুর্দিক দর্শনান্তে দেবীমন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম । দ্বার বন্ধ থাকায় তখন প্রবেশ করিতে পারিলাম না । যথাসম্ভব জনৈক সেবাইত কর্মচারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল । আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরের একপার্শ্বে বেদিকোণরি ললিতা-দেবী বিরাজিতা । সর্বত্র বসন-ভূষণে পরিশোভিত ; মুখপদ্ম ভিন্ন অন্য অঙ্গ দর্শন হইল না । দেবীর নিকট একটা ঘৃতদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে ; সন্কার প্রকাশ—আরতির বেশী বিলম্ব নাই । আরতি দর্শনেচ্ছায় মাতাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া পূর্বোক্ত পুর্ণী সমীপে বটবৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলাম । ইতিমধ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি সহ আরতি আরম্ভ হইল । মালীর ছোট ছোট ছেলেরা পুষ্পমাল্যের ডালা হাতে করিয়া যাত্রীগণের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুষ্পমাল্য যাচাই করিতে লাগিল । আমরা প্রত্যেকেই এক এক পয়সার মালা হস্তে লইয়া দেবীর নিকট উপনীত হইলাম । আরতির বিশেষ ধুমধাম কিছুই নাই, ক্ষণকাল মধ্যে আরতি শেষ হইল । সকলেই পুরোহিতের হস্তে মালা দিলাম, তিনি মায়ের গলদেশে ঐ সকল মালা পরাইয়া দিলেন । তখন মায়ের উদ্দেশে বেদির উপর এক একটা পয়সা দিয়া প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম ।

পরদিবস গোমতী-স্নানে চলিলাম । অধিকদূর যাইতে হইল না । অল্প দূর গমন করিয়াই স্নানের ঘাট প্রাপ্ত হইলাম । ঘাটটী

নৈমিষারণ্য ।

ইষ্টকনির্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা নূতন বাঁধান । নদী যদিও প্রশস্ত নয় তথাপি খুব গভীর এবং প্রথর স্রোতস্বতী । নদীর জল স্বচ্ছ ও শীতল—পানাবগাহনে ক্রান্তি দূর হয় ।

স্থানীয় লোকসকল স্ব স্ব বাটীস্থ কূপোদকই ব্যবহার করিয়া থাকে । আমরাও কূপোদকই ব্যবহার করিতাম, কিন্তু গোমতী-স্নানের পর হইতেই কূপোদক পরিত্যাগ করিয়া এই জল লইয়া পানাদি কার্য্য করিতাম ।

আমরা তথায় স্নান তর্পণান্তর করেকটী সাধুর আশ্রম দর্শন করিয়া ব্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম । আ মরি মরি ! কি রমণীয় শোভা-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট আশ্রম !! যেন প্রকৃতিসুন্দরী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিতা—যেন শান্তিনিকেতনে শান্তিদেবী নিত্য প্রতিষ্ঠিতা ! আজ আমাদের এ পথে আইসা এইখানেই সার্থক বোধ হইল । জগতে এমন স্থান দুইটী আছে বলিয়া বোধ হয় না । যদি কবি হইতাম তাহা হইলে এ স্থানের শোভা বর্ণনা করিয়া পাঠককে মুগ্ধ করিতাম । এই স্থান দর্শন করিয়া পুরাকালের সদাচারসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় ঋষিদের কথা মনে পড়িল । যে স্থানে মহর্ষি বেদব্যাস আসন করিয়া বসিয়া পুরাণাদি বিবৃত করিয়াছিলেন, ঐ স্থানটী আরও মনোরম । আশ্রমের চতুর্দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্র ও অশ্বখবৃক্ষদ্বারা বেষ্টিত । আশ্রম-পাদপসকল তপোবনবাসীগণকে প্রচণ্ড মার্জিত-কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিস্তার দ্বারা সুশীতল ছায়া উৎপাদন করিয়াছে । মধ্যস্থানে ইষ্টকদ্বারা বেদী নির্মিত হইয়াছে । এই

তীর্থ-কাহিনী ।

পবিত্র স্থানে বসিয়া ষষ্টি সহস্র শিষ্য স্মৃত মুখে মহাভারতের মধুর কথা শুনিতেন এবং এই স্থানেই রোহিণীনন্দন বলরাম ক্রোধাভিমান বশে পুরাণবক্তা স্মৃত মুনিকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন । আমরা মহর্ষিসেবিত সুপবিত্র পুণ্যভূমি ব্যাসাশ্রম দর্শন করিয়া পরম পুলকিতাশ্রুতঃকরণে বাসায় আসিলাম । যথাসময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া জনৈক পণ্ডিতের নিকট নৈমিষারণ্যের ইতিবৃত্ত শুনিতে বসিলাম । পণ্ডিত ব্রাহ্মণটী জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডাবৃত দেব নাগরাক্ষরে লিখিত একখানি স্কন্দ পুরাণের খণ্ড বিশেষ অবলম্বনে বলিতে লাগিলেন—“পুরাকালে সৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি মানসে একটি সুরহং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্ত ভগবান বিষ্ণু সমীপে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন । ভক্তবৎসল ভগবান মুনিগণের অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিলেন যে, হে চক্র ! তুমি মুনিগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ উপযুক্ত যজ্ঞক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া আইস । তদনুসারে চক্র মুনিগণকে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণান্তর এই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, এই স্থানই যজ্ঞ কার্যের উপযুক্ত । এই স্থান মুনিগণের অভিমত হওয়ায়, মুনিগণকে এই স্থানে রাখিয়া চক্র পাতাল প্রবেশ করিলেন । ঐ গর্তকেই চক্রতীর্থ বলে । মুনিগণ সমবেত হইয়া এই নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষব্যাপী ‘সুমহৎ সত্র’ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । তাহাতেই এই মহা পুণ্যক্ষেত্র পুরাণে বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত ।” এইরূপ নানা প্রকার স্থানের মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ প্রণামী প্রদান করিয়া বিদায় করিলাম ।

নৈমিষারণ্য ।

এই স্থানে সাধারণ একটি বাজার আছে । তাহাতে স্থানীয় লোকের খাদ্যোপযোগী সকলই পাওয়া যায় । লুচি, সন্দেশ আবশ্যক মত প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারা যায়, তাহার মূল্য কিছু বেশী লইয়া থাকে । আমরা যে কয়েকদিন এই স্থানে ছিলাম প্রত্যহ আবশ্যক মত ব্রাহ্মণ দ্বারা লুচি, দাইল, তরকারী ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া লইতাম এবং তাহাই আহার করিতাম । স্থানীয় সকল ব্রাহ্মণই কাণ্ডকুজায়—নিরামিষভোজী । লোকের স্বভাব মন্দ নহে । অনেকগুলি পাণ্ডার বসতি আছে—সকলেই দরিদ্র । যাত্রিগণের বিশেষ সমাগম না থাকাই পাণ্ডাগণের হীনাবস্থার একমাত্র কারণ । যাত্রী পাইলে পরম সমাদরে রাখেন এবং অতিশয় যত্ন করেন । ইহাদের বিদ্যাশিক্ষা অন্য এ স্থানে কোন বিদ্যালয় নাই । মিশ্রণে খানা, পোষ্টাফিস, স্কুল প্রভৃতি আছে ; মিশ্রণতীর্থ এই স্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে । গুনিলাম সীতাপুর রেলষ্টেশন হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন নির্গত হইয়া মিশ্রণ হইয়া নৈমিষারণ্যের উপর দিয়া বাঘাউলি যাইয়া মিলিত হইবে । রাস্তাও প্রস্তুত হইতেছে ; সম্ভবতঃ দুই তিন বর্ষ মধ্যে রেল চলিবে ।

আমরা এই স্থানে কয়েকদিন বাস করিয়া পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু প্রণামী দিয়া মিশ্রণতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম । যাইবার জন্য গো-গাড়ী পাওয়া যায় ; পদব্রজেও যাওয়া যায় । আমরা প্রত্যাষে প্রশস্ত রাজপথে পদব্রজে রওনা হইলাম । পথের উভয় পার্শ্বেই বৃহৎ বৃহৎ আম্রকানন ও পলাশবন । আমরা সেই সকল বন-

তীর্থ-কাহিনী ।

রাজির শোভা দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত মিশ্রণতীর্থে
উপস্থিত হইয়া গুরুচরণ পাণ্ডার আলয়ে বাসা লইলাম ।

মিশ্রণ তীর্থ ।

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি মিশ্রণে ।

মিশ্রণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥

যষ্ঠি বর্ষ সহস্রাণি প্রয়াগে তপসঃ কৃতে ।

নৈমিষে নিমেষাৎ তন্ধি মিশ্রণে জলদর্শনাৎ ॥

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষং বারাণস্ত্যাং জলে স্থলে ।

দ্বারকা পথিমধ্যেতু মিশ্রণে যত্র কুত্রচিৎ ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

অর্থঃ

ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে একমাত্র মিশ্রণতীর্থে
সে সকল তীর্থই আছে । মিশ্রণতীর্থের সমান তীর্থ পূর্বে কখন
হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না । প্রয়াগে ষাইট্ হাজার
বৎসর তপস্যা করিলে যে ফল হয়, নৈমিষারণ্যস্থিত মিশ্রণতীর্থের
জল নিমেষ মাত্র দর্শনেই সেই ফল হয় । গঙ্গায় গঙ্গার জলে,
বারাণসী ক্ষেত্রে জলে স্থলে, দ্বারকা দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া পথের
মধ্যে মৃত্যু হইলেই মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু মিশ্রণতীর্থে যেখানে
সেখানে মৃত্যুতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।

এই তীর্থের অপর নাম “দধিচী” তীর্থ । দেব-শত্রু মহাবল

নৈমিষারণ্য ।

বজ্রাস্তর নিধনার্থ ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রার্থনা মতে দধিচী মুনি স্বীয় পঞ্চরাশি দানে সম্মত হইয়া বলেন, “বহুকাল তপস্বীতেই অতি-বাহিত হইল, তীর্থ-স্নানের সময় না হওয়ায় কোন তীর্থ-স্নান করি নাই । আমাকে তীর্থ-স্নানের সময় দিলে তীর্থ-স্নানান্তর আপনাদের অভিলাষ পূরণার্থ দেহত্যাগ করিতে পারি ।” এতদ্বাক্য শ্রবণে দেবগণ ভাবিলেন পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন, অথচ তাহার অভাবে এই মহাপুরুষের অভিমত অভিলাষ এবং অনুষ্ঠিত তপশ্চর্যা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তন্নিমিত্ত দেবগণ স্ব স্ব কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া যাবতীয় তীর্থবারি আনিয়া মুনিকে স্নান করাইলেন । সেই সকল সিঞ্চিত তীর্থবারি এই স্থানে মিলিত হওয়ায় ইহা মিশ্রণতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে । আর এই স্থানে দধিচী মুনির আশ্রম থাকায় এই তীর্থকে দধিচীতীর্থও বলে ।

আমরা গুরুচরণ পাণ্ডার গৃহে বজ্রাদি রাখিয়া মিশ্রণতীর্থে উপনীত হইলাম । অধিকদূর বাইতে হইল না । দেখিলাম তীর্থটি জলশূন্য বৃহৎ পুষ্কর্ণী । চতুর্দিক ইষ্টকনির্মিত সোপান-শ্রেণী দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । তীরে অনেকগুলি দেবালয় আছে । বর্ষার অভাবে পুষ্কর্ণী শুষ্ক হইয়াছে । পুষ্কর্ণীর তলদেশে বায়ুকোণে কিঞ্চিৎ স্থান ইষ্টকনির্মিত আলবাল দ্বারা জল সঞ্চিত আছে, দেখিতে চৌবাচ্চার মত হইয়াছে । যাত্রীগণকে বর্তমান সময়ে এই চৌবাচ্চাতেই অবগাহন করিতে হয় । আমরা এই স্থানে সংকল্প পূর্বক স্নান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করতঃ তত্তীরস্থ দেব-দর্শনান্তর বাসায় আসিলাম ।

তীর্থ-কাহিনী ।

বাসার ফিরিবার পথে বাজার হইতে ময়দা, ঘৃত, তরিতরকারী
খরিদ করিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট দিলাম । পাণ্ডা ঠাকুর অতি
যত্নের সহিত উহা ধার্য খাদ্য প্রস্তুত করতঃ আমাদিগকে ভোজন
করাইলেন । পাণ্ডা ঠাকুরের আদর-যত্নে ভোজনে পরম পরিতোষ
লাভ করিলাম । স্থানীয় পাণ্ডাগণ সকলেই কাণাকুজীয় ব্রাহ্মণ—
নিরামিষ ভোজী । যে কয়েকদিন ছিলাম, উক্ত পাণ্ডা ঠাকুরের
গৃহে আহারাদি হইত । পাণ্ডা ঠাকুরের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের
পরম যত্নে আমাদিগের বিদেশবাস বলিয়া বোধ হইত না ।

সে যাহা হউক, সে দিবস আর কোন স্থানেই যাওয়া হইল না ।
একে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, তাহাতে মাঘ মাস, পরস্তু মেঘাচ্ছন্ন
হওয়ায় বায়ুপ্রবাহের সহিত টিপি টিপি বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ।
শীতের কিরূপ প্রাচুর্য তাহা আর পাঠককে বিশেষ করিয়া
বলিতে হইবে না ; তাই গৃহ হইতে বাহির হইলাম না । পর
দিবসও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু বহিতে লাগিল, তথাপি
মনের দুর্দমনীয় উৎসাহে বাহিরের কষ্ট তত বোধ না করিয়া
সীতাকূপে স্নানার্থ চলিলাম । বেশী দূর যাইতে হইল না । গ্রাম-
প্রান্তে অনতিদূরেই সীতাকূপ ॥

মিশ্রণাদুত্তরে ভাগে কোপং স্নানং সমাচরেৎ ।

ব্রহ্মহত্যাভিঃ পাপৈশ্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

সীতাকূপে কৃতে স্নানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

নৈমিষারণ্য :

অর্থাৎ

মিশ্রণ তীর্থের উত্তরভাগে সীতাকূপ বিদ্যমান, তাহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাदि পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

আমরা এই কূপ সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলাম ইহার নাম কূপ না হইয়া ইন্দারা হইলেই ভাল হইত। ইষ্টকদ্বারা উত্তম-রূপে বাঁধান। পুনর্জন্মনাশন কামনার জলোত্তলন করিয়া স্নান করিলাম। জল অতি সুস্বাদু, আমরা প্রত্যহ এই কূপের জল লইয়া পান করিতাম। কূপটির উৎপত্তির বিবরণ এই—সীতাদেবী এই স্থানে পাতাল প্রবেশ করায় যে গহ্বর হইয়াছিল তাহাই সীতাকূপ নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্নানান্তর তৎসন্নিহিত বান্মৌকির আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। পাঠক মনে করিতে পারেন, মুনি ঋষির আশ্রম বলিলে ফল পুষ্প-সমন্বিত, বৃক্ষরাজি শোভিত, লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত, কমলীয় শান্তিনিকেতন; কিন্তু এ আশ্রমে সে সব কিছুই নাই, কেন না ইহা মুনিবরের বাসাবাড়ী—সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকিতেন। মুনিবরের স্থায়ী আশ্রম কান-পুরের নিকটবর্তী বিঠুর নামক স্থানে। এখানে দেখিলাম কি? অশ্বখবৃক্ষসন্নিহিত ইষ্টকনির্মিত দুইটা মাত্র প্রাসাদ। একটা প্রাসাদ মধ্যে অযত্ন রক্ষিত মৃন্ময় রামায়ণহস্তে মুনিবর বান্মৌকি মৃন্ময়ী সীতাদেবীকে রামায়ণ শুনাই তেছেন। ও হরি হরি !! এই কি সেই শান্তিধাম? এই কি সেই আশ্রম? এই স্থানেই কি মুনিবর বান্মৌকি তপস্যা করিয়াছিলেন? এই কি সেই তপোবন? কৈ,

তীর্থ-কাহিনী ।

সে শাস্তিকুটির কৈ ? কৈ, সে ফল-পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষরাজি কৈ ? এই মূর্তি কি সেই দেবসদৃশ বাল্মীকি মুনিবরের ? এই মূর্তি কি সেই সতী সাধবী পতিব্রতা সীতাদেবীর ? না, সকলি গিয়াছে, একমাত্র রামায়ণখানি এখনও মুনিবর ও সীতাদেবীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে করিয়া রাখিয়াছে—যাবচ্ছত্র দিবাকর বুকে করিয়া রাখিবে । যাহা হউক, অপর সোঁধটা জটনৈক সাধু অধিকার করিয়া আছেন । আশ্রমের “আ”ও নাই, কেবল “শ্রম”ই সার হইল । ক্ষুধা মনে বাসায় ফিরিলাম ।

একটা বাজার আছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্তই পাওয়া যায় । লুচি, চিনি, সন্দেশ, তরিতরকারী, ফল-মূল প্রভৃতির দোকানও আছে । অষ্টাহ পর একটা হাট বসে, তাহাতে পর্যাপ্ত জিনিষ আমদানী হয় । যাত্রিনিবাস না থাকায় অত্যধিক যাত্রী-সমাগমে পাণ্ডাদিগের গৃহে স্থানসংকুলান না হইলে, যাত্রিদিগকে সময়ে সময়ে ঘোর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত । এই অসুবিধা দর্শনে কানপুর-নিবাসিনী পরহুঃখকাতরা দয়াবতী দানশীলা পুণ্যবতী শ্রীশ্রীমতী কমলকুমারী দেবী সংপ্রতি এইখানে শ্রীরাম-লছমনজি ঠাকুর স্থাপনপূর্বক তৎসহ একটা ধর্মশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়া যাত্রিগণের অসুবিধা দূর ও স্বকীয় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন ।

স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নহে । মধ্যবিত্ত লোকের বসতি অধিক । এখানে থানা, স্কুল ও পোষ্টাফিস আছে । কোন বৃহৎ জলাশয় নাই, এজন্য সকলেই কুপোদক ব্যবহার করে । যতগুলি কূপ আছে তাহার মধ্যে সীতাকূপের জলই ভাল । এ স্থানের কার্য্য

নৈমিষারণ্য !

শেষ হইলেও আমরা পাণ্ডাগণের যত্নে ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া এই স্থানে তিন দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। যাইবার সময় আমরা পাণ্ডা ঠাকুরকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া বিদায় হইলাম, তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভূয়োভূয়ঃ আশীর্বাদ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন যে “সীতাপুর হইতে গোলা গোকর্ণ যাইয়া তথায় গোকর্ণেশ্বর শিব দর্শন করিয়া যাইবেন”। এ স্থানটীও স্কন্দ পুরাণে প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থান বলিয়া উল্লিখিত।

আমরা প্রাতে তথা হইতে রওনা হইয়া সোজা সড়ক পথে সাত ক্রোশ অতিক্রম পূর্বক মধ্যাহ্নকালে সীতাপুর ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনটী অতি ছোট—একটা মাত্র পাঁচঘর। যাত্রীগণের অবস্থিতি জন্য স্বতন্ত্র ঘর নাই। ষ্টেশনের ধারে দোকান-পত্র কিছুই নাই। বাজার ভিন্ন এখানে খাদ্য পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তথা হইতে ফিরিয়া বাজারে আসিলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড বাজার, নানাবিধ জিনিস-পত্রে দোকানসকল পরিপূর্ণ, আমদানী রপ্তানীও যথেষ্ট। বড় বড় মহাজন, আড়তদার প্রভৃতিতে স্থান জনাকীর্ণ, সহর গুল্জার, খাদ্য-সামগ্রী সকল রকমই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, আমরা একটা দোকান হইতে লুচি, জিলিপী, পানিতোয়া, ক্ষীর লইয়া আহার করিলাম। আহারটি পরিতোষ রূপেই হইল। পরে ষ্টেশনে আসিয়া নিকটস্থ বৃক্ষতলে একটা হাঁদার নিকট বিশ্রাম করিলাম। ক্রমে সূর্যাস্ত হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ষ্টেশনের গৃহে গিয়া একখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া শয়ন

তীর্থ-কাহিনী ।

করলাম । রাত্রি দশটার সময় “জিঃ ল্যাটাং জিঃ ল্যাটাং” শব্দে টিকিটের ঘণ্টা বাজিল । তখন উঠিয়া গিয়া (৥৫) সোওয়া আট আনা দিয়া গোলা গোকর্ণের টিকিট লইলাম । প্ল্যাটফর্মের দিকে যাইতে না যাইতেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত, তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম । কিছু পরেই বংশীধ্বনি করিয়া “হুন্ হুন্” শব্দে গাড়ী ছুটিল ; ক্রমে আট নয়টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমাদের অভীষ্ট ষ্টেশন গোলা গোকর্ণে উপস্থিত হইলে, আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করলাম । তখন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকা । গেটে টিকিট দিয়া বাহির হইতেই দেখি, ধর্মশালার জনৈক কর্মচারী লণ্ঠনহস্তে দাঁড়াইয়া ধর্মশালায় যাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । সেদিন আমরা ব্যতীত ধর্মশালার যাত্রী আর কেহই ছিল না । আমরাগকে লইয়া ধর্মশালার চলিলেন । অধিক দূর যাইতে হইল না ; ষ্টেশনের নিকটেই প্রকাণ্ড ধর্মশালা । তথায় একটি কুঠারী পাইয়া তাহাতেই রাত্রিযাপন করলাম ।

পরদিবস প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গোকর্ণনাথ শিব দর্শনার্থ চলিলাম । অনতিদূরেই গোকর্ণনাথ শিবমন্দির, তন্নিকটেই গোকর্ণ সরোবর । সরোবরটি অতি বৃহৎ, চারি প্রান্ত ইষ্টকদ্বারা উত্তমরূপ বাঁধান ; কিন্তু জল অত্যন্ত ও অপরিষ্কৃত । তাহাতেই স্নান ও তর্পণ করিয়া মন্দির মধ্যে নিম্নদেশে নামিয়া গোকর্ণনাথ শিব দর্শন করিতে হইল । এই শিবের উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তত্রতা পুরোহিত ঠাকুর যেরূপ বর্ণনা করিলেন তাহাতে বৈদ্যনাথের উৎপত্তি শ্রবণ করাইয়া দেয় । এ শিবলিঙ্গও

মিশ্রণতীর্থ ।

দশানন কর্তৃক আনীত । এ প্রদেশে এই তীর্থস্থানটি অতি প্রসিদ্ধ । শিবচতুর্দশীতে এখানে মহাসমারোহের সহিত একটি মেলা বসে । তখন বহু দূর দূরান্তর হইতে বহুতর যাত্রী আসিয়া সাড়ম্বরে পূজাদি করিয়া থাকেন । নিত্যপূজাও বেশ ধুমধামে সম্পন্ন হয় । মন্দিরটি বেশ সুন্দর ও সুদৃশ্য,—প্রাঙ্গণটি সম্পূর্ণ ইষ্টকদ্বারা নির্মিত । স্থানে স্থানে সৌধাবলী পরিশোভিত । অনেকগুলি সাধু-সন্ন্যাসী এই সৌধাবলিগুলি আশ্রয় করিয়া আছেন । স্থানটি মন্দ নহে, খাদ্যাদিও সমস্তই পাওয়া যায় । সাধারণ মত একটি বাজার আছে ; সময়াভাব বশতঃ স্থানটি উত্তমরূপে দেখা হইল না । দশটার মধ্যেই দর্শনাদি করতঃ আহাৰাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইল ; এজন্য তাড়াতাড়ি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে যাইয়া হরিদ্বারের টিকিট লইলাম । এই স্থান হইতে হরিদ্বারের রেলভাড়া (২৮/৫) দুই টাকা সোওয়া চৌদ্দ আনা মাত্র । দশটার সময়ে গাড়ীতে চাপিয়া হরিদ্বারাভিমুখে রওনা হইলাম । ক্রমে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম পূর্ব্বক রাত্রি দুই ঘটিকার সময় বেরেলি সিটি জংসন ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ অন্য গাড়ীতে উঠিয়া চারিটার সময় লাক্সার যাইয়া নামিলাম । লাক্সার—জংসন ষ্টেশন । এই স্থান হইতে পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া কয়েকটি মাত্র ষ্টেশন অস্তে প্রাতে পাঁচটার সময় হরিদ্বার পৌঁছিলাম ।

हरिद्वार

वा

मायापुरी ।

यत्र सा वैष्णवी माया पाशैर्न पाशयेत् ।
केचिदूचुहरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे ॥
गङ्गाद्वारं केप्याहः केचिन्मायापुरीं पुनः ।
यतो विनिर्गता गङ्गा ख्याता भागीरथी भूवि ॥
(काशी ऋषे)

स्वर्गद्वारेण तत्तुल्यं गङ्गाद्वारं न संशयः ।
तत्राभिषेकं कुर्यात् कोटि तीर्थ समाहितः ॥
लभन्ते पुण्डरीकं कूलैश्च समुद्वरेण ।
सर्वत्र श्रुता गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ॥
हरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ।
वासवाद्याः श्रुताः सर्वे गङ्गाद्वारं मनोहरं ॥
समागत्य प्रकुर्वन्ति श्रानदानादिकं मुने ।
दैवयोगान्मुने तत्र ये त्यजन्ति कलेवरं ॥
मनुष्य पक्षी कीटाद्यास्तु लभन्ते परंपदं ॥
(पुराणास्तरे)

হরিদ্বার ।

অর্থ ৭

যেখানে মহামায়ার বৈষ্ণবী মায়ার জীবগণকে মায়াপাশে আবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাকেই কেহ হরিদ্বার, কেহ মোক্ষদ্বার, কেহ গঙ্গাদ্বার, কেহ মায়রপুরী বলেন । যে স্থান হইতে গঙ্গা বিনির্গত হইয়া পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন, সেই গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের তুল্য, তাহাতে আর সংশয় নাই ।

হরিদ্বারে গঙ্গায় স্নান করিলে কোটিতীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । এবং জীবনান্তে পুণ্ডরীকস্থ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ও তাহার কুল উদ্ধার হয় । গঙ্গা সর্বত্র সুলভা কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও সাগরসঙ্গমে দুর্লভা । ইন্দ্রাদি দেবগণও ঐ সকল স্থানে আসিয়া স্নানাদি করেন । দৈবযোগে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি প্রাণীগণ প্রাণত্যাগ করিলে তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।

হরিদ্বার, আগরা এবং অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে, মিরাট বিভাগে সাহারণপুর জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্রেস্থ ভাগীরথী গঙ্গার উত্তর কূলে অবস্থিত ।

হাওড়া হইতে হরিদ্বার ৯৭১ মাইল । ভাড়া (৯০) সোওয়া নয় টাকা । হাওড়া হইতে মোগলসরাই জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া আউদ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেল বেনারস ও অযোধ্যা হইয়া লঙ্কৌ পৌছিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে উঠিয়া লাক্ষ্মার জংসনে নামিতে হয় ; তথা হইতে অন্য গাড়ীতে হরিদ্বার পৌছিতে হয় ।

প্রথমতঃ হিমালয় দর্শন মাত্রেরি প্রণাম পূর্বক হরিদ্বারে প্রবেশ

তীর্থ-কাহিনী ।

করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্থানে উপনীত হইতে হয় । গঙ্গাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক মস্তকে গঙ্গাজলের অভ্যক্ষণ দান ও উদ্ধৃত জলে পদধোতাদি কর্তব্য । আমরা ষ্টেপন হইতে বহির্গত হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ সৌধাবলীর মধ্য দিয়া প্রশস্ত সড়ক পথে ব্রহ্মকুণ্ড উদ্দেশে প্রায় এক ক্রোশ গমন করিয়া তৎস্থান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের উপরিস্থিত কাশ্মীরাদিপতির বৃহৎ ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম । এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে । তন্মধ্যে এইটা যাত্রীগণের থাকিবার জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । আমরা তথায় বস্ত্রাদি রাখিয়া পাণ্ডার সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া স্নান করিলাম । এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটেই মন্দির মধ্যে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্তি আছে । দর্শন ও পূজা করিয়া এক মাইল দক্ষিণে কুশাবর্তের ঘাটে উপস্থিত হইলাম । এই ঘাটে কোন ঋষি ধ্যানস্থ ছিলেন ; তৎকালে গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গতা হইয়া ঐ ঋষির কুশ স্রোত-জলে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং স্বীয় কুশ দেখিতে না পাওয়ায় ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন ; তখন ভাগীরথী হৃষ্টচিত্তে মুনির নিকট আসিয়া কুশ প্রদানপূর্বক এই বর দেন যে অদ্য হইতে এই স্থানের নাম কুশবর্ত হইল । পরন্তু এইখানে যে কোন ব্যক্তি আসিয়া আপন পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিবেন তাঁহার পিতৃকুল বিমুক্ত প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে । সেই হইতেই যাত্রীগণ এই স্থানে আগমন করতঃ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া থাকে । এই স্থান হইতে দুই মাইল দক্ষিণে মায়াপুরী বা কন্থল তীর্থ । ইহা পুরাকালে দক্ষরাজার

হরিদ্বার ।

রাজধানী ছিল । পাণ্ডাগণ এখনও দক্ষালয়, যজ্ঞস্থান ও দক্ষেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করান । কনখল্ মহরটী মন্দির নহে । এই স্থানের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এক মাইল দূরে সতীর দেহত্যাগের স্থান । তথায় সতীকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে । পাণ্ডার নিকট ক্রত হইলাম, এই-কুণ্ডে সাত রবিবার স্নান করিলে সতীর জায় সৌভাগ্যবতী হইয়া সতীলোকে বাস করে । হরিদ্বারে বিশ্বপর্বতে বিশ্বক্কের উৎপত্তি ও বিশ্বকেশ্বর মহাদেব দর্শন ও পূজা করা যাত্রীমাত্রেই কর্তব্য । ইনিই মায়াপুরীর ক্ষেত্রপাল দেবতা । হরিদ্বারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সূর্য্যকুণ্ড,—এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিতে হয় । হরিদ্বারের পর পারে এক ক্রোশ পূর্বে চণ্ডীর পাহাড় । ঐ পর্বতের শিরোপরি ছোট একটি মন্দির মধ্যে চণ্ডীমাতা আছেন । যাত্রীগণমধ্যে কেহ কেহ তথায় গমন করিয়া চণ্ডীমাতাকে দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন । ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে এক ক্রোশ দূরে সপ্তস্রোত বা সপ্তধারা । যাত্রীগণ তথায় যাইয়াও স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন । এই স্থানেই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন । হরিদ্বারের সাত ক্রোশ দূরে হৃষীকেশ পর্বত ; এই স্থানে সপ্তর্ষিগণ তপস্তা করিতেন । হরিদ্বার হইতে বার ক্রোশ দক্ষিণে দুর্গম পথে পর্বতাভ্যন্তরে পিছোড়নাথ শিবলিঙ্গ আছেন । সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কেহই তথায় প্রায় যায় না । হরিদ্বার হইতে অতি দুর্গম পথে বহুদূরে হিমালয় পর্বতাভ্যন্তরে কেশব-বন্দ্রীনারায়ণ যাইতে হয় । হরিদ্বার ষ্টেশনে রেল পাঞ্জাব জালামুখী জলকর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া যায় । তৎপর পদব্রজে যাইতে হয় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

এই হরিদ্বারে প্রতি বার বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয় । নানাদিগ্-
দেশাগত যাত্রিগণ মেলার সময় আসিয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে
কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন । ঐ সময়ে এই স্থানে
সমারোহের পরিসীমা থাকে না । বহুতর রাজা ও মাড়োয়ারি ধনি-
গণ ঐ মেলা উপলক্ষে অসংখ্য দাস দাসী, হয় হস্তী, বাদ্যভাণ্ড
সমভিব্যাহারে আসিয়া মেলাতে যোগ দেন এবং অকাতরে ভক্ষ্য,
ভোজ্য ও বস্ত্রাদি সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে বিতরণ করেন । এই সময়ে
নানা দেশ হইতে শৈব শাক্ত, সৌর গাণপত্য, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের
সাধু-সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, নাগা, অবধূত, রামায়ত
প্রভৃতি আসিয়া থাকেন । সাধু-সন্ন্যাসীর এতই সমাগম হয় যে
তাহার একটা পরিমাণ করা যায় না । তখন এই স্থান মহানগরী
রূপে পরিণত হয় । চতুর্দিকেই দিবারাত্রি ভগবানের নাম সম্বলিত
নৃত্যগীতধ্বনি বাতীত আর কিছুই শুনা যায় না । আমি জীবনে
এতাদৃশ সমারোহের মেলা আর কখন দেখি নাই ।

হরিদ্বারের পাণ্ডাগণ অতি ভদ্র স্বভাব । যাত্রিগণ স্বেচ্ছায় যে
বাহা দেয় তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন । হরিদ্বারে
ও কন্থলে বহুতর ভাড়াটিয়া পাকাবাড়ী ও অনেকগুলি ধর্মশালা
আছে । যাত্রিগণ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে থাকিয়া আপন
আপন কার্য সম্পাদন করেন । পাঁচ দিবসের কমে এই স্থানের
দর্শনাদি কার্য শেষ হয় না । রীতিমত বাজার আছে—তাহাতে
আমিষ ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যই যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায় ।

হরিদ্বার ।

এই স্থানে শীতের অত্যন্ত প্রাচুর্য। শীতকালে এখানে আসা অত্যন্ত কষ্টকর। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভেই এ দেশ পর্যটনের প্রশস্ত সময়। হরিদ্বার অতি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। গঙ্গার জল ও হাওয়ার এতই শুণ যে ঔষধের তুল্য কাজ করে। আমরা মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হরিদ্বারের মেলা দর্শনান্তে ১৩১০ সালের প্রারম্ভেই কেদার-বজ্রীনারায়ণ দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম।

এই স্থান হইতে জালামুখী যাওয়া যায়, ভাড়া (২৥০) অড়াই টাকা। জলন্ধর নামক ষ্টেশনে নামিয়া বাইতে হয়।



কেদারধাম ।

দেবৈরপি স্তুত্প্রাপ্যমতঃ কেদার মুত্তমম্ ।
ক্ষেত্রাণাং পরমং ক্ষেত্রং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্ ॥
গতীনাং পরমং ভদ্রং স্থানং তদতিদুল্লভং ।
সংসার ছেদনার্থায় তীর্থং কেদার বিশ্রুতং ॥
গর্ভবাসো ন তে যান্তি মুক্তান্তে পুরুষোত্তমাঃ ।
বহ্নাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং বরাননে ॥
কেদার সদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
তৎক্ষেত্র মম বীর্যঞ্চ তত্তীর্থং তত্তপোষণং ॥
সৰ্বলোক হিতার্থায় সৰ্ব পাপক্ষয়ং করং ।
কেদার দর্শনাদেব লভতে বিবিধং ফলং ॥
স্মরণাদশ্বমেধশ্চ ফলং হি বিদ্যতে পরং ।
স্পর্শনাং ব্রহ্মহত্যাди पापं याति न संशय ॥
অর্চনাং ভক্তিভাবেন লভতে মোক্ষমুত্তমং ।
মম দেহাৎ সমুদ্ভূতং কেদারং তীর্থমুত্তমং ॥
তস্য সংসরণাদুদ্রে ভদ্রেব প্রপূর্যতে ।
পাতকৈশ্চ বিমুচ্যন্তে আজমোপার্জিতৈরপি ॥

কেদারনাথ ।

যে বদ্যস্তপি কেদারং গমিষ্যামি বরাননে ।

পিতরস্তস্য দেবেশি ত্রিশতং কুলসংযুতাঃ ॥

গচ্ছন্তি শিবলোকেতু সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥

(উত্তরাখণ্ডে কেদার মাহাত্ম্যে)

অর্থঃ

এই পরম পবিত্র তীর্থোত্তম কেদার তীর্থ সুরগণেরও সুদুস্ত্রাপ্য । ইহা ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এবং তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম তীর্থ । পরম মঙ্গলদায়ক কেদারক্ষেত্রের ন্যায় স্থান অতি দুর্লভ । সংসার-পাশ ছেদন নিমিত্ত পরম-শুভগতিপ্রদ এই কেদারতীর্থই বিশ্রুত । এই ক্ষেত্র যে গর্ভবাস-নাশক মুক্তিদায়ক স্থান তাহাতে কিছুমাত্রও সংশয় নাই । জগতে এই কেদারতীর্থের সমান পরমতীর্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতেও আর হইবে না । এই কেদার ক্ষেত্র মহাদেবের তেজসম্বৃত । সর্ব লোকের হিতের নিমিত্ত এবং সর্বপ্রকার পাপক্ষয় জন্যই এই পরমক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে । এই ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত দেবতা কেদারনাথকে দর্শন করিলে অশেষবিধ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় । অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয় কেদারনাথকে স্মরণ করিলেই তাহা লাভ হয় । এই পরম পবিত্র সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গরূপী কেদারনাথকে স্পর্শ করা মাত্রই ব্রহ্মহত্যাदि মহাপাপ সকল বিনষ্ট হয় । যে ব্যক্তি মুক্তি ইচ্ছায় ভক্তিপূর্বক কেদারনাথকে পূজা করে সে অনায়াসেই পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । এই কেদারতীর্থ শম্বুর দেহ হইতে সম্ভূত

তীর্থ-কাহিনী ।

উত্তম তীর্থ। এই তীর্থ স্মরণমাত্রেই জীবের আত্মমার্জিত পাপরাশি বিনাশ পায়। যে ব্যক্তি কদাচিৎ এরূপ বলে যে “আমি কেদার তীর্থে যাইব” তাহারও পিতৃকুলের ত্রিশত পুরুষ শিবলোকে গমন করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উত্তরাখণ্ডে গমন কালে পশ্চিমধ্যে বহুতর তীর্থ দেখা যায় ; তন্মধ্যে কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদ্রীনাথ এই তীর্থত্রয় প্রধান এবং মানবের দুর্গম্য। গঙ্গোত্তরী এবং যমুনোত্তরী প্রধান তীর্থ সত্য, কিন্তু মানবের অগম্য স্থান। তথায় গমনের পথ নাই—লোকালয় নাই, সূতরাং খাদ্যাদিরও সম্পূর্ণ অভাব। কেহ কেহ ৪।৫ দিনের উপবাসী খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া উক্ত তীর্থাভিমুখে যাইয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশই ঈপ্সিত স্থানে যাইতে পারেন না। কেন না, সে স্থান এক প্রকার মনুষ্যের অগম্য।

কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ এই দুইটি তীর্থস্থান তুষারাচ্ছাদিত—হিমগিরির উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এই উভয় তীর্থের মধ্যে তুঙ্গনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ গমনাগমন কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সমস্তগুলির বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

বদরিকাশ্রম, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থই কেদারখণ্ডান্তর্গত ; এ কারণ কেদারনাথ দর্শনপূর্বক বদরিকাশ্রম যাইতে হয় ; ইহাই উত্তরাখণ্ডের বিধি। কিন্তু কেহ কেহ কেদারধাম দর্শন না করিয়াও বদরিকাশ্রম যাইয়া থাকেন। তাহার পশ্চিমধ্যে অত্যাশ্রিত তীর্থের দর্শন পান না, সূতরাং উত্তরাখণ্ডের মতে তাহার তত্তীর্থে গমন জন্ত সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন না।

কেদারনাথ ।

হরিদ্বার হইতে কেদার ধাম দেড়শত মাইল দূরবর্তী স্থান । কেদারধাম হইতে বদরিকাশ্রম একানব্বুই মাইল দূরে । তথা হইতে নন্দপ্রয়াগ বায়ান্ন মাইল ব্যবধান । তথা হইতে মেলচৈরী একচল্লিশ মাইল ; মেলচৈরী হইতে কাঠগুদাম উনষাট মাইল ব্যবধান । মোট তিন শত নিরানব্বুই মাইল ভ্রমণ করিতে হয় । এই পথ স্থানে স্থানে কিরূপ দুর্গম ও ভয়ানক তাহা অনুভবনীয়, কিন্তু বর্ণনীয় নহে । এই পার্বত্য পথের সংকীর্ণতা, বন্ধুরতা, উচ্চতা এবং ভীষণ গভীরতা—এ পথের পথিক ব্যতীত অন্তের দূরমুমেয় । পর্বতের বিষম বন্ধুর গাত্রে সর্পাকার কুটিলপথ—একবার শীর্ষদেশে উঠিতে হয়, পুনরায় পাদদেশে অবতরণ করিতে হয় । এইরূপ পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম পূর্বক চলিতে হয় । কোন পর্বত এক মাইল, কোন পর্বত দুই মাইল, আবার কোন কোন পর্বত তিন মাইল পর্য্যন্ত উচ্চ । তবে এইমাত্র সুবিধা যে দুই তিন মাইল ব্যবধানেই চটী । যাত্রিগণ গমনে অশক্ত হইলে বা ক্লান্ত হইলে ঐ সকল চটীতে অবস্থিতিপূর্বক স্নানাহার ও বিশ্রাম করিতে পারেন । হিমালয়ের যে সকল স্থান নমতল তথায় গ্রাম বা চটী আছে । অধিক যাত্রী সমাগমে উক্ত চটীতে স্থানের সংকুলন না হইলে সময় সময় বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অগ্নি সেবন দ্বারা রক্তনো অতিবাহিত করিতে হয় ।

আজ ১লা বৈশাখ, ১৩১০ সাল আশ্বিন, — শুভদিনে আমরা শুভ যাত্রা করিলাম । হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি অস্তে চারিটার সময় রওনা হইয়া ছয় মাইল পথ গমন করতঃ সন্ধ্যার সময় সত্যনারায়ণ

তীর্থ-কাহিনী ।

পৌছিলাম। এই স্থানে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত সত্যনারায়ণ নামে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অপূর্ব মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড ধর্মশালা, কিন্তু তাহা যাত্রিপরিশূন্য—সুতরাং স্থানাভাব। প্রথম দিবসেই আমাদিগকে বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইল। এই দেবালয় ও ধর্মশালা উত্তর-পশ্চিমের মহাত্মা কালী কবলীওয়ালার ঘনুনাথজির যত্নে নির্মিত। ইহার নির্মিত একশত আটটি ধর্মশালা ও পঁয়ত্রিশটি সত্র আছে। ইনি একজন দানশীল ধর্মপ্রায়ণ সন্ন্যাসী। এই সকল ধর্মশালায় নিত্য নিত্য শত শত তীর্থযাত্রীর পরম কল্যাণ সাধন করিয়া নির্মাণকর্তার ধর্ম ও যশঃ সৌরভ দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত করিতেছে। পাঠক! সত্যনারায়ণে সুধু ধর্মশালা নয়—সত্রও আছে। এই স্থানে যত লোকই উপস্থিত হউক না কেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পরিমাণে চাউল, দাইল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। বজ্রীনারায়ণ গমনশীল সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া এই সদাব্রতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা গৃহী, সুতরাং আমাদের পরান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ, একত্র উপবাসে বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিতে হইল। পরদিবস প্রাতে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া তের মাইল যাইয়া মধ্যাহ্নকালে হৃষীকেশ উপস্থিত হইলাম। এস্থানটি প্রায় সহরের মত। পূর্বোক্ত মহাত্মা কর্তৃক স্থাপিত ধর্মশালা ও সত্র, তৎসহ একটি ডাক্তার-খানাও এখানে আছে। ধর্মশালায় যথাযোগ্য লোকসকল নিযুক্ত আছে। যাহারা রন্ধনাদি করিতে অসম্মত তাঁহারা দাইল ও রুটি প্রস্তুতই পাইয়া থাকেন। যাহারা সিধার প্রার্থী তাঁহারা সিধা

কেদারনাথ ।

পাইয়া থাকেন । যাহারা কেবল স্থানের প্রার্থী তাঁহারা ধর্মশালায় সাদরে আশ্রয় প্রাপ্ত হন । যাহারা ধর্মশালায় অশুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা স্থানান্তরে থাকিতে পারেন । থাকিবার স্থানের অভাব নাই । এই স্থানে আউট পোস্ট, পোস্টাফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে । কথিত আছে, এই স্থানে সপ্তর্ষিগণ তপস্তা করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত এই স্থানের নাম ঋষিকেশ । উক্ত ঋষিদিগের কোন চিহ্ন নাই । উত্তরাখণ্ডে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাদিগের তপস্তার কথা দেখিতে পাওয়া যায় । এইখানে ভাগীরথী-তীরে একটি কুণ্ড আছে ; ঐ কুণ্ডকে কুজাকুণ্ড বলে । এই কুণ্ডে স্নান তর্পণ ও তত্বীরে রাত্রিবাসে অশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । কুণ্ডতীরে মন্দিরমধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতামূর্তি স্থাপিতা আছেন । ইহাও দর্শন কর্তব্য । উত্তরাখণ্ডে এই মূর্তিত্রয়ের উল্লেখ দেখা যায় না, কেবল চম্পেশ্বর নামক শিব লিঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় । কুজাকুণ্ড হইতে এক মাইল দূরে প্রান্তর মধ্যে একটি মন্দিরে উক্ত লিঙ্গ দৃষ্ট হয় । যাত্রী-মাত্রেই এই শিবমূর্তি দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন । এই ক্ষেত্রে পাণ্ডা না থাকায় কোন ব্যয় বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থা না জানায় অনেকের ভাগ্যেই দর্শন ঘটিয়া উঠে না । প্রায় সকল যাত্রীই এইখানে এক রাত্রি বাস করেন ।

অবস্থাপন্ন যাত্রিগণ, যাহারা হরিদ্বার হইতে কাণ্ডী (১) বা

(১) কাণ্ডী—ইহার আকার আমাদের দেশের বাদ্যযন্ত্র কাড়ার স্থায়,—বংশ-শলাকার নির্মিত । যে সকল কাণ্ডীতে বাতাস উঠে সেগুলি হেলান দেওয়া মেড়ির স্থায়—একপাশে কাটা থাকায় অন্যপাশে পাল্লুগাইয়া চেয়ারে বসার স্থায় বসা যায় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

ঝাম্পানের (২) কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন নাই, তাঁহারা এইখানে সে সকল বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন । এই স্থানে যথেষ্ট কাণ্ডী ও ঝাম্পান্ পাওয়া যায় । এই স্থান হইতে বন্দোবস্ত করিয়া না লইলে পশ্চিমধ্যে ঐ সকল পাওয়া কঠিন । বজ্রীনারায়ণ হইয়া কাঠগুদাম পর্যন্ত ঝাম্পানের ভাড়া (৮০) আশি টাকা । কাণ্ডী (মানুষের জন্ত) ভাড়া (৬০) ষাট টাকা । কাণ্ডী (জিনিষের জন্ত) মণ প্রতি—তিন টাকা ।

আমরা এই স্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া প্রাতে রওয়ানা হইয়া চারি মাইল পথ পদব্রজে যাইয়া লছমন্ ঝোলায় পৌঁছিলাম । এই ঝোলার বিষয় পূর্বে মনে মনে কত প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম ; এক্ষণে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল । ইহা দোলায়মান লৌহসেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে । পূর্বকার ঝোলা উঠাইয়া দিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর সূর্যমল

বাহকগণ ঐ কাণ্ডী সহিত আরোহীকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সম্মুখে কিছু উপুড় হইয়া গমন করে । জিনিষের জন্ত কাণ্ডী সম্পূর্ণ কাড়ার শ্রায়—দেড় হাত উচ্চ ।

(২) ঝাম্পান্—ইহা এক প্রকার শিবিকা । আমাদের দেশে যেমন ডলি ইহাও তদ্রূপ । ডলীর উপরদিকে আবরণ আছে, ইহাতে সে আবরণ নাই । ডুলীর বহনদণ্ড উপরদিকে একটী—ইহার বহনদণ্ড নিম্নের দিকে দুইটী, চারিটী পাওয়ার সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ । এই বাহনদণ্ডের অগ্র পশ্চাৎ মোটা দড়ী দ্বারা পরস্পর একপভাবে আবদ্ধ যে উভয় দণ্ডের মধ্যস্থানে ঐ দড়ীর মধ্য দিয়া দুই হাত পরিমিত বংশদণ্ড যোগ করিয়া দেওয়ায় ঐ দণ্ড অগ্র পশ্চাৎ হইয়া চারি জন বাহক স্বন্ধে করিয়া অনায়াসেই পার্বত্য সংকীর্ণ পথে গমন করে ।

কেদারনাথ ।

ঝুন্ঝুনিওয়ালা প্রভূত অর্থব্যয়ে উল্লিখিত নিরাপদ সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়া যাত্রীগণের অশেষ উপকার সাধনা করিয়াছেন এবং অক্ষয় কীর্তি দ্বারা আপনি নিজের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । পূর্বে রজ্জুনির্মিত সেতু ছিল ; এই জন্তই উহা ঝোলানামে কথিত হইত । সময় সময় উক্ত রজ্জু ছিন্ন হইয়া আরোহি যাত্রীর প্রাণ নষ্ট হইত । এক্ষণে আর সে আশঙ্কা নাই । পূর্ব ঝোলার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দুইটা খাম অদ্যাপি বর্তমান আছে । এই স্থানে লক্ষণদেবের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে । সামান্য সামান্য মুদির দুই একটা দোকান আছে, — আর আছে সদাব্রত । সেই ঋষিকেশের ধর্মশালা যে মহাত্মার, — এখানেও তাঁহারই সদাব্রত । এখানে থাকিবার জন্ত কোন পাহাশালা নাই । সাধু-সন্ন্যাসিগণ সিধার আটা ও দাইল গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন । এই স্থান হইতে দেবপ্রয়াগ সাড়ে তেতাল্লিশ মাইল । ভাগীরথীর তীর দিয়া সাড়ে চারি দিবস পার্বত্য পথে গমন করিয়া দেবপ্রয়াগে পৌঁছলাম । দেবপ্রয়াগ একটা তীর্থ-স্থান । পুরাণে ইহার মহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে :—

ইদংপুণ্যতমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমং ।

ভবিষ্যতি কলৌ দেব সর্বান্ন বন দাহকং ॥

অগ্নিন্ ক্ষেত্রে মৃতা যে তু বিষ্ণুপূজন কারকাঃ ।

সঙ্গমে স্নান কর্তারস্তে যান্তি পরমাংগতিং ॥

স্নানাদলক গঙ্গায়াং দর্শনাদ্ধত্তি পাতকং ।

কিং পুনঃ সঙ্গমস্নানং ফলাধিক্যং প্রচক্ষতে ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

অর্থাৎ

এই পরম পুণ্যতম তীর্থ-ক্ষেত্র তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ ; ভবিষ্যতে কলিকালে পাতক সকল দধিকারী দাবানল সদৃশ । বিমুক্তকৃত যে মানব এই সঙ্গমস্থলে স্নান করতঃ মৃত হয় তাহার পরমগতি লাভ হয় । অলকনন্দা গঙ্গাতে স্নান ও দর্শনে মহাপাপাদি নাশ হয় । সঙ্গমস্থানের ফলাধিক্যের বিষয় আর কি বলিব ?

দেবপ্রয়াগে বদরিকাশ্রম হইতে এই অলকানন্দা গঙ্গা বহির্গত হইয়া প্রবলবেগে আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সঙ্গত হইয়াছেন । এই সঙ্গমস্থলে স্নান তর্পণাস্তর পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে হয় ; তদন্তর শ্রীরঘুনাথজিকে দর্শন কর্তব্য । অনেকেই এই স্থানে রাত্রিবাস করেন । রঘুনাথ দর্শন ও রাত্রিবাসে ফলাধিক্য আছে । এই স্থানের কার্যাদির ব্যয় মোট (৥০) আট আনা মাত্র ।

এই দেবপ্রয়াগের পাণ্ডাগণই বদরিকাশ্রমের পাণ্ডা । এই স্থানে যাহাকে পাণ্ডা স্বীকার করা যাইবে বদরিকাশ্রমের পাণ্ডাও তিনিই হইবেন । ইহারা যে কেমন ভীষণ স্বভাবের পাণ্ডা তাহা বদরিকাশ্রমে না গেলে বুঝিতে পারা যায় না । যাত্রীগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানের কার্য্য অতি সরলতার সহিত (৥০) আট আনার মধ্যেই সম্পন্ন করেন ; কিন্তু বদরিকাশ্রমে যাইয়া যাত্রীগণের যথাসর্বস্ব লইয়াও সন্তুষ্ট হন না । দেবপ্রয়াগে প্রায় চারি পাঁচ শত পাণ্ডার বসতি আছে । ইহারা বদরিনারায়ণের প্রসাদে উক্ত প্রকারে সকলেই ধনবান । উহাদের মধ্যে কর্ণাট,

কেদারনাথ ।

সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড় এবং দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণই অধিক । এদেশে হিন্দু ব্যতীত মুসলমান একেবারেই নাই । ইঁহারা নিরামিষভোজী । বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মিতাক্ষরার মতে । ইঁহাদের বসতি দেবপ্রয়াগে পর্বত-গাত্রস্থ ক্রমনিম্ন স্থানের উপর । এই বসতিস্থান দুই ভাগে বিভক্ত । অলকানন্দার যে তীরে বাজার, তাহা ইংরেজাধিকৃত ; এবং যে তীরে পাণ্ডাগণের বসতি, তাহা তিহরির মহারাজার অধিকার-ভুক্ত । সুতরাং এই অলকানন্দা ব্রিটিশ গাভোয়াল ও স্বাধীন গাভোয়ালকে পৃথক্ করিয়াছে ।

এই দেবপ্রয়াগ হইতে একটা পথ তিহরির অধিকার হিমালয়ের এক অংশের মধ্য দিয়া গঙ্গোত্তরীর দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে । এই স্থান হইতে উক্ত পথে গঙ্গোত্তরী বাইতে হয় । অপর পথ অলকানন্দার দক্ষিণ তীর অবলম্বন পূর্বক হিমগিরি ভেদ করতঃ বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছে । দেবপ্রয়াগে নিরামিষ খাদ্য সমস্তই পাওয়া যায় । এইখানে একটা পোষ্টাফিস্ মাত্র আছে । দেবপ্রয়াগ হইতে উত্তরদিকে সতের মাইল দূরে শ্রীনগর ।

আমরা দেবপ্রয়াগ হইতে কঠিন পরিশ্রমে উচ্চ নিম্ন পর্বত অধিরোহণ ও অবরোহণ করিতে করিতে আড়াই দিবসে শ্রীনগর পৌঁছিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম । সুবৃহৎ পাঠশালা—বহুতর যাত্রী একসঙ্গে থাকিতে পারেন । শ্রীনগর সহর পাহাড়ের সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত । হিমালয়ের মধ্যে যতগুলি স্থান দেখা যায় তন্মধ্যে শ্রীনগরই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান । এখানে অনেকগুলি জিনিষপত্রের দোকান আছে । খানা, পোষ্টাফিস্, টেলিগ্রাফ্

তীর্থ-কাহিনী ।

আফিন্, হস্পিটাল, স্কুল প্রভৃতি সকলই আছে । শ্রীনগরের পাহাড়ের নাম অষ্টাবক্র পাহাড় । কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনি এই পাহাড়ে তপস্তা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অধুনা তাঁহার আশ্রমের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না । শ্রীনগরের বাজার হইতে এক মাইল দূরে কমলেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন । উত্তরাখণ্ডে এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই শিবলিঙ্গ আদিলিঙ্গ । ইহার দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করা সকলেরই কর্তব্য । শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ উনিশ মাইল ব্যবধান ।

আমরা শ্রীনগর হইতে রওয়ানা হইয়া সাড়ে তিন দিবসে রুদ্র-প্রয়াগ পৌঁছিলাম । উনিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে আমাদের সাড়ে তিন দিন লাগিয়াছিল, ইহা হইতেই পাঠক এই পথের দুর্গমতা সম্যক বুঝিতে পারিবেন । কেদারধাম হইতে মন্দাকিনী গঙ্গা আসিয়া এই স্থানে অলকানন্দার সহিত সঙ্গত হওয়ায় রুদ্রপ্রয়াগ নাম হইয়াছে । পূর্বে জানিতাম, এলাহাবাদই একমাত্র প্রয়াগ ; এক্ষণে দেখিতেছি, উত্তরাখণ্ডে যে যে স্থানে দুই দুইটা নদী মিলিত হইয়াছে সেই সেই স্থানই প্রয়াগ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । ঋত হইলাম, এই হিমালয় প্রদেশেই পাঁচটা প্রয়াগ আছে । দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ এবং কর্ণপ্রয়াগ । বাত্রিগণ ঐ সমস্ত প্রয়াগেই স্নান, তর্পণ, আক্ৰ ও দর্শন করিয়া থাকেন । ক্রমে যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে ।

রুদ্রপ্রয়াগে কেবল স্নান তর্পণই করিতে হয়, পিণ্ডদানের কোন ব্যবস্থা নাই । স্নানঘাটেই ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে একটা পয়সা

কেদারনাথ ।

দিলেই তিনি স্নানের সঙ্কল্প দেওয়ান এবং তর্পণের মন্ত্র বলিয়া তর্পণ করান । স্নানান্তর আসিবার সময় স্নানঘাটের উপর মন্দির মধ্যে রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া আসিতে হয় । কথিত আছে, এই স্থানে এক রজনী বাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই কারণে অনেক যাত্রীই তথায় রাত্রিযাপন করিয়া অশ্বমেধের ফল গ্রহণ করিয়া থাকেন । রুদ্রপ্রয়াগে লোকের বসতি অল্প । সাধারণ চটীর মত স্থান । এই স্থানেই বদরিকাশ্রমের রাস্তা পরিত্যাগ করতঃ অন্য রাস্তায় মন্দাকিনীর তীর অবলম্বনে পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম পূর্বক দুর্গম পথে কেদারধাম যাইতে হয় । রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারধাম ছিয়াশি মাইল উত্তরে অবস্থিত ।

আমরা প্রাতে রুদ্রপ্রয়াগ হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্নকালে অগস্ত্য-চটী পাইলাম । এই স্থানে মন্দাকিনীগঙ্গায় স্নান করিতে হয় । অত্যন্ত শীতের জন্য অবগাহন স্নান করিতে পারিলাম না । চটীর নিকটেই অগস্ত্যাশ্রম । অগস্ত্য মুনির প্রতিমূর্তি দর্শন করতঃ অগস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয় । ইহা ভিন্ন অণ্ড কিছু দর্শনীয় নাই । অনেক যাত্রী এই স্থানে রাত্রিবাসের জন্য থাকিলেন, কাজেই আমাদিগকেও থাকিতে হইল । এই স্থান হইতে তের মাইল দূরে গুপ্ত-কাশী ।

গুপ্ত-কাশী একটি প্রধান তীর্থ । কাশী চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা উত্তর-কাশী । উত্তরাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, এ স্থানের মাহাত্ম্য কাশীর তুল্য । এই স্থানে মন্দির মধ্যে বিশ্বেশ্বর আছেন ; তৎপার্শ্বস্থ

তীর্থ-কাহিনী ।

অপর মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবী বিরাজিতা । বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বার-
দেশের প্রাঙ্গণেই মণিকর্ণিকা । প্রস্থর দ্বারা উত্তমরূপে বাধান ।
দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা পঞ্চ হস্ত পরিমিত । দেখিতে ছোট একটি
চৌবাচ্চা । নামিবার স্থানে সোপানাবলী গ্রথিত । উভয় পার্শ্ব
হইতে ঝরণার জল আসিয়া সবেগে পতিত হইতেছে । অতিরিক্ত
জল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বাহির হইয়া যাইতেছে । সুতরাং মণি-
কর্ণিকার জলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই । এই স্থানে স্নান, তর্পণ, দর্শন ও
পূজা করিয়া যাত্রিগণ কাশীর তুল্য ফল লাভ করেন । যাত্রিগণের
ইচ্ছাধীন অর্থব্যয় দ্বারাই এ স্থানের কার্য সম্পন্ন হয় । দোকানদার-
দের ঘরে থাকিয়া কার্য করিতে হয় । আমরা যথাসাধ্য কার্য
শেষ করিয়া রজনী বাপন করতঃ প্রাতে উঠিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ
উদ্দেশে রওনা হইলাম । এই স্থান হইতে সাড়ে পনের মাইল দূরে
ত্রিযুগীনারায়ণ ।

এই পথ এতই কঠোর ও দুর্গম যে সাড়ে পনের মাইল
অতিক্রম করিতে আমাদের আড়াই দিবস সময় অতীত হইয়াছিল ।
ত্রিযুগীনারায়ণ ক্ষেত্র প্রায় তিন মাইল উচ্চ পর্বতের শীর্ষদেশে
অবস্থিত । অনেক যাত্রীই এই উচ্চস্থান আরোহন ভয়ে গমনে
ক্ষান্ত হইয়া অন্য পথে গমন করেন । এই পর্বতোপরি ভগবান
নারায়ণ তিন যুগব্যাপী তপস্তা করার স্থানের নাম ত্রিযুগীনারায়ণ
হইয়াছে । এই ত্রিযুগীনাথের মন্দির-সমীপে একটি কুণ্ড আছে,
তাহাতে অবগাহন পূর্বক স্নান করতঃ মন্দির-দ্বারদেশস্থ অপর কুণ্ডে
ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দক্ষিণা দিয়া তর্পণ করিতে হয় । তৎপর

কেদারনাথ ।

মন্দিরের দ্বারবানকে একটি পয়সা দিলে সে দ্বার ছাড়িয়া দেয় ; তখন মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ত্রিযুগীনारायण दर्शन করতঃ পুনশ্চ কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া তত্রস্থ যজ্ঞকুণ্ডে যবদ্বারা হোম করিতে হয় । দক্ষিণা স্বরূপ তথায় কিঞ্চিৎ দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইতে হয় ।

এই স্থানে পাছশালায় এবং দোকান-গৃহে অবস্থিতি করা যায় । আহাৰান্তে কেহ কেহ গমন করেন, কেহ কেহ রজনী যাপন করেন । এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বোক্তর দিকে দুই দিবস গমন করিলে গৌরীকুণ্ড যাওয়া যায় । আমরা রজনী যাপনান্তে প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক গৌরীকুণ্ডোদ্দেশে যাত্রা করিলাম । পথিমধ্যে স্থানে স্থানে চটীতে বিশ্রাম করতঃ দ্বিতীয় দিবস সায়ংকালে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান গৌরীকুণ্ড প্রাপ্ত হইলাম । উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

ত্রিগব্যুতি সমস্থানাদক্ষিণে শৃণুতীর্থকং ।

গৌরীতীর্থাভিধং খ্যাতং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥

কটুষ্ণস্ত জলং তত্র সিन्दুরাভাতু মৃত্তিকা ।

তাংস্থানং দেবদেবেশি ন ত্যজামি কদাচন ।

তত্র গৌরীশ্বরত্বেন খ্যাতোহহং শিবলোকদঃ ॥

অর্থাৎ

কেদার ধাম হইতে ত্রিগব্যুতি অর্থাৎ ছয় ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণ দিকে গৌরীতীর্থ নামে খ্যাত সর্বসিদ্ধিদায়ক এক তীর্থ আছে । এই তীর্থের জল কটু ও উষ্ণ এবং তত্রস্থ মৃত্তিকা

তীর্থ-কাহিনী ।

সিন্ধুরের জ্বাল রক্তবর্ণ । আমি কখনই এই স্থান ছাড়া হই না ।
এইখানে আমি গৌরীশ্বর শিব নামে খ্যাত থাকিয়া জীবগণকে
শিবলোক প্রদান করি ।

আমরা এই স্থানে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন
করিলাম । পরদিবস গৌরীকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলাম ।
গৌরীকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণ বিশেষ ; দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতায় পঞ্চ
হস্তের ন্যূন নহে । চতুর্দিক প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান ।
এই কুণ্ডের জল কুটস্থ জল সদৃশ অত্যুষ্ণ । পার্শ্বস্থ ঝরণা
হইতে সবেগে সধূম জল নির্গত হইয়া কুণ্ডে পতিত হইতেছে ।
অপর পার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া
যাইতেছে । জলের উষ্ণতা জন্ত সহসা নামিবার সাধ্য নাই ।
দেখিলাম, পশ্চিম দেশীয় যাত্রীগণ এই কুণ্ডে ঝাঁপিয়া পড়িয়া
ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতেছে । আমি সেই সাহসে সাহসী
হইয়া হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করিয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করিলাম,
কিন্তু অবগাহনে সাহস হইল না । তখন ঘটি দ্বারা জল তুলিয়া
দেখি, ঘটি হাতে রাখা যায় না । পরে ঐ জল শীতল হইলে স্নান
করিলাম । এইরূপে স্নান তর্পণ শেষ করতঃ অনতিদূরে মন্দির
মধ্যে গৌরীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া দোকানে—বাঁসায়
আসিলাম । আহারাশ্বে আর যাওয়া হইল না । সমভিব্যাহারী
যাত্রীগণ সকলেই সেদিন সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন । পর
দিবস অতি প্রভুষ্যেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সমভিব্যাহারী যাত্রী-
দের সঙ্গে যাত্রা করিলাম । কখন শৈলোপরি, কখন শৈল-নিম্নে,

কেদারনাথ ।

কখনও বা শৈল-পার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত বক্র পথে যাইতে হইল । যখন ক্লান্তি বোধ হইত তখন পথিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতাম । এইরূপে দুঃসহ হিমবাত সহ করতঃ দুর্গম পথসকল অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশতি দিনে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলাম । দূর হইতে তীর্থক্ষেত্রের নয়নাভিরাম শোভা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল । চতুর্দিকেই কেবল ধবল তুষারমণ্ডিত শৈল-শ্রেণী । গন্তব্য পথের বহুদূর পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত বরফরাশি দ্বারা আবৃত থাকায় যাত্রীগণের গমনাগমনের বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল । কিন্তু যাত্রীগণ ক্ষেত্রের পরম শোভা দর্শনে পুলকিত চিত্ত হইয়া, সেই সকল তুষাররাশি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল । আমিও সেই সকল যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মহোৎসাহে অতি সন্তুর্পণে বরফরাশি অতিক্রম পূর্বক পরম শোভাকর অপূর্ব পুণ্যক্ষেত্র কেদারধামে উপনীত হইলাম ।

আ মরি মরি !! সে স্থানের কি আশ্চর্য্য দৃশ্য, কি পবিত্র ভাব !! ভাষা-সাগর মন্থন করিয়াও প্রকৃতির সেই অপূর্ব শোভা সাধারণকে বুঝাইবার ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র লেখকের নাই । সে স্থানের চিত্তবিনোদন নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যরাশি এখনও আমার চিত্তপটে চিত্রিত রহিয়াছে । বিশ্বসংসারে এমন অপূর্ব রম্যস্থান আর কখন কোথাও দেখি নাই । সে স্থানের শোভা দর্শনে যাত্রীগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন । তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎ-প্রেমে বিভোর এবং নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত ও মুখমণ্ডলে অপার্থিব প্রফুল্লতা আর স্বর্গীয় সরলতা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

তখন বোধ হইতে লাগিল পাপতাপপূর্ণ মানব পুণ্যপবিত্রতা-পূর্ণ দেবভাবাপন্ন হইয়াছে । ক্ষেত্রের চতুর্দিক তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ হিমশৈল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে । স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত বরফসকল পতিত আছে । মধ্যে মধ্যে তুষারাবৃত দোকান-গৃহগুলি পরম শোভা বিকাশ করিতেছে । মধ্যস্থলে প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির । মন্দিরাভ্যন্তরে সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ বিরাজিত । ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে মন্দাকিনীগঙ্গা তরল রজতধারায় কুল কুল রবে প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন । মধ্যাহ্নকালেও মার্গশিরা-কর অতি সুখকর বলিয়া বোধ হইল । সায়ংকালে ও প্রভাত সময়ে গৃহের বাহির হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর । তৎকালে দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে অগ্নি সেবন করাই পরম সুখকর । শীতের এমনই প্রকোপ যে শরীর সততই কম্পিত হইতে থাকে । এই প্রবল শীতেও যাত্রিগণ পরমোৎসাহে আনন্দহৃদয়ে মন্দাকিনীগঙ্গায় স্নান করতঃ ভক্তিভাবান্বিতচিত্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারনাথের অর্চনা করিতেছেন । আমি বিহ্বল হইয়া এই ক্ষেত্রের চিত্তরঞ্জন শোভা ও যাত্রিগণের উৎসাহ এবং কষ্টসহিষ্ণুতা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছি ; এমন সময় পাণ্ডা আসিয়া আমাকে বলিলেন—“তুমিও এই পুণ্যতোয়া মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া শরীর পবিত্র করতঃ পিতৃগণকে জলাঞ্জলি প্রদানান্তর পরম পূজনীয় সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ দর্শন ও পূজা কর” । আমি তাঁহার আদেশ মত স্নান ও তর্পণ করিয়া ভগবান্ ভবানীপতি

কেদারনাথ ।

কেদারনাথের দর্শন ও পূজার্থ ভক্তিভরে পুষ্পচন্দনসমন্বিত গঙ্গাজল
হস্তে লইলাম এবং পাণ্ডার সঙ্গে কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ
করতঃ কেদারনাথের মস্তকোপরি ঢালিয়া অর্চনা সমাধা করিলাম ।
দর্শন, স্পর্শন, আত্মনিবেদন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ ও জন্ম
সফল করতঃ সানন্দমনে বহির্দেশে অপর মন্দিরে গমন করিয়া
তথায় কুণ্ডের জল পান করিলাম । এই কুণ্ডকে উদককুণ্ড বলে ।
উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত আছে—

দৃষ্ট্বা কেদারনাথং মাং পীত্বা রেতোজলং মম ।
প্রজায়তে শিবলিঙ্গং হৃদিতস্ত মহেশ্বরী ॥
জলন্তু পীতমাত্রেন মমতুল্য গণোভবেৎ ।
ব্রহ্ম বিষ্ণুদি লোকেষু পূজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
যস্মিন্ কস্মিন্নপি শিবো কালোইব যত্র কুত্রচিৎ ।
মৃতঃ শিবপুরে যাতি পাপীচাপি শুভসুখা ॥

অর্থাৎ

কেদারনাথ দর্শন পূর্বক আমার তেজোজল যে পান করে
তাহার হৃদয়ে শিবলিঙ্গ উৎপন্ন হয় । ইহার জল পান মাত্রেই সেই
ব্যক্তি আমার (অর্থাৎ শিব) তুল্য হয় এবং ব্রহ্ম ও বিষ্ণুলোক
প্রভৃতিতে পূজনীয় হয় । যে কোন কালে অথবা যে কোন স্থানে
তাহার মৃত্যু হউক না কেন এবং সে পুণ্যবানই হউক আর পাপীই
হউক, নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

আমি পাণ্ডার উপদেশ মত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তিন বার ও বাম হস্ত দ্বারা তিন বার উক্ত উদককুণ্ডের জল পান করতঃ তথা হইতে বহির্গত হইয়া একটা দোকান-গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন পূর্বক রজনী যাপনের সংকল্প করিলাম । কিন্তু দেখিলাম, শীতের অত্যন্ত প্রাবল্য জন্ত অগ্নি ব্যতীত থাকিবার উপায় নাই । কাষ্ঠ অত্যন্ত দুর্শ্মল্য,—এক রাত্রি অগ্নি রক্ষা করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠের মূল্য এক টাকা । খাদ্যদ্রব্যও ভাল পাওয়া যায় না । যে লুচি দেখিলাম, তাহা আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর খাদ্য—তাহার মূল্যও বেশী । লুচি খাটবার উপকরণ একমাত্র চিনির মোণ্ডা । ছানা বা অন্ত কোন গব্য দ্রব্যের সংশ্রব মাত্র নাই । তাহাও এক টাকা সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে । এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাত্রিবাসের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম । পাণ্ডা ঠাকুরকে যথাশক্তি প্রণামী দান দ্বারা সাফল্য গ্রহণান্তর জলযোগ করিয়া কেদারনাথকে প্রণাম করতঃ তথা হইতে রওয়ানা হইলাম । চিরপোষিত মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আজ আমার হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব আনন্দ রসের উদয় হইল তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম । আমি পরমানন্দে গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন ও ভোজন করিয়া রজনী যাপন করিলাম । পরদিবস প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা পরিত্যাগ করতঃ নারায়ণ স্মরণ করিয়া বদরিকাশ্রমে রওয়ানা হইলাম ।

বদরিকাশ্রম ।

বদরী সদৃশং ক্ষেত্রং নৈবেদ্য সদৃশং বস্তু ।
নারদীয় সমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
বদরী দৃষ্টিমাত্রেন স এব ফলমশ্নুতে ।
চাতুৰ্ম্মাস্য বিশেষেন কৈবল্য ফল ভাগিনঃ ॥
যে মূখ্য জড়তাপস্বা দণ্ডকাষায় বাসসঃ ।
বদরী দর্শনাত্তেষাং মূর্ত্তিঃ করতলে স্থিতা ॥
উদ্ধৃত্য স্থাপয়িষ্যামি মূর্ত্তিং লোকহিতেচ্ছয়া ।
যস্য দর্শনমাত্রেন পাতকানি মহান্ত্যপি ।
বিলীয়ন্তে ক্ষণাদেব সিংহ দৃষ্ট্বা মৃগা ইব ॥
সর্ব ধর্ম্মং পরিত্যজ্য বদরীশং হরিং প্রভুং ।
দৃষ্ট্বা তে মূর্ত্তিমায়াস্তি বিনায়াসেন পুত্রকাঃ ॥
ত্যক্ত প্রয়াগি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ ।
বদরীমনু সংপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥
কলিকাল মনুপ্রাপ্তে মূর্ত্তির্যেষাং মনিষিতাঃ ।
দ্রষ্টব্য বদরী তৈস্তু হিহ্না তীর্থান্যশেষতঃ ॥
বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন পরিশ্রমৈঃ ।
একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং সম্বাপ্নুতে ॥

দর্শনাদস্য পাপানি রুদন্ত্যবাহতানিচ ।

মুক্তিমার্গ মিবা লক্ষ্যং তং বন্দে বদরীপতিং ॥

(উত্তরাখণ্ডে)

অর্থাৎ

বদরিকাশ্রম সদৃশ ক্ষেত্র, নৈবেদ্য সমান ধন এবং নারদীয়-শিলা সমান তীর্থ কোন কালে হয় নাই—ভবিষ্যতেও হইবে না । বদরিকাশ্রম দর্শন মাত্রেই বহুবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ চাতুর্মাস্য ব্রত ধারণে কৈবল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । জড়তা জন্য যে মুর্থ ভঙামি করিয়াও দণ্ড ও কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, বদরিকাশ্রম আইসা মাত্রেই ঐ পাবণ্ডেরও মুক্তি করতলগত হয় । নারায়ণ বলিয়াছেন, “লোকহিতেচ্ছায় আমি বদরিকাশ্রমে বদরিনারায়ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হইব, আমার দর্শন মাত্রেই সিংহ দর্শনে মৃগকুলের ন্যায় জীবের মহাপাপ সকলও পলায়ন করিবে । সমস্ত ধর্ম পরিহার পূর্বক যে বদরিনারায়ণ দর্শন করে সে বিনা পরিশ্রমে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় । কলিকালক্লেশে শ্রীহরি সমস্ত তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বদরিকাশ্রমেই প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন । কলিকালে যে সকল ব্যক্তি মুক্তি অন্বেষণ করেন তাঁহারা অন্য তীর্থ পরিত্যাগ পূর্বক সেই সাক্ষাৎ বদরীশ হরিকে দর্শন করিবেন । যিনি বদরিনারায়ণ দর্শন করেন তাঁহার বিনা যোগ জ্ঞানে, এবং তীর্থ পর্য্যাটন পরিশ্রম ব্যতীত এক জন্মেই কৈবল্য লাভ হয় ।” যে বদরিনারায়ণ দর্শন মাত্রেই পাপসকল বিনাশ-

বদরিকাশ্রম।

ভয়ে ভীত হইয়া নিরন্তর রোদন করতঃ পলায়নের পথ দর্শন করিতে থাকে, সেই সর্বমঙ্গলনিধান পরমাত্মারূপী মুক্তিপথ স্বরূপ বদরিপতিকে বন্দনা করি।

কেদারধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনর্বার লালা-চটী পর্যন্ত চব্বিশ মাইল পথ আসিলে বদরিকাশ্রমের রাস্তা পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে এক দিবসে উখিমঠে পৌঁছা যায়। কেদারনাথের পথ বন্ধ হইলে কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই উখিমঠেই কেদারনাথের পূজাদি হইয়া থাকে। কার্তিক মাস হইতে এখানে অত্যন্ত তুষারপাত হইতে থাকে। কেদারধাম বরফে আবৃত হওয়ায় তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। সুতরাং লোকের গমনাগমনও বন্ধ হইয়া যায়। তৎকালে এই মঠে বাবার পূজা ও ভোগ যথারীতি হইতে থাকে। এইখানে প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ মন্দির আছে। তন্মধ্যে অন্যান্য অনেক দেবতার মূর্তি স্থাপিত আছে। ঐ সকল মূর্তিরও যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। উখিমঠ কেদারনাথের অন্যতম একটি ধাম মাত্র। মঠের চতুর্দিক পাহাশালা দ্বারা বেষ্টিত। যাত্রিগণ উক্ত পাহাশালায় অবস্থিতি করেন। পাহাশালায় সদাব্রতের সিধা বন্টন হইয়া থাকে। তথাতে সামান্য একটি বাজার আছে—সে স্থানেও থাকা যাইতে পারে। এখানে থানা, পোষ্টাফিস এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথ বার মাইল। পথের দুর্গমতা প্রযুক্ত যাইতে দুই দিন লাগে।

তুঙ্গনাথ শিব দর্শনে যাইতে হইলে ৬ মাইল উচ্চ পর্বতে

তীর্থ-কাহিনী ।

উঠিতে হয় । পর্বতের শীর্ষদেশে ছোট মন্দির মধ্যে তুঙ্গনাথ শিব-
লিঙ্গ দর্শন করিয়া তথা হইতে অপর রাস্তায় অবতরণ করিতে হয় ।
আরোহণের পথ অপেক্ষা অবতরণের পথ আরও দুর্গম । তুঙ্গনাথ
ধামে চটী নাই বা খাদ্যাদি পাইবার উপায় নাই, সুতরাং দর্শন
করতঃ তৎকালেই আবার তিন মাইল নিয়ে নামিয়া ভীমগোড়া নামক
চটীতে আসিয়া থাকিতে হয় । দুর্গম স্থান বলিয়া অনেকের ভাগ্যে
ইহা দর্শন ঘটে না । ভীমগোড়া হইতে ছয় মাইল ব্যবধানে
গোপেশ্বর চটী । এইখানে গোপেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে
হয় । অনেকেই ইহার বিষয় জানেন না, সুতরাং দর্শনও ঘটে না ।
তথা হইতে লালসাং ছয় মাইল । ইহা একটা প্রধান চটী, এখানে
বহু দোকানদার আছে । এই স্থান হইতে একটা রাস্তা গঙ্গা পার
হইয়া কাঠগুদামের দিকে গিয়াছে । বদরিকাশ্রম হইতে পুনরায় এই
স্থানে আসিতে হয়, একারণ অনেক যাত্রীই স্থায়ী স্থায় দ্রব্যাদি এই
স্থানে দোকানদারের নিকট রাখিয়া যায় ।

সে যাহা হউক, আমি সমভিব্যাহারি যাত্রীগণের সহিত
তথায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে রওয়ানা হইলাম ।
ক্রমে তিন দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় যশীমঠে উপনীত হইলাম ।

যশীমঠ একটা প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান । শঙ্করাচার্য্য কৃত মঠচতুর্থাংশ
মধ্যে ইহা অন্যতম । কেশবনাথ যেমন উখিমঠ—বদরিনারায়ণের
তেমনি যশীমঠ । কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তুষার প্রভাবে
বদরিনারায়ণের পথ বন্ধ হইলে তখন এই মঠে বদরিনারায়ণের
যথারীতি পূজাদি হইয়া থাকে । শাস্ত্রে কথিত আছে :—

বদরিকাশ্রম ।

ততঃ ক্রোশদ্বয়ং পূণ্যং জ্যোতির্ধামং শুভপ্রদং ।
নৃসিংহরূপী ভগবান যত্রান্তে মুক্তিদায়কঃ ॥

অর্থাৎ

সে স্থান হইতে দুই ক্রোশ মধ্যে পরম শুভদায়ক জ্যোতির্ধাম (যশীমঠ) বিদ্যমান আছে । তাহাতে মুক্তিদাতা ভগবান নৃসিংহরূপী নারায়ণ বিরাজিত আছেন ।

এই স্থানে উপনীত হইয়া উক্ত নৃসিংহজি ও জগৎজননী দুর্গা দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করতঃ এক মুদীর দোকানে যাইয়া রজনী যাপন করিলাম । যশীমঠ স্থানটী মন্দ নহে ; এখানে অনেকগুলি দোকান এবং খানা ও পোষ্টাফিস আছে ।

পরদিবস প্রাতে তথা হইতে নিয়ে দুই মাইল যাইয়া বিষ্ণু-প্রয়াগে স্নান ও তর্পণ করিলাম । এই স্থানে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দার সহ সঙ্গতা হইয়াছেন । এই সঙ্গমস্থলে স্নান তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় । বিষ্ণুপ্রয়াগে দর্শনীয় কিছুই নাই । বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে পাণ্ডুকেশ্বর নর মাইল । কথিত আছে, মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন স্বর্গ হইতে এই মূর্তি আনয়ন করতঃ এই স্থানে স্থাপন করেন । এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজাতে অশেষ ফল লাভ হয় । যাত্রিগণ ইহাকে দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন । এই স্থানে চটা আছে । আমরা মধ্যাহ্নকালে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া মাধ্যাহ্নিক কার্য শেষ করিয়া রওয়ানা হইলাম এবং চারি মাইল পথ গমন করতঃ হুমান-চটা প্রাপ্ত হইলাম । তখনও কিঞ্চিৎ বেলা ছিল

তীর্থ-কাহিনী ।

দেখিয়া, যাইব কি থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম । এমত সময়ে একজন নেপালীকে যাইতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে আমরাও চলিলাম । এই স্থান হইতে চারি মাইল পথ গমন করিলে পর বদরিনারায়ণের মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল ।

বদরিকাশ্রমের এক মাইল পথ বরফে আচ্ছন্ন থাকায় অতি কষ্টে যাইতে হইল । সন্ধ্যা অতীত হইতে হইতেই সেখানে পৌঁছিয়া পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলাম ।

এই ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোরম । চতুর্দিক্ বরফে আবৃত, যেন ধবল পর্বত । পর্বতের পাদদেশে দ্রব রজতাকারে অলকানন্দা-গঙ্গা সবেগে প্রবাহিতা হইতেছে । তন্মীয়েই বদরিনারায়ণের প্রস্তর-নির্মিত মন্দির । মন্দির-সন্নিকটেই বাজার,—পশুদ্রব্য দ্বারা দোকান-সকল সজ্জিত । স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত । মন্দির মধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নিবিড় কুম্ভ বর্ণের প্রস্তরে নির্মিত চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি । বিগ্রহের আপাদমস্তক মণি মুক্তা হীরকাদি বহুমূল্য আভরণে জড়িত হইয়া অত্যাঙ্গুল স্নিগ্ধ শ্রামজ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে । এ জগতে বহুতর বিগ্রহের মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এ মূর্তির তুলনা নাই । দর্শন করিলে বাস্তবিকই এক অনির্বচনীয় আনন্দোদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয় বিভোর হইয়া যায় এবং নয়নে পুলকাক্রম বিগলিত হইতে থাকে । আমার এখনও যখন মনে হয়, তখনই ইচ্ছা হয় যে আর একবার শ্রামসুন্দররূপ প্রাণ ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আসি । পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও দর্শন-পিপাসা

বদরিকাশ্রম ।

মিটে না । যে মুহূর্ত্তে ভগবানের ঐ রূপ নয়নপথে পতিত হইল ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই পথশ্রমের যত কষ্ট, যত বিপদ সব যেন কোথায় চলিয়া গেল ; ফলতঃ এমন বিশ্বজনন নয়নরঞ্জন পাপতাপ-নাশক নারায়ণ মূর্ত্তি বিশ্বে আর নাই । মনে মনে ভাবিলাম, “অদ্য মে সফলং জন্মং জীবিতঞ্চ সুজীবিতং সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপং আননং পশুনিজ চক্ষুযা” ।

আমরা মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বাসায় আসিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহের দ্বার রোধ করতঃ অগ্নি জালিয়া তৎসেবা করিতে লাগিলাম । ক্ষণকাল পরে পাণ্ডাঠাকুর মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন । শাস্ত্রে কথিত আছে—

যদস্মৎ ভগবানন্তি ঋষিভিন্দারদাদিভিঃ ।

তৎ সত্ব শুদ্ধিং বাঞ্ছন্তিভোক্তব্যমবিচারিতং ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুৰ্ব্বাসনা গমং ।

নৈবেদ্যং ভক্ষণাদ্বিষেণ বদর্য্যাং যাতি সংক্ষয়ং ॥

অর্থাৎ

যে অন্নে ভগবানের ভোগ হয়, নারদাদি ঋষিগণ পাপ বিনাশন জন্তু যে প্রসাদার ভোজনে সতত বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, সেই প্রসাদার প্রাপ্তি মাত্রেই বিচার না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুৰ্ব্বাসনা গমনজনিত সমস্ত পাতক বদরিকাশ্রমস্থ বিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণে বিনাশ পায় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

আমরা তখন পাণ্ডা প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া রজনী যাপন করিলাম । রজনী প্রভাতে দরজা খুলিয়া দেখি, তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে ; এবং পথঘাট গৃহ সমস্তই তুষার দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে । ঘরের বাহির হওয়া অতি দুষ্কর । প্রবল তুষারপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় শীতে কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল । অতি কষ্টে ছত্র ধারণ করতঃ কন্মল দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া চন্দ্রপাটুকা পায় দিয়া গৃহের বাহিরে বাইয়া শৌচাদি নির্বাহ করিলাম । এবং বাজার হইতে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া গৃহে আসিলাম । পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎসন্নিধানে বসিয়া অগ্নিসেবন করিতে লাগিলাম । দশটার সময় তুষারপতন কিঞ্চিৎ কম দেখিয়া স্নানার্থ তপ্তকুণ্ডে উপনীত হইলাম । অধিকদূর বাইতে হইল না, মন্দির-সমীপবর্তী অদূরে একটি কুণ্ড আছে ; ঐ কুণ্ডকে বহুকুণ্ড বা তপত্ কুণ্ড বলে । এই কুণ্ডেই ভগবান্ নরনারায়ণ ঋষি নিমজ্জিত হইয়া তপস্বী করিয়াছিলেন । কুণ্ডস্থ জল সুখোষ্ণ, ইহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে অনুমান আট হাত হইবে এবং প্রায় তিন হস্ত পরিমিত গভীর । কুণ্ডের উপরিভাগ প্রস্তরনির্মিত ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত । ঐ ছাদ করেকটা স্তম্ভ দ্বারা ধৃত হইয়াছে । এই কুণ্ডে বিধিপূর্বক স্নান তর্পণে সমস্ত পাপ দগ্ধ হয় । প্রবল শীতের মধ্যে ঐরূপ সুখোষ্ণ জলবিশিষ্ট কুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অতি সুখেই স্নান ও তর্পণ করিলাম । তদনন্তর তথা হইতে প্রসাদায় খরিদ করিয়া লইয়া পিণ্ডদানার্থ ব্রহ্ম কপালে গমন করিলাম । অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অলকানন্দার

বদরিকাশ্রম ।

তীরস্থ কতকটা স্থানের নাম ব্রহ্ম কপাল । উত্তরাধাও বর্ণিত আছে :—

পিণ্ডান্নিধায় বিধিবন্নরকাত্তারয়ে পিতৃণ ।

পিতৃতীর্থমিদং প্রোক্তং গয়াতোহষ্ট গুণাধিকং ।

অর্থঃ

বিধিপূর্বক পিণ্ডদানে পিতৃগণের উদ্ধার হয় । ইহা পিতৃতীর্থ নামে খ্যাত, গয়াক্ষেত্র হইতে অষ্টগুণ অধিক ফল পাওয়া যায় ।

আমি উক্ত প্রসাদায় দ্বারা পিতৃলোকের পিণ্ডদানান্তর পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলাম । উক্ত পুরোহিত তথাতেই উপস্থিত থাকেন । একটি টাকা দক্ষিণা দিলেই তিনি মন্ত্র বলিয়া পিণ্ড দেওয়ান । পিণ্ডদান হইলেই এ স্থানের কার্য শেষ হইল । এতদ্ব্যতীত এ স্থানের অন্য কার্য বা দর্শনীয় কিছু নাই । তৎপর একরাত্রি, ত্রিরাত্রি বা সপ্তরাত্রি, যাহার যেমন ইচ্ছা বাস করিয়া থাকেন । আমরা কার্যান্তে বাসায় আসিলাম ।

এই স্থানে যাত্রী রাখিবার জন্য পাণ্ডাদের স্বতন্ত্র গৃহ আছে, তাহাতেই থাকিতে হয় । খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে খরিদ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু বড়ই দুর্শূল্য । রাত্রিতে শয়নগৃহে অগ্নি রক্ষার জন্য সকালবেলা কাঠ খরিদ করিয়া রাখিতে হয় ।

আমরা পিণ্ডদানাদি কার্য শেষ করিয়া বাজার হইতে কিছু জলখাবার লইয়া ভাড়াভাড়া বাসায় আসিলাম । বরফপতন আবার

তীর্থ-কাহিনী ।

বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্নি জালিয়া অগ্নি-সেবা ও জলসেবা উভয়ই নির্বাহ করিলাম । ক্রমেই বরফ পতন বৃদ্ধি হইয়া পথঘাট আবৃত করিয়া লোকজনের গতিবিধি বন্ধ করিল । আমি জীবনে বরফপতন কখন দেখি নাই, এজন্ত আমার বড়ই কৌতুহল হওয়ায় পুনঃ পুনঃ দারোদ্যাটন পূর্বক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় লোক বিপদাশঙ্কায় একান্ত চিন্তিত হইল । সমস্ত দিবারাত্রি সমভাবেই তুষারপাত হইল ।* পরদিবস নারায়ণের ইচ্ছায় তুষারপাত বন্ধ হইল । ক্রমে ক্রমে দিক্‌সকল পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যদেব গগনে দেখা দিলেন । ধীরে ধীরে বরফরাশি গলিয়া পথ পরিষ্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের গতিবিধিও আবার আরম্ভ হইল ।

তৎপর দিবস আমাদের ত্রিরাত্রিবাস অন্ত হওয়ায় সাফল্যদানার্থ পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সাফল্যদান কল্পদেশে এই পাণ্ডারা যাত্রীগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন মাত্র । নতুবা ইহাদের দ্বারা অন্য কোনই কার্য্য হয় না । দেবপ্রয়াগে পিণ্ডদানাদি যে সকল কার্য্য তাহা অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্বাহিত হয়, এবং তাহার দক্ষিণাও সেই ব্রাহ্মণকেই দিতে হয় । খোদ পাণ্ডার এক জন চাকর যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে মাত্র । এ স্থানের যে সকল কার্য্য তাহাও অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা হয়, তাহার দক্ষিণাও তৎকালে সেই ব্রাহ্মণকেই দিতে হয় । কেবল শেষকালে খোদ পাণ্ডা সফল দাতা হইয়া দলবল সহ উপস্থিত হন । তখন ইহারা যাত্রীগণের

বদরিকাশ্রম ।

যথাসর্বস্ব লইতে কুণ্ঠিত বা ভীত হন না । যাত্রিগণ নিরুপায় হইয়া বাহা চাহে তাহাই দিয়া থাকে । এমন কি অনেকের ঘটা বাটী পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন । একরূপ অর্থপিশাচ পাণ্ডা অন্য কোন তীর্থে নাই । পাণ্ডাগণ আমাদের সহিত যে প্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে লাগিল, আমরাও তদনুরূপ ব্যবহারই করিতে লাগিলাম । এহান তিহরির অধিকৃত—ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অধিকৃত নহে ; সুতরাং কোনরূপ শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও আমরা কিছুমাত্র ভীত হইলাম না, বরং তাহাদের প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলাম । যখন আমাদেরকে কিছুতেই নরম করিতে পারিল না তখন কিঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া আসিল দেখিয়া, আমাদের বাহার বাহা ইচ্ছা হইল তাহাই দিয়া সাফল্য গ্রহণপূর্ব্বক তাড়াতাড়ি পাণ্ডার কারাগার হইতে “যঃ পলায়তি স জীবতি”—এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম ।

বদরিকাশ্রম হইতে রওয়ানা হইয়া পুনরায় লালসাং পর্য্যন্ত পয়তাল্লিশ মাইল পথ প্রত্যাবর্তন করতঃ তথা হইতে কাঠ-গুদামের রাস্তায় চলিলাম । লালসাং হইতে আট মাইল দূরে নন্দপ্রয়াগ । কথিত আছে, নন্দ মহারাজ মহৎ ব্রত করায় ইহার নাম নন্দপ্রয়াগ হইয়াছে । অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থলে এই প্রয়াগ । এই সঙ্গমস্থলের উপর বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেব এবং ভগবতী চণ্ডিকাদেবী আছেন । সঙ্গমস্থলে স্নান, তর্পণ এবং শিবপূজা ও চণ্ডিকাদেবী দর্শন করিতে হয় । উত্তরাধাও লিখিত আছে :—

অনাদলকাগঙ্গায়াং দর্শনাদযান্তি পাতকং ।
 কিং পুনঃ সঙ্গমস্থানাং ফলাধিক্যং প্রচক্ষতে ॥
 ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি বায়ুভোজনতো ভবেৎ ।
 যৎফলং স্থানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সঙ্গমে নৃণাং ॥

অর্থঃ

অলকানন্দাগঙ্গায় স্থান ও দর্শনে মহাপাপ বিনষ্ট হয় । যে ব্যক্তি সঙ্গমস্থলে স্থান করে তাহার পুণ্যফলের কথা অধিক আর কি বলিব ? ত্রিশ হাজার বৎসর বায়ু ভোজন করিয়া তপস্তা করিলে যে ফল হয়,—সঙ্গম-স্থান মাত্রেই তাহার তাহা লাভ হয় ।

এই স্থানের কার্য্য অস্ত্রে রওয়ানা হইয়া বার মাইল পথ গমনের পর কর্ণপ্রয়াগ প্রাপ্ত হইলাম । প্রবাদ আছে, মহারাজ কর্ণ এই স্থানে তপস্তা করিতেন । মহারাজের একদা গঙ্গাস্থানের ইচ্ছা হইল ; কিন্তু নিকটে গঙ্গা নাই ; তিনি দুঃখিত চিত্তে উপবিষ্ট আছেন । এমন সময় সহসা এই স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইলেন । তদূষ্টে মহারাজ কর্ণ হৃষ্টচিত্তে স্থান করিলেন । তাহাতেই এ স্থানের নাম কর্ণপ্রয়াগ হইল । এই হইতেই যাত্রিগণের প্রয়াগ-স্থান শেষ হইল । আর নদীও নাই, প্রয়াগও নাই । আমরা কর্ণপ্রয়াগে স্থান তর্পণ করিয়া রওয়ানা হইয়া সায়াংকালে আদি বদ্দিনাথ চর্চাতে উপনীত হইলাম । কর্ণপ্রয়াগ হইতে এই স্থান আট মাইল ব্যবধান ।

দেখিলাম, ছোট একটা মন্দির মধ্যে আদি বদ্দিনাথ দেব

কেদারনাথ ।

আছেন । ইহার পূজা ভোগাদি হইয়া থাকে—এমন কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না ।

সে যাহা হউক, আমরা তথায় একটি পরস্পর প্রণামী দিয়া দর্শন করতঃ মুদীর দোকানে ঘাইয়া বাসা লইলাম । এ স্থানটী যাত্রী থাকিবার উপযুক্ত না হইলেও সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া অগত্যা আমরা গকে তথাতেই থাকিতে হইল । এই হইতে কাঠগুদাম পর্যন্ত আর কোন তীর্থ নাই । এই স্থান হইতে মেলচৌরী কুড়ি মাইল । তথা হইতে কাঠগুদাম উনষাট মাইল । পাঁচ দিবসে পৌছা যায় ।

হরিদ্বার হইতে কেদারধাম পৌছিতে পঁচিশ দিবস লাগে । তথা হইতে বদরিকাশ্রম পৌছিতে দশ দিবস । বদরিকাশ্রম হইতে কাঠগুদাম পৌছিতে পনের দিবস প্রয়োজন । সর্ব সমেত এক মাস কুড়ি দিবসে হরিদ্বার হইতে কাঠগুদামে পৌছা যায় । তথা হইতে রেলপথে দেশে আসিতে হয় ।

এই পথে যাইতে হইলে যাত্রী মাত্রেরই অনূন দেড় শত টাকা সঙ্গে লওয়া উচিত । অর্থান্নতা বশতঃ লেখককে পথিমধ্যে খাদ্যাভাবে প্রাণের ও দেশপ্রত্যাগমনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । দৈবাৎ ভগবৎপ্রেরিত পূর্বপরিচিত ঢাকা জেলা নিবাসী পরোপকারব্রতপরায়ণ পরম যোগী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ জমিদার (এক্ষণে সন্ন্যাসী) মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও তাঁহারই বৃত্তে বিপন্ন হই । তাঁহার এই উপকার চিরস্মরণীয় এবং অপরিশোধনীয় । চিরজীবন আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে

তীর্থ-কাহিনী ।

আবদ্ধ থাকিলাম ।' তিনি যে কেবল অর্থ সাহায্যই করিয়াছিলেন তাহা নহে, অকৃত্রিম সহোদরোপম স্নেহ ও যত্নে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া কাশী পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন । তাঁহার সেরূপ স্নেহ ও যত্ন না পাইলে আমি কখনই দেশে আসিতে পারিতাম না ।

বদরিকাশ্রমের পাণ্ডাগণ দ্বারা যাত্রীগণের কিছুমাত্র অর্থ সাহায্য পাইবার আশা নাই, ইহা যেন পাঠকের স্মরণ থাকে ।



জ্বালামুখী ।

জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত ভৈরবঃ ।

অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী, স্তনং জলকরে মম ॥

ভীষণো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী ।

(পীঠমালা)

জ্বালামুখ্যাস্তুতেজো যঃ নেত্রাভ্যাং পরিপশ্যতি ।

সর্বপাপ বিনিস্মৃত্তো মাতৃগর্ভং ন পশ্যতি ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

অর্থাৎ

বিষ্ণু চক্রে সতী দেহ ছিন্ন হইয়া জিহ্বা যে স্থানে পতিত হয়
ঐ স্থানের নাম জ্বালামুখী । তথায় পীঠাধিষ্ঠাত্রী অম্বিকার নাম—
সিদ্ধিদা দেবী ও ভৈরবের নাম উন্মত্ত । জলকরে স্তন পতিত
হওয়ায় সে স্থানে ভীষণ নামে ভৈরব এবং ত্রিপুরমালিনী নামী
দেবীর উৎপত্তি হয় ।

জ্বালামুখীর তেজ যে নেত্রদ্বারা দর্শন করে তাহার সমস্ত পাতক
বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার আর জন্ম হয় না ।

এই মহাপীঠস্থান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার দশ
কোশ দক্ষিণে হিমালয় পর্বতোপরি অবস্থিত ।

হাওড়া হইতে জলকর স্টেশন ১১৮৩ মাইল রেলভাড়া—এগার
টাকা ছয় আনা । হাওড়া হইতে ই, আই, রেলো আশালা

তীর্থ-কাহিনী ।

ক্যান্টনমেন্ট (Cantonment) এ গাড়ী পরিবর্তন করিয়া জলন্ধর ষ্টেশনে নামিতে হয় । তথা হইতে হুঁসিয়ারপুর চিন্তাপূর্ণা হইয়া জালামুখী পৌঁছিতে হয় । জলন্ধর হইতে জালামুখী ৬৪ মাইল দূরে । সড়ক পথে পদব্রজে বা গোলকটে কিম্বা একা যোগে যাওয়া যায় । ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় ।

আমরা হরিদ্বার হইতে বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া আড়াই টাকা দিয়া জলন্ধরের টিকিট লইয়া পাঞ্জাব পেশেঞ্জারে (Panjab Passenger) রওয়ানা হইলাম । ক্রমে ক্রমে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই সাহারানপুর পৌঁছিলাম । সাহারানপুর একটি জেলা ; হরিদ্বার এই জেলার অন্তর্গত । রেলষ্টেশন অতি সুদৃশ্য এবং জমকাল ; এইখানে গাড়ী প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করে । সন্ধ্যা অতীত হইল, দেখিয়া আরোহিগণ সকলেই এই স্থানে জলযোগ করিয়া লইল । নিরুপিত সময়ে “টুং ল্যাটাং, টুং ল্যাটাং” শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বংশীধ্বনি করতঃ বাম্পীয় রথ সদন্তে ধরনী কম্পিত করিয়া ধাবিত হইল । ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল । নৈশ নিস্তরতা ভঙ্গ পূর্বক অন্ধকারাশি ভেদ করিয়া হুম্ হুম্ শব্দে ধূমোদগীরণ করিতে করিতে গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল । কিছুক্ষণ জাগিয়াছিলাম, পরে গাড়ীর দোলনে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম । অনেকক্ষণ আর কিছুই জানি না । রাত্রি সাড়ে চারিটা কি পাঁচটার সময়ে সহযাত্রীগণের গোলমালে সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল । জাগিয়া

জালামুখী ।

দেখি, জলন্ধর ছাউনী ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে । আমরা ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী জলন্ধর সিটি ষ্টেশনে নামিব ; সুতরাং বেশী বিলম্ব নাই, জোর দশ মিনিট থাকিতে হইবে, কাজেই নিজ নিজ জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিলাম । আবার গাড়ী ছাড়িল । আমাদের পোঁটলা-পুটলী বাঁধা শেষ হইতে হইতেই গাড়ী ষ্টেশনে বাইয়া পৌঁছিল ; অমনি আমরা নামিয়া পড়িলাম । গেটে টিকিট দিয়া মুসাফিরখানায় আসিয়া বসিলাম । তখনও কিছু রাত্রি আছে, ভয়ঙ্কর শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম । চারিদিক্ চাহিয়া দেখি—কিছুই দৃষ্ট হয় না, কেবল অন্ধকার । ষ্টেশনে দুই চারিটা লণ্ঠনস্থিত ল্যাম্প টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে । আমরা কি করি ? যাই কোথায় ? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই বসিয়া বসিয়া কোনরূপে বাকি রাত্রিটুকু কাটাইতে লাগিলাম । ইহার মধ্যে দুই চারিজন গাড়োয়ান আমাদের নিকটে আসিয়া গাড়ী ভাড়া দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল । আমরাও বসিয়া বসিয়া গাড়ীর চিন্তাই করিতেছিলাম । অনেক কথোপকথনের পর তথা হইতে হুঁসিয়ারপুর পর্য্যন্ত দশ ক্রোশ রাস্তার ঘোড়গাড়ীর ভাড়া চারি সোয়ারিতে দেড় টাকা স্থির হইল, কিন্তু তখনও ভোর হয় নাই । গাড়োয়ান বাইবার জন্ত বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিল । আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রভাতের ঘোরে ঘারেই গাড়ীতে চড়িয়া রওয়ানা হইলাম । ক্রমে চারিদিকে আঁধারের ছায়া অপসারিত করিয়া পূর্ব গগন উষার নবীন কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

একে হিমালয় প্রদেশ, তাহাতে মাঘমাস । পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন শীতের কিরূপ প্রাচুর্য । গায়ে তুলাভরা পিরিহান্, পরিধানেও তুলাভরা পাণ্টুলান তারপর সর্বাপ্র বালাপায় ও কম্বল দ্বারা আবৃত । তথাপি শীতে থরথরি কম্পবান্ । কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

“বাঘের গর্জন সম মাঘের হিমালয়” ।

জ্ঞানামুখীযাত্রী ব্যতীত অন্ত্রে কবির এই উক্তির সত্যতা অনুভব করিতে সম্যক্ অসমর্থ ।

সে যাহা হউক, ষ্টেশন হইতে একা যোগে এক মাইল গমন করিয়া পথিপাশ্বে একটা শুষ্ক পুষ্কর্ণী ও তত্বীরে ছোট ছোট মন্দির দুইটা দেখিয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম ইহা একটা পীঠস্থান । পূর্বোল্লিখিত মাতা ত্রিপুরমালিনী দেবী ও ভীষণ ভৈরব ঐ মন্দিরদ্বয়ে বিরাজিত আছেন । এই স্থানেই দেবীর স্তন পতিত হয় । পূর্বে জানা না থাকায় দর্শন ঘটিল না । গাড়ীর উপর হইতেই মনে মনে মাতাকে প্রণাম করিলাম । ভাবিলাম, যদি পৈত্রিক প্রাণ লইয়া মঙ্গলমত ফিরিতে পারি, তখন দর্শন করিয়া যাইব ।

ষ্টেশন হইতে ছাঁসিয়ারপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ । পদব্রজে যাইতে হইলেও কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না । দুই ক্রোশ পথ যাইয়াই বরফ মণ্ডিত অভূম্মত হিমালয় দেখা যাইতে লাগিল । উষার নবীন কিরণে গগনবিস্তৃত প্রকৃতির প্রতিমাখানি আমাদের সম্মুখে সালঙ্কারা হইয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল । সে

জালামুখী ।

দৃশ্য অপূর্ব, সে সৌন্দর্য্য অলৌকিক ; ক্ষুদ্র লেখনীর অগ্রে সে শোভার বর্ণনা হয় না । আমি মনোমুগ্ধকারিণী প্রকৃতিদেবীর অতুলনীয় শোভা হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া বাইতে লাগিলাম । এই হিমালয়ের সান্নিদেশেই জালামুখী তীর্থ ।

পশ্চিমধ্যে ঘোড়ার বিশ্রাম জন্য দুইটী আড্ডা আছে । গাড়োয়ান ঐ সকল স্থানে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়া প্রায় ১২টার সময় হুঁসিয়ার-পুর পৌঁছিল । আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম ।

হুঁসিয়ারপুর একটি জেলা ; প্রকাণ্ড সহর । যাত্রী অবস্থিতির জন্য ধর্ম্মশালা এবং পান্থনিবাস (সরাইখানা) উভয়ই আছে । তীর্থযাত্রী মাত্রেই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়া থাকে । ধর্ম্মশালাটি সহরের উত্তর প্রান্তে, বাজারের পাশ্বে প্রস্তুত পথ দিয়া ধর্ম্মশালায় বাইতে হয় । ধর্ম্মশালাটি নিতান্ত ছোট নহে । উপরতলায় যাত্রী নিবাস, নিম্নতলে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির বিশ্রামস্থান—অপরিস্কৃত । প্রাঙ্গণের একপাশ্বে সুবৃহৎ ইন্দারা । যাত্রীগণ এই ইন্দারার জলেই স্নান পানাদি কার্য্য শেষ করিয়া থাকেন । ধর্ম্মশালার নিকটেই বাজার ; আহাৰ্য্য সকল রকম দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় । নানাবিধ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য এই স্থানে প্রস্তুত হয় ।

সে বাহা হউক, আমরা এই স্থানে পৌঁছিলে মুন্সীরাম নামক এক ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন । জালামুখী যাইবার পথে দশমহাবিদ্যার মধ্যে ষষ্ঠ মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা

তীর্থ-কাহিনী ।

(চিন্তাপূর্ণা) দেবীদর্শন করিয়া যাইতে হয় । এই ব্রাহ্মণযুবক তথাকার পাণ্ডা । ইনি হুঁসিয়ারপুর সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় থাকিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন । বয়ঃক্রম কুড়ি কি বাইশ বৎসর—সৎস্বভাব ও সম্পন্ন, অন্তর্দিকে নম্রতা ও ভদ্রতা বেশ আছে । আমরা যে দুইদিন তথায় ছিলাম অবসর মত মুন্সীরাম ষথাসাধ্য আমাদের যত্ন করিয়াছিলেন এবং শীতে অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া শীত নিবারণের বিছানাতির সাহায্যও করিয়াছিলেন । যখন যে অভাব উপস্থিত হইত তিনি তাহা পূরণ করিতে ষথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং সঙ্গে লইয়া সহর ভ্রমণ করিয়া দেখাইতেন ; ফলতঃ যে দুই দিন সেখানে ছিলাম মুন্সীরামের যত্নে পরম সুখেই ছিলাম । পরে জালামুখী যাইবার জন্য গো-গাড়ী স্থির করিয়া নিজের সহোদরকে আমাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন । হুঁসিয়ারপুর হইতে জালামুখী যাতায়াতের গাড়ীভাড়া পোনের টাকা বন্দোবস্ত হইয়াছিল । হুঁসিয়ারপুর হইতে চিন্তাপূর্ণা ৩৬ মাইল । মধ্যে মধ্যে চটা ও ধর্মশালা আছে, খাদ্যাদি ভাল পাওয়া যায় না । আমরা সমস্ত দ্রব্যাদি গাড়ীতে দিয়া পদব্রজেই রওনা হইলাম । আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ যাত্রী কেবল গাড়ীতে উঠিলেন । হুঁসিয়ারপুর হইতে ১০ মাইল গমনের পরেই পর্বতারোহণ করিতে হয় । পার্ব-তীয় পথ শুনিলেই দুর্গম পথ বলিয়া স্বতঃই মনে ধারণা হয় । কিন্তু এ পথ সেরূপ নহে । পথ ভাল, পথিকগণের কোন কষ্টের কারণ হয় না । আমরা তদ্রূপ তরুলতা, গুল্ম বিরাজিত পার্বতীয় শোভা দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত গমন করিতে লাগিলাম । যখন

জালামুখী ।

পথশ্রমে ক্লান্তি বোধ হইত তখন পথিপাশে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম । মধ্যাহ্নকালে চটীতে যাইয়া আহারাদি করিতাম । এইরূপে দুই দিবস পর সায়ংকালে চিন্তাপূর্ণী পৌছিলাম ।

ছিন্নমস্তাদেবীকেই ঐ প্রদেশে চিন্তাপূর্ণী নামে অভিহিত করে, তাই মায়ের নামে এস্থানেরও নাম চিন্তাপূর্ণী । স্থানটি পর্বতের উপর । বর্তমান সময়ে কয়েকখানি দোকান গৃহ ভিন্ন স্থানীয় লোকের বসতি নাই । চার পাঁচ ঘর দোকানদার ভিন্ন অপর সকল দোকান বন্ধ । শ্রাবণের শুক্লাষ্টমীতে একটি মেলা হয় ; তৎকালে এই সকল দোকান খোলা হয়, এবং বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । সাত আট দিবস মেলা থাকে, তারপর মেলাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই দোকানপাট উঠিয়া যায় । কেবল মায়ের পূজারি ও দুই চারিজন পাণ্ডা এবং দু চারিটি দোকান স্থায়ীরূপে থাকিয়া যায় । আমরা এই স্থানে পৌছিয়া মুন্সীরাম পাণ্ডার নির্দিষ্ট বাসায় ছিলাম ।

এই স্থানের কার্য্য কেবল মাকে দর্শন, পূজা ও ভোগ দেওয়া । এই কার্য্য যাত্রীগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই সম্পন্ন হয় । আমরা বাসায় জিনিষপত্র রাখিয়া পাণ্ডার সহিত মায়ের দর্শনার্থ চলিলাম । আমাদের বাসার অনতিদূরেই অশ্বখ বৃক্ষেতলে ছোট মন্দির মধ্যে পীঠাধিষ্ঠাত্রী ছিন্নমস্তাদেবী পুষ্পমালাদিতে বিভূষিতা হইয়া বিরাজিতা আছেন । পাণ্ডাদের নিকট শুনিলাম জালামুখীতে মায়ের যেরূপ দিবা রাত্রিতে পাঁচবার পূজা ও ভোগ হয়, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে ; কিন্তু আমরা তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না । স্থানীয় লোকের বসতি নাই ; আছে কেবল কয়েক ঘর

তীর্থ-কাহিনী ।

দরিদ্র লোকানদার ও হীনাবস্থাপন্ন পাণ্ডা । বার মাস প্রতি রোজ তেমন যাত্রীরও সমাগম নাই, সুতরাং ঐ প্রকার পূজা ও ভোগ সম্পন্ন হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল । পাণ্ডাগণ যাত্রীগণের নিকট এইরূপ না বলিলে কিছু পায় না, বোধ হয় সেই জন্যই একটু বাজার গরম করিয়া থাকে । আমরা তথায় একদিন ছিলাম । পূজা ও ভোগের জন্য কিছু দিয়া প্রসাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলাম । দ্বিপ্রহর গত হইল, কিন্তু মায়ের পূজা বা ভোগের কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না । অগত্যা বাজার হইতে কিছু খাদ্য লইয়া বাসায়ে আসিয়া মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম । ভাবিলাম, সন্ধ্যার সময় বুঝি বৈকালী প্রসাদ मिलিবে । আবার আশাবিহীন হইলাম ; সন্ধ্যাকালে পাণ্ডা-ঠাকুর যৎকিঞ্চিৎ মিষ্ট প্রসাদ আনিয়া দিলেন, তাহা ভুক্তিপূর্বক সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম । ভাবিলাম, মা ছিন্নমস্তা, সুতরাং শ্রবণ-হীনা ; কাজেই দিনে দীন সন্তানগণের কাতর প্রার্থনা কানে তুলেন নাই, নতুবা মায়ের কাছে আসিয়া সন্তান কি জঠরযন্ত্রণা পায় ?

এখানে দর্শনীয় আর কিছু নাই, সুতরাং রাত্রেই পাণ্ডাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণাম দিয়া বিদায় হইয়া থাকিলাম । পরদিবস প্রাতে দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জালামুখী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম । জালামুখীর পাণ্ডা পান্নালাল ঠাকুরের একজন গোমস্তা এইখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাহার অনুগমন করিলাম ।

জালামুখী ।

চিন্তাপূর্ণা হইতে ব্যাসনদী পর্য্যন্ত দুটি পথ আছে । একটা গাড়ী চলিবার যোগ্য বাঁকাপথ । অপরটি মনুষ্য চলার যোগ্য সংকীর্ণ অথচ সোজাপথ । এই উভয় পথ মিলিত হইয়া ব্যাসনদী পার হইয়া পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া জালামুখী পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে । গাড়ীর পথে জালামুখী দশ ক্রোশ এবং পদব্রজে সোজাপথে সাত ক্রোশ চলিতে হয় । আমরা গোমস্তা পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া সোজাপথে পদব্রজেই রওয়ানা হইলাম । সহযাত্রী বৃদ্ধী গাড়ীযোগে সড়ক পথে গমন করিলেন ।

চিন্তাপূর্ণা মারের পর্বত হইতে সটান দেড় মাইল নীচে নামিয়া একেবারে উপত্যকাভূমির উপর আসিলাম ; উভয় পাশেই পর্বত-প্রাকার । আমরা সমতল শিলাখণ্ডের উপর দিয়া চলিলাম, যেন শিলাময় নদীর মধ্য দিয়া বাইতেছি । এইরূপে সাড়ে চারি ক্রোশ পথ গমন করিয়া ব্যাসগঙ্গা প্রাপ্ত হইলাম । এই পশ্চিমধ্যে তিনটি চটী আছে, নিরাশ্রয় ক্লান্ত পথিকগণ এই সকল স্থানে বিশ্রামার্থ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু আহার্য্য বস্তু ভাল পাওয়া যায় না । ক্রমে ব্যাসগঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলাম । ব্যাসগঙ্গা প্রথর স্রোতোশালিনী প্রশস্ত পার্শ্বতীয় নদী । পারাপার জন্য অস্থায়ীভাবে নৌ-সেতু নির্মিত আছে । গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি সমস্তই পারি হইতে পারে । উভয় তীরেই বাজার আছে । দক্ষিণ তীরস্থ বাজারটি অপেক্ষা উত্তর তীরের বাজারটি কিছু বড় । খাদ্যাদি সাধারণতঃ সমস্তই পাওয়া যায় । আমরা ঘাটৌয়ালকে এক একটি পরমা দিয়া সেতু পার হইয়া বাজারে যাইয়া বসিলাম । তখন বেলা প্রায় ৯টা ; আহারের

তীর্থ-কাহিনী ।

সময় না হইলেও স্নানের সময় হইয়াছে । শ্রুত হইলাম, এই স্থান হইতে জালামুখী প্রায় তিন ক্রোশ ; বেলা বারটার মধ্যেই যাওয়া যাইতে পারে । সুতরাং স্নানাহারের চেষ্টা না করিয়া রওয়ানা হইলাম । বন্ধুর পার্বতীয় পথসকল অতিক্রম করিয়া বারটার মধ্যে আমাদের পৌঁছিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল ।

প্রথর আতপতাপে তাপিত, পথশ্রমে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া প্রসিদ্ধ পুণ্যপীঠে পৌঁছিয়া পান্নালাল পাণ্ডার আলয়ে আশ্রয় লইলাম । পাণ্ডাঠাকুর আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নিজ বাটীতেই বাসস্থান দিয়া অগ্ন্যন্ত বন্দোবস্ত কর্তৃক চাকর নিযুক্ত করিয়া দিলেন । আমাদের যখন যাহা আবশ্যক হইত, চাকরকে বলিয়াই তাহা পাইতাম ।

এই স্থানের প্রধান কার্য্য দর্শন, পূজা, হোম, ভোগ এবং দান । যাহার যেমন শক্তি তিনি সেইরূপে উক্ত কার্য্যসকল করিতে পারেন ।

মায়ের পূজা ও ভোগ দিবারাত্রি মধ্যে পাঁচবার হইয়া থাকে । প্রত্যেকবার ভোগের বরাদ্দ পাঁচ টাকা পাঁচ পয়সা । যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে একবার কিম্বা একদিনের অথবা ততোধিক দিনের ভোগ দিতে পারেন ।

আমরা স্নানান্তে পাণ্ডাঠাকুরের সহিত মায়ের দর্শনার্থ চলিলাম । বাজারের মধ্যবর্তী উভয় পার্শ্বস্থ সজ্জিত বিপনী ও সৌধাবলীর মধ্য পথ দিয়া কিছু দূর যাইয়াই পুরী প্রাপ্ত হইলাম । পুরীর দ্বারদেশ দিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে প্রস্তরনির্মিত

জালামুখী ।

মন্দির । ছাদের উপরিভাগ হইতে ধ্বজকলস পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত । দূর হইতে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল । মন্দিরের দ্বার রজত-মণ্ডিত কারুকার্য্যখচিত । রাজা রণজিৎ সিংহ কর্তৃক ইহা স্বর্ণ রজতাদি দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে । অঙ্গনটী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান । ভোগ-মন্দির ও অন্যান্য মন্দির এই প্রাঙ্গণের একপাশে । ভোগমন্দিরের সম্মুখে মায়ের মন্দিরের দক্ষিণভাগে একটা ছোট চৌবাচ্চা । উপরি-স্থিত পর্ব্বত হইতে নিঝর বারি প্রণালীপথে আসিয়া সতত এই চৌবাচ্চা পূর্ণ করিতেছে । অতিরিক্ত জল উচ্ছলিত হইয়া নিম্নদিকে পড়িয়া ষাইতেছে । এই চৌবাচ্চার জল দ্বারাই দেবীর ও স্থানীয় লোকের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয় । দেবীর তোরণস্থিত নহবতের রসনচৌকীর বাদ্যে পুরী সতত আমোদিত থাকে । দেবীর পূজা, ভোগ প্রভৃতি কার্য্য করিবার জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত আছে । এই সকল ব্যয় যাত্রীগণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । দিবাভাগে যে সব ভোগ হয় সেই সমুদয় প্রসাদ উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি প্রভৃতি লোকদিগকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরিচারক ও পাণ্ডাগণ পাইয়া থাকেন । প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । শ্রীরামনবমীতে একটা মেলা বসে ; তখন বহু লোকের সমাগমে স্থানটী জনাকীর্ণ হয়, দেবীর পূজাদিরও ধূমাধূমের পরিসীমা থাকে না ।

আমরা মন্দিরের দ্বার দিয়া অভ্যস্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখারূপিণী জালামুখী দেবীকে দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত হইলাম । এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কোথাও দেখি নাই ।

তীর্থ-কাহিনী ।

মন্দির মধ্যস্থলে দুই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ এবং তিন হস্ত পরি-
মিত গভীর একটি কুণ্ড । এই কুণ্ডের বায়ুকোণ ও মধ্যস্থল হইতে
সতত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে । কুণ্ডের পশ্চিমভাগ
হইতেও সময় সময় অগ্নিশিখা নির্গত হয় । কুণ্ডের পশ্চাতে মন্দি-
রের ভিত্তির মধ্যস্থলে একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে । এই
শিখার উপরে প্রস্তরনির্মিত চৌদলের ঞ্চায় ছোট একটি মন্দির
ভিত্তি-গাত্রসংলগ্ন করিয়া নির্মিত হইয়াছে । উক্ত ভিত্তির বায়ু-
কোণে আরও একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে । এই পাঁচ
স্থানেই পূজা ভোগ হইয়া থাকে । প্রধানতঃ কুণ্ডস্থ অগ্নিতেই
পূজা হোম করিয়া পরে অন্ত্যান্ত স্থানে পূজা করিতে হয় । আমরা
প্রদীপ্ত লোলজিহ্বারূপিণী জগত্তারিণী জগদারাধ্যা দেবীকে দর্শন
করতঃ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম । এবং ভক্তিভারাবনত চিত্তে
সাষ্টাঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মনে মনে স্তবজ্বতি করিয়া বাসায়
আসিলাম । পথশ্রমে শরীর যেমন ক্লান্ত, মধ্যাহ্নকাল গত
হওয়ায় জঠরজ্বালাতেও তেমনি উত্তাক্ত ; সুতরাং সেদিন দর্শন
ভিন্ন আমাদের অন্ত কিছুই হইল না । বাজার হইতে লুচি মিঠাই
বাসায় আনিয়া মায়ের নামে নিবেদন করতঃ জঠরানলে আহুতি
প্রদান করিতে লাগিলাম । ইত্যবসরে বানরগণ অতি সন্তর্পণে
আসিয়া উকি বুকি মারিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া তাহাদেরও প্রসাদে
বঞ্চিত করিলাম না । এখানে বানরগণের অসীম উৎপাত ।

পরদিবস সকালট পাণ্ডাঠাকুরের গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া
বাজার হইতে পূজোপকরণসকল খরিদ করিয়া আনিলাম ।

জালামুখী ।

জিনিষের দর-দাম বড় বেশী বোধ হইল না । আমরা স্নান করিয়া পূজোপকরণসহ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে পূজার্থ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । তথাকার নিয়মানুসারে পূজা ও হোম শেষ করতঃ ভোগ-মন্দিরের বারেন্দায় আসিয়া বসিলাম । এই স্থানে মায়ের ভোগের জন্ত শক্ত্যানুসারে প্রত্যেক যাত্রীকেই কিছু কিছু অর্থ জমা দিতে হয় । তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । পাণ্ডা এবং মায়ের কৰ্ম্মচারি-গণ সকলেই ভোগের অর্থ কিছু বেশী জমা দিবার জন্ত যাত্রীগণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ ও অনুরোধ করিয়া থাকেন ; তবে অভ্য্রোচিত কোন ব্যবহার করেন না । অনেক কথোপকথনের পর আমরা যে বাছা দিলাম পাণ্ডাগণ তাহাই সন্তোষের সহিত লইয়া মায়ের তহবিলে জমা দিলেন । তখনও ভোগ নির্বাহ হয় নাই । প্রসাদ প্রাপ্তির বিলম্ব থাকায় সেই অবসরে আমরা মায়ের ভৈরব 'উন্মত্ত ভৈরব' নামক শিব দর্শনে চলিলাম । মায়ের মন্দিরের পার্শ্বে কিঞ্চিদূর্কে অলোকনাথের মন্দিরমধ্যে একটি জলপূর্ণ গহ্বর । সেই জলে অগ্নিসংযোগ মাত্রই দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে ; ইহা দেখিয়া তথা হইতে সোপানাবলী দ্বারা উর্কে উঠিয়া নাগার্জুন নামে একটি মূর্তি দর্শন করিলাম । তথা হইতে পয়ঃপ্রণালী অনুসরণ করিয়া আরও উর্কে যাইয়া বাবা উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির প্রাপ্ত হইলাম । অশ্বখ বৃক্ষতলে একটি ছোট মন্দিরমধ্যে উন্মত্ত ভৈরব শিবলিঙ্গ বিরাজিত । বাবাকে দর্শন, পূজা ও স্পর্শন করতঃ তদুর্কে অদূরেই অম্বিকেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া মায়ের বাটিতে আসিলাম । তথায় মায়ের প্রসাদ পাইয়া পরমা-

তীর্থ-কাহিনী ।

নন্দ মনে বাসায় আসিলাম । ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে স্থান দর্শনার্থ বাসা হইতে বহির্গত হইলাম ।

জালামুখীতে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকের বসতিই অধিক । অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে । পর্বতের ঢালু স্থানের উপর বসতি । স্থানীয় কোন নদী না থাকিলেও জল-কষ্ট নাই । ঝরণার জলেই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে । সাধারণ একটা বাজার আছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জব্যই পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে কাজড়া জেলা । তথায় দশমহাবিদ্যাস্তর্গতা সপ্তমী মহাবিদ্যা ধুমাবতী আছেন । এই দেশে উহাও একটা পুণ্য তীর্থস্থান বলিয়া বহুতর যাত্রী দর্শনার্থ যাইয়া থাকে । উক্ত স্থানে যাইবার জন্য আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শরীর অসুস্থ হওয়ায় যাওয়া হইল না ।

কাজড়া হইতে তের ক্রোশ উত্তরে মণিকর্ণিকা নামে একটা কুণ্ডতীর্থ আছে । তাহার জল এত উষ্ণ যে তপ্তল নিক্ষেপ মাত্র অগ্নে পরিণত হয় । তদুত্তরে নয় ক্রোশ দূরে রোয়ালসর । এখানে ভাসমান পর্বতখণ্ডোপরি শিবমন্দির আছে । অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনার্থ যাইয়া থাকেন । তদুত্তরে বিষম দুর্গম পথে কিছু দূরে গেলে কৈলাস যাওয়া যায় ।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসায় আসিলাম এবং রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে শয়্যাগ্রহণ করিলাম ।

জালামুখী ।

এই স্থানে আমরা ত্রিরাত্রি বাস করিয়া বিদায় হইলাম ।
বিদায়কালে পাণ্ডাঠাকুর প্রসাদ দিলেন । আমরা সকলেই কিছু
কিছু প্রণামী দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম । পাণ্ডাঠাকুর অতি ভদ্র,
ছিক্কি না করিয়া পরমানন্দে আশীর্বাদ ও বিদায় দিলেন ।
এই স্থানের পাণ্ডাগণ, বিশেষতঃ পান্নালাল পাণ্ডা, যেমন সংস্কার
এবং ভদ্র একরূপ আর কোম দেশের কোন তীর্থেই দেখি নাই ।
আমরা জালামুখী দেবীকে প্রণাম পুরঃসর ছুর্গানাম স্মরণ করিতে
করিতে দেশাভিমুখে রওয়ানা হইলাম ।

উৎকল ।

বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকল শ্রুতঃ ।
উৎকলস্ত সমো দেশো দেশে নাস্তি মহীতলে ॥
সাগরস্তোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্ত দক্ষিণে ।
সঃ প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥

অর্থাৎ

সপ্ত বর্ষ মধ্যে যেমন ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, তেমনি দেশ মধ্যে উৎকলদেশই শ্রেষ্ঠ । লবণাসু নিধির উত্তর তীর হইতে মহানদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত উৎকলদেশ ; এই প্রদেশ গমনেই সর্বতীর্থ ফল হইয়া থাকে ।

অনেক দিন হইতে বাসনা, উৎকল ও কর্ণাটাদি দক্ষিণ বিভাগীয় তীর্থসকল পরিভ্রমণ করি । পরন্তু গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান করার পরই নাভিগয়া ও পাদগয়ার পিণ্ড দান করিয়া ত্রিগয়া সম্পন্ন করিব, একরূপ আশা-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া-ছিল । সাধারণ কথায় বলে “তাকেই বলে পুত্র যে করে ত্রিগয়া, তাকেই বলে কন্যা যে করে সর্বজয়া ” । সময় ও সুযোগভাবে সে আশা-বীজ হৃদয়েই পোষণ করিয়া আসিতেছি । এক্ষণে সেই আশা-বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে । শুধু পাদগয়া পর্য্যন্ত ইহার শাখা

নহে, সুদূর রামেশ্বর-সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ইহার শাখা বিস্তৃত হইয়াছে ।
দেখিব “আশা-বৃক্ষে ফলে কিবা ফল, সুখের সম্পদ কিম্বা পূর্ণ
হলাহল ” ।

সঙ্গী অভাবে সুদূর পথভ্রমণে সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়,
তাহাতেই সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম । শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্তই
অনেকে যাইয়া থাকে, তাহারই সঙ্গী পাওয়া যায় । তা ছাড়া দক্ষিণ-
পথে অধিকদূর যাইতে প্রায়ই সঙ্গী পাওয়া যায় না ; কেহ স্বীকৃতও
হয় না । ছুচারিটী লোককে অর্থানুকূল্য করিতে স্বীকৃত হইয়াও
সঙ্গী পাইলাম না । রথযাত্রার দিন যতই নিকট হইতে লাগিল
ততই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; কি করি,
অনেক চেষ্টায়ও সঙ্গী না ঘোঁটায়, মনের দুর্দমনীয় উৎসাহ
উৎকণ্ঠাবেগ রোধ করিতে না পারিয়া আমার প্রতিবাসী প্রবাস-
অনভিজ্ঞ, অল্পবয়স্ক, কুস্তজ বংশোদ্ভব একটা ব্যক্তিকে বহু প্ররোচনা
দিয়া ও অর্থানুকূল্য করিতে স্বীকৃত হইয়া সঙ্গী করিয়া দক্ষিণের পথে
রওয়ানা হইলাম । সঙ্গীটী এমনই অনভিজ্ঞ যে কস্মিন্‌কালেও কোন
স্থানে যায় নাই । লেখাপড়াও জানে না, চালাক-চতুরও নয় ; তবে
সরলপ্রকৃতি, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী বটে ; নাম বাণেশ্বর কুণ্ড ।
এই বাণেশ্বরকেই রামেশ্বর পথের সঙ্গী করিয়া ১৩১৩ সালের
৭ই আষাঢ় রথযাত্রা উপলক্ষে তৎপূর্বেই বাড়ী হইতে যাত্রা
করিলাম । চলিলাম বটে কিন্তু একান্ত চিন্তিত হইলাম ; কেন না,
যে সুদূর পথে গমন করিতে মানস করিয়াছি, এপথে কখনও
যাই নাই পরন্তু কোন পথে কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইয়া কিরূপে যাইতে

তীর্থ-কাহিনী ।

হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলাম না । রামেশ্বর, পাদগয়া, কাঞ্চিপুর প্রভৃতি তীর্থে ব্রহ্মদেশস্থ লোকে প্রায়ই যায় না, সুতরাং অনুসন্ধান বিফল । মনে মনে স্থির করিলাম, নাভিগয়া ও অন্যান্য তীর্থ দর্শনান্তে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পৌছিব । রথযাত্রা উপলক্ষে নানা দিগ্দেশীয় বহু যাত্রীর একত্র সমাবেশ হওয়ায় অবশ্য রামেশ্বর গমনের সঙ্গী না পাইলেও যাইবার পথ জানিতে পারিব ; ইহাই স্থির করিয়া প্রথমতঃ নাভিগয়া উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম ।



বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া ।

আন্তে বৈতরণী নাম্নী সর্বপাপহরা নদী ।
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিরজে যে কলেবরং ।
পরিত্যজন্তি পুরুষা স্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥
বিরজে বিরজা নাম ব্রহ্মণাসংপ্রতিষ্ঠিতা ।
তস্যাঃ সন্দর্শনামৃত্যুঃ পুনাত্যা সপ্তমং কুলং ॥
স্নাত্বা দৃষ্ট্বাতু তাং দেবীং ভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ ।
নরঃ স্ববংশমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥
আন্তে সযন্তুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিস্বয়ং ।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
(ব্রহ্মপুরাণং)

উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রেমুচ্যতে ।
আক্রান্ত দৈত্যজঠরং ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা ॥
নাভিকূপ সমীপেচ দেবীচ বিরজা স্থিতা ।
তত্র পিণ্ডাদিকং কৃত্বা ত্রিসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ ॥
(বায়ুপুরাণং)

তীর্থ-কাহিনী ।

অর্থাৎ

সর্বপাপহারিণী বৈতরণী নাম্নী নদীতে যে স্নান করে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় । এই ক্ষেত্রে যে মানব দেহত্যাগ করে সে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করায় ইহার অন্যতম নাম যজ্ঞপুর, এক্ষণে প্রসিদ্ধ যাজপুর । সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞ বরাহ-রূপী হরি ও বিরজা দেবী উদ্ভূতা হওয়ায় ইহার অপর নাম বিরজা-ক্ষেত্র । যে মানব বিরজা দেবীকে পূজা করিয়া প্রণাম করে সে স্ববংশ সহিত স্বর্গে গমন করে । স্বয়ং স্বয়ম্ভু ক্রোড়রূপী হরি বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহাকে ভক্ত সহকারে দর্শন ও প্রণাম করিলে লোক বিমুক্ত প্রাপ্ত হয় ।

গয়াস্বরের নাভিদেশ এই উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় নাভিগয়া নামে খ্যাত হইয়াছে । এই নাভিকূপ সমীপে বিরজাদেবী অবস্থিত । নাভিকূপে পিণ্ডদানে একবিংশ কুল উদ্ধার হইয়া থাকে ।

সাধারণতঃ এই স্থান যাজপুর নামে খ্যাত ; বোধ হয় “যজ্ঞপুর” শব্দ হইতে যাজপুর নাম হইয়া থাকিবে । উড়িষ্যাদেশে কটক জেলার প্রধান নগর বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । যাজপুর রোড্-নামক ষ্টেশনই রেল-ষ্টেশন ।

হাওড়া হইতে যাজপুর রোড্ (২০২) দুই শত দুই মাইল । রেলভাড়া (২৥৮৫) দুই টাকা সোওয়া দশ আনা । হাওড়ার পূর্বাহ্ন সাড়ে নয়টার সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে গাড়ীতে উঠিয়া পরদিবস অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টার সময় যাজপুর রোডে পৌঁছা যায় । ষ্টেশনের অনতিদূরেই কয়েকখানি মন্দির দোকান ;

বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া ।

যাত্রিগণের আশ্রয়ের কেবলমাত্র ভরসা । আমরা ষ্টেশন হইতে আসিয়া দেখি, সমস্ত গৃহগুলিই যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে ; এখন উপায় কি করি ? যাই কোথা ? থাকি কোথায় ? ষ্টেশনটীও অতি ছোট, যাত্রী বিশ্রামের স্থান নাই, চতুর্দিকেই কেবল মাঠ ধু ধু করিতেছে । নিকটে কোন বসবাস নাই, কিছুদূরে একটি অশ্বখ বৃক্ষতলে কতকগুলি গো-শকট অবস্থিতি করিতেছে । নিরুপায় হইয়া অগত্যা ঐ বৃক্ষতলেই আশ্রয় লইলাম । আমাদের দেখা-দেখি অনেক যাত্রীই আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন । কোন-রূপে বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যাষেই যাজপুরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম । এই স্থান হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে যাজপুর । গো-যান বা ডুলী পাওয়া যায়, ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় । পদব্রজে যাইবার জন্ত বাঁধা রাস্তা নাই ; সমতল প্রান্তর মধ্য-দিয়া গো-গাড়ীর লাইন ধরিয়া যাইতে হয় । বৃষ্টি-বাদলার দিনে জল-কাদাও বিস্তর ; অনুমান পাঁচ ক্রোশ অন্তর পশ্চিমধ্যে রোচি বা রুড়িয়া নামে একখানি গ্রামে চটী আছে । এই চটী বুড়ানদীর ধারে । মধ্যাহ্নে আহারাদি করা যাইতে পারে । আমাদের সহযাত্রিগণ মধ্যে অনেকেই আহারাদি জন্য চটীর আশ্রয় লইলেন । আমরাও একটি মুদীর দোকানের সন্মুখে উপবেশন করিয়া শ্রমহারী তাম্রকুট ধূমপানান্তে পুনরায় রওয়ানা হইলাম । অতি পরিশ্রমে ক্লান্তগমন করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া যাজপুরে বৈতরণী নদীতীরে উপনীত হইলাম । এই নদী গোনাসা নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অনেকগুলি

তীর্থ-কাহিনী ।

রাজ্যের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । বৈতরনী বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা ।

আমাদের আগমন দৃষ্টে দূর হইতে পাণ্ডাগণ নিজ নিজ খাতা বগলে করিয়া আসিয়া আমাদের নাম, বাসস্থান, জেলা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করতঃ বিরক্তের একশেষ করিয়া তুলিল । যাত্রীদিগের মধ্যে যাহার বংশে কেহ কখন আইসার প্রমাণ করিলেন তিনি তাঁহাকেই পাণ্ডা স্বীকার করিলেন ; আর যাহাদের বংশে কেহ কখন আইসে নাই সেই সকল নূতন যাত্রী লইয়া পাণ্ডাগণ পরস্পরে বাগ্-বিতণ্ডা করতঃ মহা গণ্ডগোল করিতে লাগিল । পরে যাত্রীগণ যাহার যাহাকে ইচ্ছা পাণ্ডা স্বীকার করিলেই বিবাদ মিটিয়া গেল । এ স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করে না । যে যাহা দেয় তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া তত্রত্য তৈরিক তাবৎ কার্য্য করাইয়া থাকে ।

এই স্থানের কার্য্য বৈতরনীতে গাভীদান, স্নান, তর্পণ, পিণ্ডদান, দেবদর্শন, ব্রাহ্মণভোজন । যাহার যেমন সাধ্য তদনুসারেই এ স্থানের কার্য্য হইতে পারে, ফল কথা তিন টাকা হইতে সাত টাকার উর্দ্ধ ব্যয় নহে । ইহার মধ্যেই উল্লিখিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে ।

আমার পথশ্রমে ও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর ক্লান্ত হওয়ায় তৎকালে গয়ার কার্য্য করিতে না পারায় কেবল বৈতরণীর কার্য্যই শেষ করিলাম । বৈতরনী করিতে গাভীদানই প্রশস্ত ; অশক্ত পক্ষে তন্মূল্য (চারি আনা) দানও হইতে পারে । যজ্ঞবরাহরূপী ভগবান্

বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া ।

হরির মন্দির সম্মুখে জগন্মোহন (নাটমন্দির) মণ্ডপ । এই মণ্ডপের সম্মুখেই প্রস্তরমণ্ডিত অঙ্গনে বসিয়া যাত্রিগণ গো দান করিয়া থাকেন । বরাহদেবের মন্দিরের সন্নিকটে বাঁধা ঘাট আছে ; উহাকে দশাশ্বমেধ ঘাট বলে । এই ঘাটের পরপারে গৃহ মধ্যে অষ্ট-মাতৃকা মূর্তি সহিত যমের স্ত্রী, মাসী, পিসী, ভগিনী প্রভৃতি সহ বমরাজ অবস্থিতি করিতেছেন । এই স্থান হইতে এক ক্রোশের উপর দূরে বিরজাদেবী ও তৎসম্বিহিতা নাভিগয়া । আমরা বৈতরণী-তীরে ঐ সকল দর্শন করিয়া অর্দ্ধ মাইল বাবধানে চটীতে যাইয়া বাসা গ্রহণ ও রন্ধনাদি করিয়া আহাৰাস্তে বিশ্রাম করিলাম । কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামাস্তে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম । আমরা যেখানে বাসা করিয়াছি ইহা সাধারণ চটী । কেবল যাত্রিগণ এই স্থানে অবস্থিতি করেন । সামান্য আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি ব্যতীত বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপর বাজার হইতে আনিতে হয় । অপর বাজারটী কিঞ্চিৎ দূরে । চটীর দোকানদার প্রায়শঃ মুসলমান ; যাত্রীদের বাসস্থান তাহাদেরই গৃহে । আমরা যে গৃহে বাসা করিয়াছি তাহাও মুসলমানের দোকানগৃহ । সম্মুখে দোকান, পিছনে যাত্রিনিবাস । মধ্যাহ্নকালে যে কূপোদকে আমরা রন্ধনাদি করিয়াছি সায়াহ্নকালে দেখি, গৃহবাসী দোকানদার ঐ কূপ হইতে জল উঠাইতেছে । তদৃষ্টে মনে ঘৃণা হওয়ার পাণ্ডাঠাকুরকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করায়, তিনি বলিলেন, এই স্থানে মুসলমানের দোকান ভিন্ন অন্য বাসা নাই । তখন গতাত্তর না দেখিয়া রাত্রির রন্ধনাদিতে ক্ষান্ত হইয়া অপর বাজার হইতে জলযোগের জন্ত কিছু খাদ্য খরিদ করিয়া

তীর্থ-কাহিনী ।

লইয়া সন্ধ্যার প্রাকালে বৈতরণী নদীতীরে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি ও জলযোগ করিয়া আসিলাম । পরদিবস প্রাতঃস্নানান্তর পিণ্ড-দানোপযোগী আটা, গুড়, কদলী, ঘৃত, তিল প্রভৃতি ধরিদ করিয়া লইয়া পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডদানার্থ নাভিগয়াতিমুখে চলিলাম । প্রায় এক ক্রোশ পাকা প্রশস্ত সড়ক পথ গমনান্তর একটা পুকুরিণী প্রাপ্ত হইলাম ; এই পুকুরিণীকে “ব্রহ্মকুণ্ড” বলে । পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করায় এই কুণ্ড হইতে বিরজা নামী দেবী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন ; তজ্জন্তুই ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড । প্রথমতঃ এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয় । জলের যেমন রং, তাহাতে স্নান ত দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও শ্রদ্ধা হয় না । পুণ্যতোয়া বলিয়া কিঞ্চিৎ জল শিরে ধারণ পূর্বক তথায় সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করতঃ অদূরে প্রাচীরবেষ্টিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম । প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যস্থলে সমুন্নত মন্দির ; তন্মধ্যে নাভিগয়া । ইহা একটা কূপের জায় গর্ভ বিশেষ । গোলাকারে প্রস্তর দ্বারা প্রায় দুই হস্ত উন্নত করিয়া বাঁধান । অভ্যস্তর কত গভীর তাহা অন্ধকার জন্ত দৃষ্ট হয় না । এই কূপের নিকটে বসিয়া কূপমধ্যে পিণ্ডদান করিতে হয় । মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অপর মন্দিরমধ্যে যজ্ঞোদ্ভূতা বিরজাদেবী বিরাজিতা আছেন । পিণ্ডদানান্তর তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে হয় । তদনন্তর মন্দির মধ্যস্থ শিবলিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া পুরী হইতে বাহির হইলাম ।

নাভিগয়ার ক্ষেত্রের আয়তন ত্রিকোণাকারে পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত ।

বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া ।

এই ক্ষেত্রমধ্যস্থ বহুতর দর্শনীয় পুণ্যতীর্থ আছে । সময়ভাবে যাত্রিগণের ভাগে সে সকল দর্শন ঘটয়া উঠে না । দক্ষিণ সীমা বরুণেশ্বর শিবলিঙ্গ, পূর্বসীমা খেলাটেশ্বর শিবলিঙ্গ, পশ্চিম সীমা বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ ; এই ত্রিভুজাকার পঞ্চ ক্রোশ ক্ষেত্রমধ্যে উনকোটি শিবলিঙ্গ ও কুণ্ডতীর্থ আছে ; তন্মধ্যে স্থানেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, অগ্নীশ্বর ও অখণ্ডেশ্বর এবং হাটকেশ্বর এই পঞ্চলিঙ্গ একান্ত দর্শন আবশ্যক । নাভিগয়া-কার্য্য ও দর্শনাদি শেষ করতঃ বাসায় আসিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান দ্বারা বিদায় করিতে হয় । তৎসঙ্গে স্থায় পাণ্ডাকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদানে সাফল্য গ্রহণ কর্তব্য ।

যাজপুরে প্রায় (১২০০) বার শত ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে । ইঁহারা প্রায়ই হীনাবস্থাপন্ন । অত্যাশ্রয় বহু জাতির বসতি আছে । গ্রামের আয়তন বহু বিস্তৃত । সহরটী মন্দ নহে । একটা মুন্সেফী আদালত আছে, থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে । স্থানীয় জলবায়ু মন্দ নহে ; সহরবাসী লোকের দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ ! লোকের স্বভাব কিরূপ—অত্যন্ত কালমাত্র ছিলাম বলিয়া জানিতে পারি নাই ; তবে পাণ্ডাগণ আমাদের সহিত কোনরূপ অসহ্যাবহার করেন নাই ।

একাত্ম কানন

বা

ভুবনেশ্বর ।

শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্নিধৌ ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা ন নদ্যান্তে পূর্বগামিনী ॥
সরিত্তদুদ্ভবা হেকা নাম্নী গন্ধবতী শ্রুতা ।
সান্ধাদিব তু সা গঙ্গা কাশ্যামুত্তরবাহিনী ॥
সর্বপাপহরং দিব্যং তত্তীরে সদনং মম ।
একাত্মমিতি বিখ্যাতং বর্ততে কিল সুন্দরি ॥

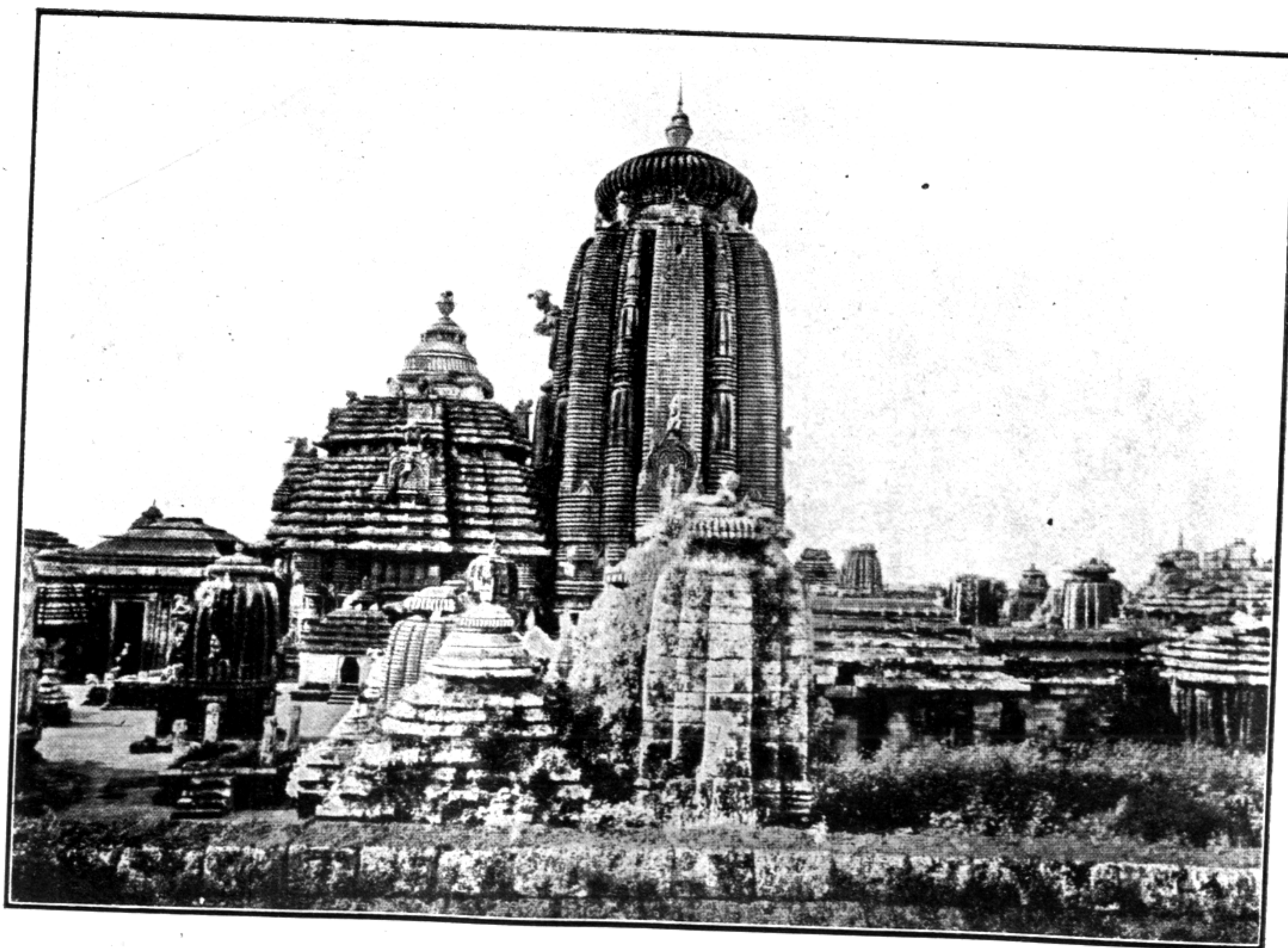
(শিবপুরাণম্)

সর্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুলভং ।
লিঙ্গকোটিসমায়ুক্তং বারাণসীসমপ্রভং ॥
তত্র বিন্দুসরস্তীর্থং তীর্থবিন্দুভিঃ পূরিতং ।
তস্য মজ্জনমাত্রেন সর্বতীর্থাভিগাহনম্ ॥

(ব্রহ্মপুরাণম্)

অর্থাৎ

হে দেবি ! উৎকলক্ষেত্রে দক্ষিণ সমুদ্রের সন্নিহিতে বিন্ধ্যগিরি
পাদোদ্ভবা পূর্বগামিনী নদী আছে ; ঐ নদীর নাম গন্ধবতী,



শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির ।

একাত্ম কানন ।

উহা সাক্ষাৎ কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গাতুল্যা । ঐ নদীতীরে আমার সৰ্বপাপনাশন একাত্মকানন নামে বিখ্যাত নগর আছে । ঐ নগর পরম দুর্লভ ক্ষেত্র, কোটি লিঙ্গ সমন্বিত বারাণসীতুল্য । তথায় বিন্দুসরোবর নামে এক সরোবর আছে । পৃথিবীস্থ যাবতীয় পুণ্যতীর্থের বিন্দু বিন্দু লইয়া ঐ সরোবর সৃষ্ট, তাই ইহার নাম বিন্দুসরোবর । ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল হয় ।

কাশী চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা দক্ষিণ কাশী । কাশীতে যেমন শিবলিঙ্গ ও কুণ্ডতীর্থ আছে এখানেও সেইরূপ বহুতর লিঙ্গ ও কুণ্ডতীর্থ আছে । কাশীতে যেমন তীর্থদর্শনে যাত্রার বিধি আছে, এখানেও সেইমত নিয়ম আছে । এইস্থান পুরী জেলার অন্তর্গত । ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা ভুবনেশ্বর, তন্নামানুসারেই এস্থানের নাম ভুবনেশ্বর এবং তন্নামেই রেলওয়ে স্টেশনের নাম ।

হাওড়া হইতে ভুবনেশ্বর স্টেশন ২৭১ মাইল, ভাড়া (৩৥/০) তিন টাকা নয় আনা । যাজপুর হইতে ভুবনেশ্বরে ভাড়া (৮৬/০) পনর আনা । হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিয়া যাইতে হয় ।

আমরা রাত্রি আটটার সময় যাজপুর রোডে গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি তিন টার সময় ভুবনেশ্বর স্টেশনে পৌঁছিলাম । গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্র একজন পাণ্ডা আসিয়া সঙ্গে লইয়া স্টেশনের বাহিরে করগেটেট্ আবরণ-নির্মিত গৃহে স্থান দিল । তথায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে পাণ্ডার

তীর্থ-কাহিনী ।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণমুখে চলিলাম । দুই মাইল পরিমিত দীর্ঘ রাজপথ অতিক্রম করিয়া নগর প্রাপ্ত হইলাম । বাতী থাকিবার বাসার অভাব নাই, আমরা প্রতিজনে (২৫) একপরসী হিসাবে দৈনিক ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া, তথায় আপন আপন জিনিসাদি রাখিয়া স্নানার্থ বিন্দুসরোবর চলিলাম । বাজারের প্রান্তভাগে এবং ভুবনেশ্বর দেবমন্দিরের উত্তরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বিন্দুসরোবর । এই সরোবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় (৮৬৬) আট শত ছয়টি হাত ও পূর্ব পশ্চিমে প্রস্থ প্রায় (৫২০) পাঁচ শত কুড়ি হাত । ইহার পূর্বদিকে মণিকর্ণিকা, দক্ষিণদিকে ত্রিশূর, পশ্চিমদিকে বিশ্রাম ঘাট এবং উত্তর দিক গোদাবরী নামে কথিত হয় । স্নানে নামিবার জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে দুইটী ঘাট প্রস্তর দ্বারা বাঁধান আছে । সরোবরের জলের রং শাকবর্ণ ; পুণাতোয়া বলিয়াই লোকে স্নান করে,—পানার্থ কূপোদকই সকলে ব্যবহার করে । আমরা এই বিন্দুসরোবরে বিশ্রামঘাটে স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করতঃ ভুবনেশ্বর দর্শনে গমন করিলাম । নগরের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রসিদ্ধ দেবমন্দির । চতুর্দিক প্রস্তরনির্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত । আয়তনে দীর্ঘে পূর্বপশ্চিমে প্রায় (৩৪৮) তিন শত আট চল্লিশ হস্ত, প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে প্রায় (৩১০) তিন শত দশ হস্ত । প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর দেবমন্দির । এই মন্দির উচ্চে প্রায় (১১০) এক শত দশ হাত । গঠন প্রণালী ৬জগন্নাথদেবের মন্দিরের সদৃশ । মন্দির-গাত্রে বিবিধ কারুকার্য খচিত শিল্প নৈপুণ্যের আধার স্বরূপ ।

একাত্ত কানন ।

বিশেষভাবে দেখিলে ইহার গাত্রে অশ্লীল মূর্তি খোদিত দৃষ্ট হয় । দেবমন্দিরে এইরূপ কুরুচি পূর্ণ মূর্তি খোদিত থাকা কি কুরুচিকর কৰ্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না ! ইহা সুরুচি কি কুরুচির পরিচায়ক—তাহা কুরুচিবাগীশেরাই জানেন । প্রবেশ দ্বারোপরি একটি শ্লোক (১) লিখিত আছে । সেই শ্লোকটি পাঠে জানা যায় যে (৫৮৮) পাঁচ শত অষ্টাশি শকে কেশরী বংশীয় রাজা ললাটেন্দু কেশরী দ্বারা এই মন্দিরটি নির্মিত হয় । প্রাচীর-গাত্রে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে প্রশস্ত তিনটি দ্বার আছে । ঐ তিন দ্বার দ্বারাই লোক যাতায়াত করে । পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অপর মন্দিরে যাইয়া প্রথমতঃ গণপতিকে দর্শন ও পূজা করিতে হয় । তৎপর ভুবনেশ্বর দেবমন্দিরে যাইয়া ভুবনেশ্বর দর্শন ও পূজা করিতে হয় । গৌরীপটু সমেত সপ্ত হস্ত পরিধি এবং হস্তদ্বয় উচ্চ, তত্‌পরি দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর বিরাজিত । লিঙ্গরাজের শিরোদেশে একটি শ্বেতবর্ণ রেখাচিহ্ন আছে, পূজা ও ভোগাদি সমস্তই ৬জগনাথদেবের পূজা ও ভোগের ন্যায় । ইহারও ভোগের প্রসাদানের আটকা বাজারে বিক্রয় হয় । অনেক যাত্রীই উক্ত প্রসাদান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন । আমরা ভুবনেশ্বর দর্শন ও পূজা অন্তে প্রণাম করতঃ বাহির হইয়া মন্দির পরিক্রমণকালে উত্তরপার্শ্বে মন্দির মধ্যে

(১) গজাষ্টাং সিতে জাতে শকাক্ষে কীৰ্ত্তি মানদঃ ।

প্রসাদমকরোজ্জ্বলা শ্রীললাটেন্দু কেশরী ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

ভুবনেশ্বরী ও তৎসন্নিহিত প্রাঙ্গণে কল্পবটবৃক্ষ এবং দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী অপর মন্দিরে ধাতুনির্মিত হরিহর, মদনমোহন, দোলগোবিন্দ, বাসুদেব, রুক্মিণী, পার্শ্বতীর্থা, পঞ্চবক্তৃ শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি দর্শন করিয়া বিন্দুসরোবরে মণিকর্ণিকা নামক ঘাটের উপর অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে আসিলাম । দেখিলাম অনন্ত বাসুদেব মূর্তিহয় রামকৃষ্ণ রূপে বিরাজিত আছেন । রামমূর্তির উপর অনন্তদেব ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া আছেন । দর্শন ও প্রণাম পূর্বক তথা হইতে অদূরে মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, প্রভৃতি পৃথক পৃথক মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া কপিলেশ্বর মন্দিরে যাইয়া কপিলেশ্বর লিঙ্গদর্শন করিলাম এবং তদীয় কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া গৌরীকুণ্ড আসিলাম । তথায় কুণ্ডের জল শিরে ধারণ করতঃ গৌরীদেবী দর্শন ও প্রণাম করিলাম । ভুবনেশ্বরে যত অধিক শিবলিঙ্গ, মন্দির ও কুণ্ডতীর্থ দেখা যায়— এক কাশী ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক শিবলিঙ্গ মন্দির ও কুণ্ডতীর্থ নাই । এখানে বহুতর কুণ্ডতীর্থ ও লিঙ্গ আছে ; ঐ সকল কুণ্ডমধ্যে গৌরীকুণ্ড, অলাবুকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং রামকুণ্ডই প্রধান । ঐ সকল কুণ্ডতীর্থ অপেক্ষা বিন্দুসরোবর, গঙ্গা, যমুনা, পাপনাশিনী, কপিলহ্রদ ও কোটীতীর্থ প্রভৃতির মাহাত্ম্যই বেশী । আমরা যথাসম্ভব ঐ সকল কুণ্ডবারি শিরে ধারণ করিয়া ও অনেকগুলি শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম । আহারাভ্যেই বাজার দিকে বাহির হইলাম । বাজারটি মন্দ নহে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায় ।

একাত্তর কানন ।

থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল এবং ডাক্তারখানা আছে । এই স্থান হইতে (৪) চারি ক্রোশ দূরে খণ্ডগিরি । ইহা দর্শনোপযোগী স্থান । পদব্রজে বা গোলকটে যাওয়া যায় । গো-গাড়ীর ভাড়া এক টাকার ন্যূন নহে । খণ্ডগিরির উপর জৈনদিগের মন্দির ও অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর গুহা দেখা যায়, সময়াভাবে আমাদের দর্শন ঘটয়া উঠে নাই ।

আমরা নগর পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্নে বাসায় আসিয়া পাণ্ডাকে দর্শনী স্বরূপ যথাকথঞ্চিৎ প্রদান করিয়া জলযোগান্তে পুনরায় ষ্টেশনে আসিলাম । রাত্রি তিন টার সময় (১২০) ছয় আনা মাসুল দিয়া সাক্ষী গোপাল ষ্টেশনের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া ভোর (৫।০) সাড়ে পাঁচ টার সময়, সাক্ষী গোপাল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম ।

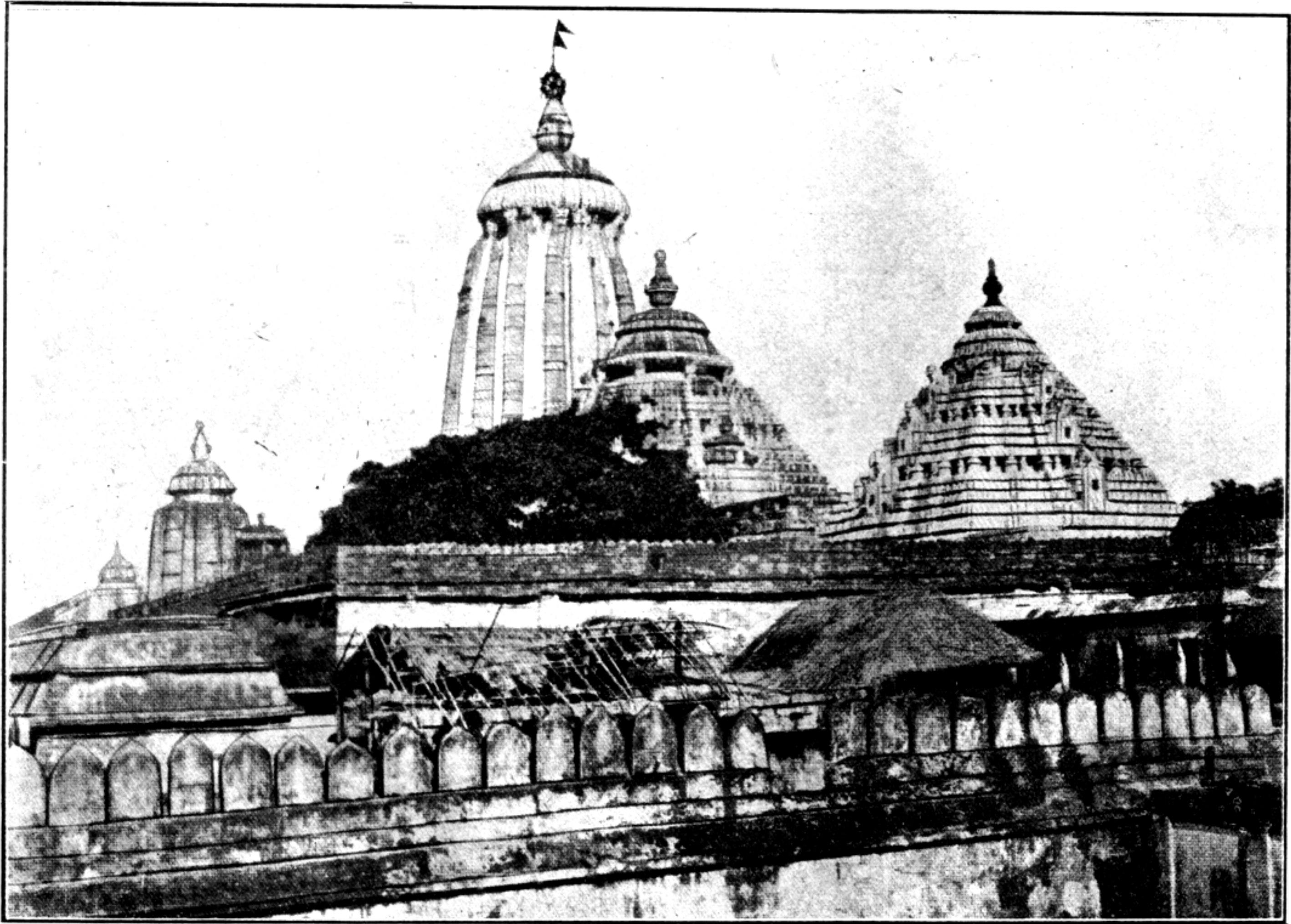
সাক্ষী গোপাল ।

ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে একটি বাগান মধ্যে মন্দির ; তন্মধ্যে দ্বিভূজ মুরলীধর সাক্ষী গোপাল বিরাজিত । ইহার অপর নাম সত্যবাদী । জনৈক ব্রাহ্মণের বিবাহ বিষয়ক সাক্ষী দেওয়ার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে ৩ গোপালজীদেব উৎকলে আসিতেছিলেন । পথিমধ্যে আগমন বিষয়ক কথার অন্তথা হওয়ায় ইনি এই স্থানেই চিরদিনের জন্য থাকিয়া যান । তদবধি এই স্থানের নাম সত্যবাদী হইয়াছে । কিন্তু সাধারণের নিকট সাক্ষী গোপাল নামেই পরিচিত । ইহাকে দর্শন করিতে কোন ব্যয়

তীর্থ-কাহিনী ।

বাহুল্য নাই এবং এখানে কোন ক্রিয়াকাণ্ডও নাই । ৬গোপালজীর ভোগের জন্ত যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই দিতে পারেন । দেবমন্দিরের অদূরে একটি পুষ্কর্ণী, তাহার জল স্নান ভিন্ন পান করা যায় না । সামান্য একটি বাজার আছে তাহাতে চাউল, দাইল ভিন্ন অন্য কিছু দেখিলাম না । ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া নয়টার সময় (৭/১০) আড়াই আনায় পুরীর টিকিট লইয়া রওয়ানা হইলাম । এইস্থান হইতে পুরী তিন ক্রোশ, —পদব্রজেও যাওয়া যায় ।





শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির । (পার্শ্বদৃশ্য)

পুরুষোত্তম ।

বা

শ্রীক্ষেত্র ।

লবণান্তোনিধেন্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকং ।
ক্ষেত্রং তদুলভং বিপ্র সমস্তাদ্ভ্যশ যোজনং ॥
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ ।
প্রবিশন্তস্ত তৎ ক্ষেত্রং সর্বৈ স্যার্কিবৃক্ষমূর্তয়ঃ ॥
যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলেক্ষণং ।
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্বদুঃখদে ॥
রথারূঢ়ং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ ।
ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য জৈমিনে ভববন্ধনং ॥

(পাদে)

নীলাদ্রে রত্নভূমৌ হি কল্পন্যথোধমূলতঃ ।
বারুণ্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রোহিণীনাম বিশ্রুতং ॥
তন্তীরে নিবসন্তং মাং পশ্যন্তি চর্মচক্ষুষা ।
তদন্তসা ক্ষীণপাপো মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

পুরুষোত্তমাং পরং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ।
ভূস্বর্গমিতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্লভং ॥
যত্রকুত্রাপি মরণাং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
ন স্থাননিয়মস্তত্র যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥

(উৎকল খণ্ড)

সমুদ্রশোভরে তীরে আস্তে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজ শরীরভূং ॥
হরেদারুবপুং দৃষ্ট্বা হরিসাযুজ্য মাগ্নুয়াং ॥

(শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব)

অর্থাৎ

হে বিপ্র জৈমিনে ! লবণ সমুদ্রের তীরে চতুর্দিকে দশ যোজন
বিস্তীর্ণ অতি দুর্লভ পুরুষোত্তম নামক পুণ্যক্ষেত্র অবস্থিত ।
এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থিত দেহী মাত্রকেই দেবগণ চতুর্ভূজরূপে
দর্শন করিয়া থাকেন । পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্রই মনুষ্য
সকল বিষ্ণুমূর্তি সম হয় । যে সকল মানব পদ্মলোচন শ্রীজগন্নাথ
দেবকে রথস্থ দর্শন করে তাহাদের আর এই দুঃখময় সংসারে
পুনর্জন্ম হয় না । ভক্তিপূর্বক যে মনুষ্য শ্রীজগন্নাথদেবকে রথারূঢ়
দর্শন করে, শ্রীজগন্নাথরূপী ভগবান তাহার ভববন্ধন মোচন
করেন ।

পুরুষোত্তম ।

নীলপর্বতমধ্যভূমিতে কল্লবট মূলের পশ্চিমে রোহিণী কুণ্ডনামে যে কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে তীরস্থ হইয়া আমাকে চন্দ্রচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে এবং রোহিণী কুণ্ডের জল স্পর্শদ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় । পৃথিবীতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আর নাই ; ইহা ভূস্বর্গ বলিয়া খ্যাত জন্ত দেবগণেরও দুর্লভস্থান । এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেই পরমবিষ্ণুপদ লাভ হয় ।

সমুদ্রের উত্তর তীরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পূর্ণানন্দময় পরং-ব্রহ্ম দাক্ষশরীরে বিরাজমান । হরির সেই দাক্ষময় মূর্তি দর্শন করিলে হরির সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের আয়তন দশযোজন, নীলাচলের পরিধি পঞ্চ ক্রোশ, তন্মধ্যে দুই ক্রোশ—গুণ্ডিচা (গুঞ্জ) বাড়ী হইতে সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত একক্রোশ পরিমিত স্থান অতীব পবিত্র ও স্বর্ণ বালুকা-কীর্ণ । ইহারই মধ্যে ভগবানের শ্রীমন্দির ; এই মন্দির হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পরিমিত স্থান শঙ্খনাভি মধ্যে অবস্থিত । পূর্ব পশ্চিম সীমা ধরিলে এই ক্ষেত্র শঙ্খাকৃতি বোধ হয় । এই শঙ্খের অগ্রভাগে নীলকণ্ঠ মহাদেব নামে এক লিঙ্গ আছেন । শঙ্খের উত্তর ভাগ সমুদ্রজলে বিধৌত হওয়ায় সমুদ্র সংযোগে ঐ সাগরকূলকে তীর্থরাজ্য বলে । ঐ তীর্থরাজ্যে দর্শনাবগাহন করিলে জীবগণ ভববন্ধন-মুক্ত হয় । পুরাকালে রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চ মুণ্ডমধ্যে শিবনিন্দাজন্য একটী মুণ্ড কর্তন করেন, ব্রহ্মা সেই ছিন্নশির লইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি উহা পরিত্যাগোপযোগী স্থান না পাইয়া অবশেষে

তীর্থ-কাহিনী ।

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া শঙ্খের দ্বিতীয়াবর্তে পরিত্যাগ করায় সেই স্থানে দেবাদিদেব শঙ্কর ব্রহ্মকপালমোচন শিবলিঙ্গ-রূপে অবস্থিত আছেন । উক্ত শিবলিঙ্গ দর্শন ও প্রণাম করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ দূর হয় । এই স্থানের দক্ষিণে শঙ্খের তৃতীয়াবর্তে বিমলা দেবী আছেন ; ঐ বিমলা দেবীকে ভক্তিপূর্বক দর্শন ও প্রণামে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । শঙ্খের নাভিদেশে রোহিণীকুণ্ড, কল্লবট, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, কপালমোচনতীর্থ ও অর্দ্ধাশনী দেবী বিরাজিতা আছেন । কল্লবট স্পর্শে ও উহার ছায়ায় অবস্থান করিলে মুক্তি লাভ হয় । কপালমোচন শিব হইতে শঙ্খের নাভি ভাগ পর্য্যন্ত স্থানে অর্দ্ধাশনী শক্তিদেবী বিদ্যমানা আছেন । সৃষ্টির আদিতে মহা প্রলয়ে বর্দ্ধিত জলরাশির অর্দ্ধাংশ অশন (ভক্ষণ) করিয়াছিলেন বলিয়া এই মহাশক্তিরূপা দেবী অর্দ্ধাশনী নামে খ্যাতা হইয়াছেন । ইহাকে দর্শন করিলে শাস্বত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইস্থানের অন্তর্বেদীতে দেবতারাও অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন । পৃথিবী, গগন ও স্বর্গে যে সার্ব্বত্রিকোটি তীর্থ আছে তন্মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই সাযুজ্যরূপে মুক্তি দান করেন । কামাখ্যা, ক্ষেত্রপাল, বিমলাদেবী এই অন্তর্বেদীতে অবস্থান করিতেছেন । কল্লপাদপ মধ্যস্থিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহদেব এবং বিমলাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিলে সর্বপাপ ক্ষয় হয় । এই নৃসিংহদেবের সম্মুখে মুক্তিমণ্ডপে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয় । এই অন্তর্বেদীরক্ষার্থ অষ্টশক্তি প্রকল্পিতা হইয়াছেন । সেই সকল শক্তিকে ভগবান বিষ্ণু মহাদেবের পত্নীরূপে সৃষ্টি

পুরুষোত্তম ।

করেন এবং ভগবানের শরীরের সমগ্র সৌন্দর্য্য ঐ সকল শক্তিকে অর্পণ করেন । শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রীতি নিমিত্ত দেবী ভগবতী অষ্টমূর্তি ধারণ করিয়া এই অস্তর্বেদী রক্ষা করিতেছেন । ঐ অষ্ট-শক্তি, যথা :—বটমূলে মঙ্গলা, তৎপশ্চিমে বিমলা, পূর্বভাগে সর্ব-মঙ্গলা, অর্দ্ধাশনী, লম্বোদেবী, দক্ষিণে কালরাত্রী, তৎপূর্বে মরীচিকা, এবং তৎপশ্চাতে চণ্ডদেবী অবস্থিতা আছেন । ভগবতীকে অষ্ট-মূর্তি ধরিতে দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি মহাদেব অষ্ট-রুদ্র হইয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ঐ অষ্ট রুদ্রের নাম যথা—কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, এবং বটেশ্বর । এই অষ্টলিঙ্গ পূজা ও দর্শন করা একান্ত কর্তব্য । অষ্টরুদ্র দর্শন ও পূজনে মুক্তি লাভ হয় । (১)

এই স্থান উড়িষ্যা প্রদেশে পুরী জেলার অন্তর্গত এবং সমুদ্র-তটে অবস্থিত ।

হাওড়া হইতে পুরী ট্রেন (৩১১) তিন শত এগার মাইল ভাড়া (৪/০) চার টাকা এক আনা । ডাক গাড়ীর ভাড়া (৪৮/০) চার টাকা চৌদ্দ আনা । হাওড়া হইতে (১৭) সতের ঘণ্টায় ডাকগাড়ী পৌঁছায় । আমরা সাক্ষিগোপাল হইতে (৮/১০) আড়াই আনায় পুরী ট্রেনের টিকিট লইয়া ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিলাম । ট্রেনে পৌঁছামাত্রই খোদ পাণ্ডার গোমস্তাগণ উপস্থিত হইয়া

(১) এই অংশ শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব এবং জগন্নাথ মাহাত্ম্য দৃষ্টে লিপিত হইল । বাহলা বোধে শাস্ত্রীয়বচন পরিভাষ্য হইল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

যাহার যে পরিচিত যাত্রী তিনি তাহাকে লইয়া যান । অপরিচিত নূতন যাত্রী লইয়া অপর গোমস্তাগণ মহাগোলযোগ করিয়া যাত্রিগণকে বিরক্ত করিয়া তুলে । যাত্রিগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উহাদের মধ্যে যে যাহাকে ইচ্ছা পাণ্ডা স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে চলিয়া যায় । হীনাবস্থ দরিদ্র যাত্রিগণ কোন পাণ্ডা স্বীকার না করিয়া ধর্মশালার আশ্রয় লইতে পারেন । এই পুরী সহর মধ্যে অনেক গুলি ধর্মশালা আছে ; তন্মধ্যে কানাইয়া লাল বগলা কর্তৃক স্থাপিত ধর্মশালাই প্রশস্ত ও পরিস্কৃত এবং পরিবারাদি লইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান । অনেক ভদ্রলোকেই ঐ স্থানে থাকেন । এতদ্ভিন্ন সহর মধ্যে বহুতর ভাড়াটিয়া যাত্রী-নিবাস আছে । সে সকলগুলি এক্ষণে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি থাকায় অতি পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের জন্ত যাত্রিগণের ভাড়া অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে । দোলযাত্রা ও রথযাত্রায় বহুতর যাত্রীর সমাগম হওয়ায় ঐ সকল গৃহের ভাড়া জন প্রতি (৩) তিন টাকার ন্যূন নহে ।

আমরা ষ্টেশন হইতে পশ্চিম মুখে প্রশস্ত সড়ক পথে এক মাইল পথ আসিয়া ভগবানের রথখোলা বা গুণ্ডীচা বাড়ীর প্রশস্ত সড়ক রাস্তা পাইলাম ; এই রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিলাম । এই প্রশস্ত দীর্ঘ পথের উভয়পার্শ্বে ধর্মশালা, পণ্যশালা, ডাক্তারখানা, রাজভবন প্রভৃতি সৌধসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে । আমরা ঐ সকল সৌধশোভা দর্শন করিতে করিতে উভয় শ্রেণীর মধ্য পথ দিয়া অনুমান এক মাইল

পুরুষোত্তম ।

যাইয়া ভগবানের সিংহদ্বারে উপনীত হইলাম ; এবং তথা হইতে ভগবানকে প্রণাম পূর্বক ফিরিয়া আসিয়া সহর মধ্যে স্থায়ী পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইলাম । খোদপাণ্ডা আমাদিগকে দৃষ্ট মাত্রেই প্রসাদকণিকা প্রদান দ্বারা পরম আপ্যায়িত করিলেন । তৎপর সহর মধ্যে বাসা ভাড়া (এক পক্ষ কালের জন্য প্রতিজন ৩ তিনটাকা হিসাবে) করিয়া থাকিয়া কার্য্য সকল ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করিলাম ।

এই স্থানের প্রধান কার্য্য জ্ঞান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেব দর্শন, ভোগ প্রদান, মহোৎসবদান, প্রসাদভক্ষণ, আটকা বন্ধন এবং ধ্বজাবন্ধন । যাত্রীগণের শক্ত্যুসারে প্রতিজনে বা বহুযাত্রী একত্রিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন । একত্রিত হইয়া কার্য্য করিলে ব্যয় অনেক কম হয় । এই স্থানে উপনীত হইয়া যাত্রীগণের প্রথমতঃ মহোদধিতে অর্থাৎ সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক জ্ঞান করাই বিধি ; কিন্তু লবণাক্ত জলে শরীর পীড়িত হইবার সম্ভাবনা বিবেচনায় পাণ্ডাগণ এই কার্য্য পুরীর কার্য্যান্তে করাইয়া বিদায় দেন । এই জন্য প্রথমেই ভগবানকে দর্শন করিবে । সহরের মধ্যেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির । উচ্চে (১২৬) এক শত ছাব্বিশ হাত এবং (২৮) আঠাইশ হস্ত বিস্তৃত । চূড়ার উপরে অষ্টধাতু নির্ম্মিত প্রকাণ্ড নীলচক্র, তদুপরি ধ্বজপতাকা পরিশোভিত । বহুদূর হইতে চূড়ার অপূর্ব শোভা দৃষ্ট হয় । এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন প্রণালীতে ভারতের স্থাপত্য বিদ্যার চরম উন্নতির নিদর্শন দৃষ্ট হয় । প্রধান পাণ্ডার নিকট শুনিলাম ১১১৯ শকে নরপতি অনঙ্গভীম এই

তীর্থ-কাহিনী ।

মন্দির নির্মাণ করেন । তৎপ্রমাণ রত্নবেদী প্রদক্ষিণ কালে শ্রীমূর্তির পশ্চাৎভাগে মন্দিরগাত্রে একটি শ্লোকে (১) দেখিতে পাইলাম । মন্দিরের চতুর্দিকে উন্নত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি দিকেই চারিটা স্তম্ভ দ্বার । পূর্ব দ্বারে প্রস্তর (ক) নির্মিত সিংহদ্বয় থাকায় উহাকে সিংহদরজা বলে । এই দ্বারের অদূরে পুরোভাগে একটি অরুণস্তম্ভ—বেলিংদ্বারা চারিদিক বেষ্টিত আছে । প্রথমতঃ এই স্তম্ভকে পরিক্রমণ পূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হয় ; তৎপরে সিংহদ্বার পার হইয়া কএকটি সোপান অতিক্রম করিয়াই আর একটি দরজা পার হইতে হয় । এই দ্বিতীয় দ্বারে প্রবিষ্ট হইবার সময় দক্ষিণ দিকে একটি গেট দেখা যায় ; এই গেট পার হইলেই আনন্দ বাজার । পূর্বোক্ত দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রান্ত হইয়া সম্মুখে ভোগ-মন্দির । এই ভোগ-মন্দির বাম দিকে রাখিয়া উত্তরমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ গমনানন্তর পশ্চিম মুখে যাইয়া বামভাগে উত্তর দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পর ভগবানের সম্মুখস্থ ভোগ মন্দিরের নিকট গুরুডস্তম্ভ প্রণাম পূর্বক আলিঙ্গন করিতে হয় । তৎপর ভগবানের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার রত্নবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া রত্নবেদিকাঙ্কিত দারুব্রহ্মরূপী

(১) শকাব্দে রক্ষ স্তম্ভান্ত রূপে নক্ষত্রনারিকে ।

প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা ॥

(ক) কেহ কেহ বলেন মুখ্য গঠিত সিংহ ।

পুরুষোত্তম ।

ভগবানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ * বলরাম + সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র †
মূর্তি চতুষ্টয় দর্শন ও প্রণাম করিয়া বেদীর চতুর্দিক তিনবার
প্রদক্ষিণ পূর্বক পরিভ্রমণ করিতে হয়। সুদর্শন চক্র
জগদীশ্বরের বাম ভাগে রক্ষিত। ভগবানের ললাটে হীরক ফলক
আছে—তজ্জ্যোতি দর্শনীয়। দর্শন ও বন্দনান্তে স্তবাদি করতঃ
আত্ম নিবেদন পূর্বক মস্তকে নির্মালা ধারণ ও চরণামৃত পান
করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীনাথের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ
করা কর্তব্য। তৎকালে কল্পবট প্রণাম, আলিঙ্গন ও স্পর্শ
করিয়া তমূলস্থ সত্যনারায়ণ, গালরাজার রাধাকৃষ্ণ, রাধামাধবের
যুগল রূপ, নৃসিংহদেব, মুক্তিমণ্ডপ, রোহিণীকুণ্ড, বিমলাদেবী,
সত্যভাষা ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি মূর্তি সকল পৃথক পৃথক মন্দিরে
দর্শন ও প্রণাম এবং অর্চনা করিতে হয়। রোহিণীকুণ্ডের জল পান
ও শিরে অভ্যঞ্জন করিয়া লওয়া উচিত। ঐ কুণ্ড কল্পপাদপের
পশ্চিমে বিমলাদেবীর সম্মুখ ভাগে নৃসিংহদেবের নিকট দৃষ্ট হইবে।
তৎপর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ কর্তব্য।

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্যং ।

ভক্ষণান্নাদ্যপানাদি মহাদূরিতনাশনং ।

আত্মাণাম্মানসং পাপং দর্শনাদৃষ্টিজন্তুথা ॥

তীর্থ-কাহিনী ।

আশ্বাদাদ্বাকৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপোহতি ।
স্পর্শনাদ্বাকৃতং পাপং মিথ্যালাপকৃতন্তথা ॥
গাত্রলেপাদহেৎ পাপং শারীরং বৈ ন সংশয়ঃ ।
কুকুরস্ত মুখভ্রষ্টং মমাম্মং যদি জায়তে ॥
ব্রহ্মাদৈরপি তদুক্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে ।
শুষ্কং পয়ূষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ ॥
দুর্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্বমেবাদ্যনাশনং ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্তব্যা বিচক্ষণৈঃ ॥
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহং তত্রান্নমগ্রজৈঃ ॥
সান্ধাদ্বিসুৰ্য্যতস্তত্র চণ্ডালোহপি দ্বিজোহপি চ ।
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দিনঃ ॥
তস্মাদ্ভদ্রমং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভং ।
হরিভুক্তঞ্চাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভং ॥
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্যা স্তেষাং মুক্তির্ন দুর্লভা ।
ব্রহ্মাদ্যাদ্বিদশাঃ সৰ্ব্বৈ তদন্নমতি দুর্লভং ॥
ভুঞ্জন্তে অগত্যা নিত্যং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥

(জগন্নাথ মাহাত্ম্য ও শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব)

অর্থাৎ

মহাপ্রসাদ ভক্ষণে সুরাপানাদি জনিত মহাপাপ দূর হয় ।

মানসিক পাপ—মহাপ্রসাদ আশ্রমে সে পাপের বিনাশ হয় । চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি জনিত যে পাপ হয়, মহাপ্রসাদ দর্শন করিলে তাহা দূর হয় । বাক্য এবং কণ্ঠ দ্বারা যে সকল পাপ হয় মহাপ্রসাদের স্বাদ গ্রহণে সেই সকল কলুষ নাশ হয় । শ্রবণ দ্বারা যে পাপ হয়, মহাপ্রসাদ স্পর্শে তৎপাপ শাস্তি হয় । শরীর দ্বারা যে কোন শারীরিক পাপ হয়, মহাপ্রসাদ শরীরে লেপন করিলে তৎপাপ বিনাশ হয় । কুকুর মুখলষ্ট মহাপ্রসাদ যদি ব্রহ্মাদি দেববৃন্দও প্রাপ্ত হন তবে তাঁহারাও সেই মহাপ্রসাদ পরমানন্দে ভক্ষণ করতঃ মহাসৌভাগ্য বোধ করেন । শুক অথবা পয়ূষ্মিত বা দূরদেশে নীত কিম্বা অম্পৃশ্য দুর্জ্ঞান কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না । সেই প্রসাদ ভক্ষণেও মহাপাপ সকল বিনষ্ট হয় । চণ্ডালস্পৃষ্ট বলিয়া কিছুমাত্র বিচার করিবে না, যেহেতু এই ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র সকলেই বিষ্ণুতুল্য হয় । যে অন্ন পাক হয়, লক্ষ্মী স্বয়ং তাহা পাক করেন এবং স্বয়ং বিষ্ণু তাহা ভোজন করেন এবং এইজন্ত সেই মহাপ্রসাদ দেবগণও দুর্লভ বোধ করিয়া থাকেন । সুতরাং সেই মহাপ্রসাদ, যে মানব ভক্ষণ করে সে যে অনায়াসেই মুক্তি পাইবে তাহার আর সন্দেহ কি ? মানবের কথা কি—ব্রহ্মাদি অমরগণও প্রসাদ ভক্ষণাশায় নিত্যই আগমন করিয়া থাকেন ।

অতি প্রত্যুষ হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত ছাপ্পান ভোগ হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে তিন ধূপ অর্থাৎ ভোগের সময় ধূপ দান ও পাঁচ বিশ্রাম ব্যবস্থা আছে । প্রাতে জলপানী অর্থাৎ

তীর্থ-কাহিনী ।

মুড়কী, বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি দ্বারা বাল্যভোগ হইয়া বেলা দশটার মধ্যে খিঁচুড়ি, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি দ্বারা রাজভোগ হইয়া থাকে । তৎপর বারটার মধ্যে অন্ন, ব্যঞ্জন, দাইল, তরকারী প্রভৃতি বহুবিধ উপকরণে সত্রভোগ হইয়া থাকে । এই ভোগের প্রসাদ আপামর সাধারণ সকলেই আনন্দবাজারে খরিদ করিয়া থাকে । সন্ধ্যার সময় আরতি অস্ত্রে লুচি, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি দ্বারা বৈকালী হইয়া আবার রাত্রি দশটার মধ্যে পুনরায় অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ হইলে পর, ভোগের কার্য্য হইয়া শেষ হয় । প্রতিবারের ভোগেই রাজার প্রদত্ত রাজভোগ হইয়া পরে, প্রসাদ বিক্রেতাদিগের সাধারণ ভোগ হইয়া থাকে । মোটা চাউল হইতে অতি সূক্ষ্ম চাউলের অন্নের ভোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । সমস্ত ভোগের পাক দ্রব্যই আটকা সহিত ভোগ হইয়া সেই অবস্থাতেই আনন্দবাজারে লইয়া সাধারণের নিকট বিক্রীত হয় । প্রসাদের ভারতম্যানুসারে এবং যাত্রীর সংখ্যানুসারে মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে । যাত্রীগণ এই আনন্দবাজারেই প্রসাদ ক্রয় করিবেন ; বাহিরে কোথায়ও কখন প্রসাদ ক্রয় করিবেন না । অতঃপর পঞ্চ তীর্থ করিবেন ।

পঞ্চতীর্থ ।

মার্কণ্ডেয়ে বটকৃষ্ণং রোহিণ্যাঞ্চ মহোদধৌ ।

ইন্দ্রদুম্নে কৃতে স্নানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

অর্থঃ

মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান, বটকৃষ্ণ দর্শন, রোহিণীকুণ্ডের জল

পুষ্কযোত্তম ।

স্পর্শন, ও মহোদধি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ।

পূর্ব দিবস মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া রাখিতে হয় । পর দিবস প্রাতে ঐ প্রসাদে ঘৃত, মধু, গুড়, তিল, কদলী মিশ্রিত করিয়া খোদ পাণ্ডার একজন ছড়িদারকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ মার্কণ্ডেয় সরোবরে উপস্থিত হইতে হয় । ঐ সরোবরটী শ্রীমন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী । ইহার চতুর্দিক সোপানাবলী দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । পুষ্করিণীটী যে অতি প্রাচীন কালের খনিত তাহা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমীতে এই স্থানে যাত্রা হইয়া থাকে । আমরা ঐ মার্কণ্ডেয় সরোবরে উপনীত হইয়া পিণ্ডদান করিলাম । মার্কণ্ডেয়ে, ইন্দ্রদ্যুয়ে এবং মহোদধিতে মহাপ্রসাদাদি দ্বারা পিণ্ড দিতে হয় ; তজ্জন্য তথাকার রাজা প্রতিষাট্রীর নিকট হইতে (১০) চারি আনা হিসাবে (৮০) বার আনা লইয়া একখানা রসিদ দিয়া থাকেন । অপর স্থানে ঐ রসিদ দেখাইয়া পিণ্ড দিতে হয় । পিণ্ডদানের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে পৃথক (৮০) ছই আনা দিলেই তিনি সঙ্গে থাকিয়া মন্ত্র বলিয়া পিণ্ডদান করাইয়া থাকেন । মার্কণ্ডেয় সরোবরে পিণ্ডদানান্তর দক্ষিণ তটে মন্দির মধ্যে মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করা কর্তব্য । তৎপর তথা হইতে দক্ষিণে প্রায় ছই মাইল দূরে সহরের মধ্য দিয়া মহোদধিতে বাইতে হয় । যাইবার সময় পথিমধ্যে শ্বেতগঙ্গা নামে সরোবরে স্নান, তর্পণ এবং তন্ত্রীয়ে শ্বেত-মাধব দর্শন করিয়া বাইতে হয় । এই সরোবরটী শ্রীমন্দিরের

তীর্থ-কাহিনী ।

নিকটস্থ একটা গলির মধ্যে অবস্থিত । ইহারও চতুর্দিক প্রস্তর সোপানাবলী দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । জল অতিশয় মলিন,— দুর্গন্ধময় । ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ইহার জল স্পর্শবিধি মনে করিয়া স্নান করিয়া থাকেন । তৎপর মহোদধিতে স্নান এবং তর্পণান্তে তন্তীরে পিণ্ডদান করিয়া, তথা হইতে এক মাইল বালুকাময় সমুদ্রতীর অতিক্রম করিলেই সমুদ্রতীরস্থ বালগুণ্ডীনালা পার্শ্বে অবস্থিত চক্রতীর্থ নামক স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই স্থানেই দারুব্রহ্ম ভাসমান ছিলেন ; ইহার উৎপত্তি সমুদ্র হইতে হইয়াছে । বালুকাময় ভূমি দ্বারা এই স্থানকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে । ভগবানের এমনই মহিমা যে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবধানেই ইহার জলের স্বাদ সমুদ্রজল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । জল অতি সুস্বাদ । এই তীর্থের উপরিভাগে মন্দির মধ্যে শ্রীচক্রনারায়ণ মূর্তি বিরাজিত আছেন । এই স্থানে বালুকা দ্বারা পিণ্ডদানান্তর শ্রীচক্রনারায়ণ দর্শন ও প্রণাম করিতে হয় । তথা হইতে উত্তরমুখে দুই ক্রোশ গমন করিলে গুণ্ডিচা বাড়ী পাওয়া যায় ; এই বাড়ীর পশ্চিমভাগে ইন্দ্রদ্বায় সরোবর । ইহা দীর্ঘ প্রায় (৩২৫) তিন শত পঁচিশ হস্ত, প্রস্থে প্রায় (২৬৫) দুই শত পয়ষড়ি হস্ত । মহারাজা ইন্দ্রদ্বয়ের নামানুসারেই ইহার নাম হইয়াছে । এই সরোবরে স্নান, তর্পণ এবং মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ডদান করিলেই পঞ্চতীর্থ কার্য্য শেষ হয় । এই পঞ্চতীর্থ কার্য্য শেষ করিয়া প্রায় বারটার পূর্বে বাসায় আসা যায় না । একদিনে অশক্ত হইলে দুই দিনে ঐ কার্য্য করিতে পারা যায় ।

পুরুষোত্তম ।

তৎপর আটিকাবন্ধন । ভগবানের ভোগ দেওয়াকে আটিকা-
বন্ধন বলে । এতৎ কার্য যাত্রিদিগের অবস্থানুসারে ইচ্ছাধীন
হইয়া থাকে । যাত্রিদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া ভগবানের
তহবিলে জমা হয় ; তাহার সুদ হইতে প্রতিদিন শ্রীশ্রী ৬জগন্নাথ
দেবের ভোগ হইয়া থাকে, উহাতেই ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়,
ইহারই নাম আটিকা বন্ধন । টাকার পরিমাণে ভোগের তারতম্য
হইয়া থাকে । ৬জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উত্তরদিকে অস্তঃপ্রাঙ্গণ
পার হইয়া একটি দ্বিতল গৃহে আটিকাবন্ধন হয় । খোদ পাণ্ডা
স্বয়ংই যাত্রীর সঙ্গে যাইয়া এই কার্য করাইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ
ভোজন ও মহোৎসব দিতে হইলে খরচের টাকা পাণ্ডাদের বা
গোমস্তার হাতে না দিয়া স্বয়ং আনন্দ বাজার হইতে মহাপ্রসাদ
খরিদ করিয়া আনিয়া উক্ত কার্য করিলেই ভাল হয়, নচেৎ
পাণ্ডাদের হাতে টাকা দিলেই উহারা সিকি অংশ আত্মসাৎ করিয়া
থাকে । তৎপর কিছুকাল তথায় থাকিয়া অন্যান্য দেবদর্শনাদি
কর্তব্য । খোদ পাণ্ডার ছড়িদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দর্শন
করাইয়া থাকে ।

সমুদ্রতীরবর্তী শঙ্কর বা গোবর্দ্ধন মঠ । এই স্থানটিকে
বালুসাহী বলে । শঙ্করাচার্য্যকৃত মঠ চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা অন্ততম মঠ ।
মঠের অভ্যন্তরে শঙ্করাচার্য্যের (১৮) অষ্টাদশ বৎসর বয়সের একটি
শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সৌম্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । এই মঠ শঙ্কর
মতাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসীর নিকট অতি প্রসিদ্ধ । আমরা দর্শন করিয়া
মূলকদাসের মঠে যাইয়া তাহার টুকরা প্রসাদ খাইলাম । তথা

তীর্থ-কাহিনী ।

হইতে শুরু নানক বাউরিতে যাইয়া জলপান করিতে হয় । তৎপর বকুল বৃক্ষতলে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম এবং টোটা গোপীনাথ বিগ্রহের অঙ্গ মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবেশ করিয়া লয় প্রাপ্ত হন ; বাহুতে তচ্ছিন্ন প্রকটিত আছে । ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা অন্বেষণার্থ লঙ্কাভিমুখে গমনকালে নীলাচলের পশ্চিমস্থ এক মাইল দূরে শবরদিগের বনमध्ये অবস্থান সময়ে শিবলিঙ্গ অভাবে শবর প্রদত্ত অলাবু স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন ; এতদ্ব্যতীত শিবের নাম লাউকনাথ বা লোকনাথ ।* তথায় হরপার্বতী মূর্তি স্থাপিত আছে । এই স্থানে শিবরাত্রী সময়ে মেলা হয় । এই স্থানে গমন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ উদ্যান মধ্য দিয়া যাইতে হয় । উদ্যানের সম্মুখে একটা পুষ্করিণী আছে ; তাহার নাম পার্বতী সরোবর । এই সরোবরে স্নান করিতে হয় ; তৎপর প্রাচীরবেষ্টিত লোকনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় । কিন্তু প্রকৃত লোকনাথ দর্শন পাওয়া কষ্টসাধ্য, কেন না মন্দিরভিত্তরে ইনি সদাসর্বদা জলে নিমজ্জিত আছেন । বৎসরান্তে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে ক্ষণকালের জন্য ইহার দর্শন পাওয়া যায় । ইহার প্রতিনিধি

* পরে দেখা গেল যে, মূল বাঙ্গালিকির রামায়ণে—সীতা-অন্বেষণে রামচন্দ্রের লঙ্কাভিমুখে গমন কালে নীলাচলের দিকে যাইবার কোন কথা নাই । এবং রামায়ণে উল্লিখিত লঙ্কা আধুনিক লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল নহে । বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত মূল রামায়ণ এবং সংসার নামক মাসিক পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) বেদান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয়ের লিখিত ‘প্রাচীন ভূগোল’ নামক অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ জড়িত ।

লোকনাথ আছেন, তাঁহারই প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে । যাত্রিগণ তাঁহারই দর্শন পায় ।

জগদীশ্বরের মন্দিরের উত্তরে অর্দ্ধমাইল দূরে চন্দন সরোবর নামে একটি সরোবর আছে । তথায় জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি দ্বারা চন্দন যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে । বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় উক্ত উৎসব সম্পন্ন হয় । এইস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একটি বাগান আছে ; উহা জগন্নাথবল্লভ নামে খ্যাত । পুরীর পূর্বতন অধিবাসী কোন রাজা ভ্রম ক্রমে বামহস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণকরায় ক্ষোভে স্থায় হস্ত ছেদন পূর্বক প্রাৰ্শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । জগদীশ্বরের কৃপায় ঐ কর্তৃত্ব হস্ত দোনা (১) র আকারে বৃক্ষরূপে দৃষ্ট হয় ।

পুরী হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে পূর্বদিকে চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্য দেবের মন্দির আছে—তাহাকে কোণার্ক বলে । মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ঐ চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্র-গর্ভোথিত সূর্য্যদেবের উদয় দর্শন করিতে হয় ।

সাধারণতঃ উৎকলকে ওড়দেশ বা উড়িষ্যাদেশ বলে । ঐ দেশবাসীদিগকে উড়িয়া বলে । পূর্বে ইহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল ; এক্ষণে অনেকটা সভ্য হইয়াছে । উহারা ভাষা যে ভাবে উচ্চারণ করে তাহাতে বিবেচনা হয় যে উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু তাহা নহে ; উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই রূপা-

(১) কদলী বৃক্ষত্বক্ দেহভেদে খোল, ঠোলা, ঠোঙা, ডোঙ্গা, দ্রোণী ইত্যাদি নামে অভিহিত হয় ।

তীর্থ-কাহিনী ।

স্তর মাত্র । উহারা হলন্ত শব্দকে স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করে, আর দ্রুত বলে বলিয়া বুঝা যায় না । ফলতঃ কিছুকাল উহাদের সহিত কথা বার্তা বলিলে তখন বেশ জানা যায় যে বাঙ্গালা ভাষার সহিত উড়িয়া ভাষায় পনেরো আনা ঐক্য আছে । বাঙ্গালা ও উড়িয়া— উভয় ভাষাই সংস্কৃত মূলক । উৎকলবাসীরা প্রায়ই কৃশ, দুর্বল, মুখ, বর্ষর ও নৃশংস । উহাদের মনে কিছু মাত্র ঘৃণা বা অভিমান নাই । অর্থের লোভে অনায়াসে সকলেই সকল কাজ করিয়া থাকে, ভ্রাতৃবিয়োগে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে । এই দেশে হীনাস্র, বিকলাস্র, অধিকাস্র, শ্লীপদ, কোরঙ, ও গল-গণ্ডযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও এখনও নিতান্ত কম নহে । এ দেশে হীনাবস্র দরিদ্রই অধিক । পাণ্ডারা যাত্রীরসহিত পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে তত অসম্ভাবহার করেন না । ইহারা তাম্রকূটের ধূমপান করেন না কিন্তু তৎপরিবর্তে সততই পান ও দোক্তা খাইয়া থাকেন এবং পিকার ধূমপান করিয়া থাকেন । স্থান-বাসী সকলেই আমিষভোজী ; নানাপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য বাজারে বিক্রীত হয় । তরী তরকারী, শাকসব্জি ফল মূল প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায় । ছন্ধ, ঘৃত, লুচি, জিলিপি, রসগোল্লা এবং দেশীয় অন্যান্য সন্দেশ পাওয়া যায় । সহরটি মন্দ নহে ; প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্তই পাওয়া যায় । সহরের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে জেলা । জেলাটি মন্দ নহে ; মুনসেফী আদালত, জজ আদালত, ফৌজদারী আদালত, স্কুল, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক্তারখানা প্রভৃতি সকলই আছে । সমুদ্রকূলের বায়ু ভাল ।

অনেক বাঙ্গালী বাবু হাওয়া পরিবর্তন জন্য এখানে আসিয়া থাকেন । সমুদ্রে স্নান ও সামুদ্রিক বায়ু সেবন শ্লেষ্মা প্রধান রোগীর হিতজনক । যে কয়েক দিন ছিলাম সমুদ্রবায়ুসেবন ও দেবদর্শন করিয়া বেড়াইতাম এবং রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাইবার সহযাত্রী অনুসন্ধান করিতাম । এই অনুসন্ধানফলে রামেশ্বর যাইবার পথিমধ্যে অনেক তীর্থের অনুসন্ধান পাইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্গী জুটিল না । তথাপি যাইবার সংকল্প স্থিরই আছে । যাইবার দুই দিবস পূর্বে হঠাৎ আমাদের দেশস্থ জনৈক কায়স্থ যুবক বুটিয়া গেল—নাম ভীমদাস । সেতুবন্ধ গমনের ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থের অনাটন জন্য যাইতে পারে নাই । এজন্য আমি তাহার যাতায়াতের অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গী করিলাম । এক্ষণে আমরা তিনজন হইলাম ; যাইবার আর বিশেষ চিন্তা থাকিল না ।

আমরা শ্রীক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া পুরী হইতে খুর্দা রোডে আসিয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে গাড়ীতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম । প্রথমতঃ পাদগয়ার কার্য্য করার জন্য পিঠাপুর ষ্টেশনের টিকিট লইলাম । পথিমধ্যে নৃসিংহজী দর্শনার্থ সিংহাচল ষ্টেশনে নামিলাম ।

নৃসিংহজী ।

শাস্ত্রে কথিত আছে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কর্তৃক নৃসিংহজী স্থাপিত । দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুকে নিধনাস্তে তৎপুত্র প্রহ্লাদকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষেক করিয়া ভগবান এই নৃসিংহাচলে আসিয়া অবস্থিতি

তীর্থ-কাহিনী ।

করেন । প্রহ্লাদ রাজ্য ভোগান্তে স্বীয় বার্কিক্য দশা উপস্থিত দেখিয়া, পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া তপস্কার্থে গমন করেন । বহুস্থান পরিভ্রমণান্তে অবশেষে এই স্থানে আগমন করতঃ নরসিংহরূপে হরিকে দর্শন করিয়া তাঁহারই তপস্কার্থ নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই আদেশ মত এক মন্দির প্রস্তুত হয় । কালক্রমে অরণ্যাবৃত হইলে কলিযুগে চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুষোত্তম এই মন্দির আবিষ্কার করেন এবং সেট হইতে লোক সাধারণের গোচর হয় । তদবধি এই স্থান প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে । শাস্ত্রে আরও কথিত আছে যে এইখানে অস্ত্রঃসলিলা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম আছে, সুতরাং স্থানটী অতি পবিত্র পুণ্যতীর্থ ।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেল সিংহাচল ষ্টেশন (৫৪২) পাঁচশত বিয়াল্লিশ মাইল—রেল ভাড়া (৭/০) সাত টাকা এক আনা । পুরী হইতে ভাড়া (৩) তিন টাকা । খুর্দারোড জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া যাইতে হয় ।

আমরা পশ্চিমধো বরহামপুর জেলা ষ্টেশনে নামিয়া, আহালাদি-করতঃ রাত্রির গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া, পর দিবস মধ্যাহ্নকালে সিংহচালম ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম ।

ষ্টেশনের তিন মাইল দূরে পর্বতপার্শ্বের অস্তুরালে একটি সাধারণ বাজার এবং ধর্মশালা ও নৃসিংহজীর কাছারী আছে । তথাতে অবস্থিতি করা যায় । নৃসিংহজীর (৮০০) আটশত ফুট উচ্চ পর্বতো-পরি—আরোহণ জন্য (৭০০) সাত শত সোপানবলী আছে । আমরা ধর্মশালায় তাড়াতাড়ি আহালাদি করিয়া পর্বতারোহণ করিলাম ।

পুরুষোত্তম ।

পর্বতের মূল দেশের বহু দূর হইতে প্রশস্ত সোপানাবলী । আমরা সেই সোপানশ্রেণী দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহুদূর উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম । সূর্য্যদেব ক্রমে অন্তঃগমন করায় তমসাবৃত হইয়া সন্ধ্যা দেখা দিলেন । আমরা অপরিচিত স্থানে আসিয়া অন্ধকারে কষ্ট পাই এবং ভগবদর্শনে যাইতে কষ্ট হয় বলিয়াই যেন কুমুদিনীনায়ক চন্দ্রদেব আকাশে দর্শন দিয়া আমাদের গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিতে লাগিলেন । আমরা প্রায় শিখর সমীপস্থ হইয়াছি এমন সময়ে নির্জনপ্রদেশে নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রুতিমধুর শঙ্খ, ঘণ্টা, তুন্দুতি প্রভৃতির ধ্বনি যুগপৎ ক্রতিবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দোৎসাহবর্ধন করিতে লাগিল । আমরা তচ্ছবণে বিমুগ্ধ হইয়া ক্রতগমনে পর্বতারোহণ করিলাম । উপরে উঠিয়া দেখিলাম পর্বতোপরি একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম । প্রশস্ত পথের উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত হওয়ায় নমন্যভিরাম বলিয়া বোধ হইল । আমরা ঐ গৃহশ্রেণীর মধ্যস্থ পথ দিয়া পূর্বোক্ত শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি অনুসরণ করিয়া কিয়দূর যাইয়াই ত্রীত্রীংনৃসিংহজির প্রকাণ্ড মন্দির প্রাপ্ত হইলাম । মন্দিরের চতুর্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত । প্রাচীর গাত্রে প্রধান দরজা দিয়া প্রাঙ্গণ মধ্যে উপস্থিত হইলাম । প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির । দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে চারি অংশে গঠিত । গর্ভ গৃহের অভ্যন্তরে টোপরাচ্ছাদিত হইয়া নৃসিংহদেব বিরাজিত আছেন । ইহার স্বরূপ মূর্তি দর্শনের উপায় নাই । পূর্বে অনাচ্ছাদিত থাকিতেন । কোন কারণ বশতঃ আদেশ করিয়া আপনি আচ্ছাদিত হইয়াছেন । বৈশাখ মাসের

তীর্থ-কাহিনী ।

অক্ষয় তৃতীয়া দিবস একদিন মাত্র এই টোপরাক্ষাদন উদ্ঘাটিত হয়, তখন সকলেই স্বরূপ মূর্তি দর্শন করিতে পারে । ঐ দিনে বহুতর যাত্রী সমাগম হওয়ায় তখন একটা মেলা বসে ।

দেখিলাম ভগবানের মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারদেশে পূজক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছেন । সমস্ত মন্দিরটা দীপালোকে আলোকিত । পূজারীর পশ্চাৎগে নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে নর্তকীগণ ভজন সংগীত গাইতে গাইতে নৃত্য করিতেছে । মৃদঙ্গ, মন্দিরা মিলাইয়া ভজনগান হইতেছে । পুরদ্বারদেশে অতি সুশ্রাব্য সানাই ও রসানচৌকীর বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে । আমরা এমন সময়ে তথায় উপনীত হইয়া অতিব আনন্দ লাভ করিলাম ; এবং তখন মনে হইল এ কি ইন্দ্রের অমরাবতী ? পর্বতাভ্যন্তরে এমন স্থান, এত আনন্দ, —ইহা কখন কল্পনাও করি নাই । গায়িকাগণেরই বা কি মনোহর রূপলাবণ্য ! কণ্ঠস্বরেরই বা কত মাধুর্য্য ; আ মরি !! মরি !! কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ! দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই পথে আইসা এইখানেই সার্থক বোধ করিলাম । কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই । চন্দ্রে শীতলতাও আছে—কলঙ্ক কালিমাও আছে । সূর্য্যে আলোকও আছে—রোগজননতাও আছে । মধুতে মিষ্টতাও আছে—তীব্রতাও আছে । তাই বলি জগতে সম্পূর্ণ সুখ কিছুতেই নাই । এই মধুরহাসিনী মধুরভাষিণী মনোমোহিনী সিংহাচলবাসিনী কামিনীগণের সঙ্গীত বুঝিতে না পারাই মহৎ দুঃখ । বুঝিবার চেষ্টা করিলেও বুঝাইবার কোন লোক নাই । দেশ তৈলঙ্গ সূতরাং ভাষাও তৈলঙ্গী, কাজে কাজেই দেখা শুনা ভিন্ন কথা বুঝিবার সাধ্য নাই ।

পুরুষোত্তম ।

সেতুবন্ধাদিকে যতই অগ্রসর হইতেছি ততই জীয়াধীনতার আভাস দেখিতেছি । শঙ্কর, শান্তডী, ভাস্কর, স্বামীর সহিত জীলোকের প্রকাশভাবে কথাবার্তা চলিতেছে । সধবাগণ মস্তকে বজ্রাঞ্চল বা অন্য কোন আবরণ কিংবা ঘোমটা দেয় না ; কেবল বিধবাগণ কেশভীন মস্তক অঞ্চলদ্বারা আবৃত রাখে । পরিধানে প্রায়ই লাল বা কাল বসন । পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল পশ্চাৎ দিক দিয়া উঠাইয়া কাছবৎ ব্যবহার করে । অপর অঞ্চল দক্ষিণ দিয়া উঠাইয়া বাম কন্বোপরে লইয়া সম্মুখস্থ কটিদেশে বন্ধন করে । পরিধান বস্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য বা পিত্তল নির্মিত কোমরবন্ধ দ্বারা বন্ধ থাকায় কটিদেশ ক্ষীণ দেখায় । কাঁচুলী দ্বারা অঙ্গ আবৃত । হস্তদ্বয়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যময় নিরেট ছুইগাছি অঙ্গুলিপ্রমাণ মোটা বলয় বা চুড় । গলদেশে কদাচিৎ চিকু বা গোপহার, কর্ণে মাত্র কুণ্ডল । মাথার বেণী নানাবিধ ফুল দ্বারা পরিশোভিত । পদদ্বয়ে কদাচিৎ বাঁক । সকল জীলোকেই সুন্দরী হইবার জন্ত গায়ে হলুদ মাখে, এবং প্রায়ই বিদ্যাবতী ; ইহারা মস্তক নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিতে জানে না ; কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে নামিয়া গাত্রমার্জন ও ধৌত করিয়া থাকে ।

সে যাহা হউক, আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া সংগীত শুনিতেছি, এমন সময়ে কিছুক্ষণ পরে গায়ক গায়িকাগণ প্রত্যেকেই এক একটা বর্তিকা হস্তে করিয়া গান গাইতে গাইতে বাদ্যোদ্যমসহ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । আমরাও তৎসহ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় ভগবান নৃসিংহজির সম্মুখস্থ মন্দিরে উপ-

তীর্থ-কাহিনী ।

স্থিত হইয়া শ্রীশ্রীচন্দ্রসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া রাত্রিবাসের জন্য বাসস্থানের চেষ্টায় বহির্গত হইলাম । অনেক চেষ্টার পর এক গৃহস্থামীর গৃহের বারেন্দায় বসিয়া রাত্রি কৰ্ত্তনের পরামর্শ করিতেছি, ইতিমধ্যে গৃহবাসিনী একটি স্ত্রীলোক আসিয়া কি বলিয়া চলিয়া গেল—আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আমরা তথাতেই শয়ন করিলাম, কিন্তু নানাবিধ দুশ্চিন্তায় সূচারু নিদ্রা হইল না ।

পরদিবস প্রাতে তথা হইতে বাজারে আসিলাম । বাজারে নয়টার সময় আহারাদি সমাপন করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে আসিলাম । এক টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া পীঠাপুরাভিমুখে চলিলাম ।



পদগয়া ।

ইত্যুক্ত্বা সোপতদুমৌ শ্বেতকল্পে গয়াসুরঃ ।
নৈঋতীং দিশমাশ্রিত্য তদা কোলাহলে গিরৌ ॥
শিরঃ কৃৎছোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃৎছা তু দক্ষিণে ।
(গয়ামাহাত্ম্যং)

মাহেন্দ্রে চ গিরৌ তস্মা কৃতৌ পাদৌ স্থনিশ্চলৌ !
তত্রাপি পিণ্ডকুৎ সপ্তকুলান্যুদ্বরতে নরঃ ॥

(স্কন্ধপুরাণং)

অর্থঃ

ব্রহ্মার প্রার্থনা ক্রমে গয়াসুর শ্বেতকল্পে কোলাহল নামক পর্বতের নৈঋত কোণে উত্তরে মস্তক ও দক্ষিণে পদ রাখিয়া পতিত হইলেন ।

মাহেন্দ্র পর্বতে গয়াসুরের পদদ্বয় পতিত হওয়ায় ঐ স্থানকে পদগয়া বলে । ঐ স্থানে পিণ্ডদান করিলে সপ্তকুল উদ্ধার হয় ।

এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মালদ্বাজ প্রেসিডেন্সির অধীন সরকার প্রদেশে—পীঠাপুর জেলায় । রেলষ্টেশনের পূর্ব—একমাইল ব্যবধানেই তীর্থস্থান ।

তীর্থ-কাহিনী ।

হাওড়া হইতে পীঠাপুর ষ্টেশন রেলভাড়া (৮।০) আট টাকা চারি আনা । পুরী ষ্টেশন হইতে পীঠাপুরের ভাড়া (৪।।/০) চারি টাকা নয় আনা । বেঙ্গল নাগপুর রেল উঠিয়া খুর্দারোড জংসন হইয়া ওয়াল্টায়ার (waltair) যাইয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ অপর গাড়ীতে উঠিয়া পীঠাপুর পৌঁছিতে হয় । পীঠাপুর ষ্টেশনই পদগয়ার ষ্টেশন ।

আমরা সিংহাচল ষ্টেশন হইতে একটার সময় গাড়ীতে উঠিয়া পরবর্তী ষ্টেশন ওয়াল্টায়ার (Waltair) আসিয়া নামিলাম । তথায় কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া রাত্রি আটটার সময়ে পুনরায় অন্য গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি বারটার সময় পীঠাপুর ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম । অপরিচিত স্থান,—কোথায় যাই ? নগরবাসী সকলেই নিদ্রিত ; নগরে প্রবেশ করাও সম্ভবত বোধ হয় না । ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে মোসাফিরখানার মুক্ত মেজেতে বজ্রাঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইলাম । পরদিবস অতি প্রত্যুষে পদগয়ার অমুসন্ধান নগরাভিমুখে চলিলাম । অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমাদের ভাষা বুঝিতে না পারায়, সম্ভবতঃ না পাইয়া, হতাশ হইয়া পড়িলাম । সূর্য্য ঘুরিয়া বেড়াইতে বেলাও অতিরিক্ত হইল, শরীরও ক্লান্ত হইয়া আসিল, এমন সময় জনৈক পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকে মনোভিলাষ জ্ঞাপন করায় তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া আমাদের অভিলাষ পূরণার্থ সঙ্গ করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । ধর্ম্মশালায় টোপ্লা-

টুপ্লী রাখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম । কিছুকাল বিশ্রামান্তে পাণ্ডার সহিত স্নান ও পিণ্ডদানার্থে পদগয়ার উপস্থিত হইলাম । বেশী দূর যাইতে হইল না,—ধর্মশালার সম্মুখেই তীর্থস্থান । অল্প প্রাচীর বেষ্টিত পুষ্করিণী বিশেষ । চারিদিকই প্রস্তর দ্বারা সোপান শ্রেণী গ্রথিত থাকায় নামিয়া অনায়াসেই স্নান করা যায় । পশ্চিম তীরে চৌকোঠা মিলান সৌধালয় । অঙ্গন মধ্যে ছোট বড় কয়েকটি মন্দির আছে । প্রধান মন্দিরে কুকুটেশ্বর মহাদেবের প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্তি । পাশ্বে ছোট মন্দির মধ্যে গণপতি আছেন । পশ্চিম পার্শ্ববর্তী মন্দির মধ্যে রাজরাজেশ্বরী বিরাজিতা । প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট ছোট মন্দির মধ্যে গয়ামূরের পদাঙ্কিত শিলাখণ্ডের উপর পিণ্ড দিতে হয় । পিণ্ডদানান্তে ঐ পিণ্ড লইয়া পূর্বোক্ত পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতে হয় ।

এই স্থানের কার্যের অধিকার কেবল মাত্র সাত ঘর ব্রাহ্মণ পাণ্ডার । ইহারা এইস্থানে পিণ্ডদানের মন্ত্র বলিয়া পিণ্ডদান করাইয়া থাকেন । পাণ্ডাগণ যৎসামান্য হিন্দি জানায় কথোপকথন করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না । পাণ্ডাগণ যাত্রীদের সহিত অতি সদ্যবহার করিয়া থাকেন । যাত্রীগণ স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দেন তাহাতেই পাণ্ডাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন । আমরা তথাকার কার্য শেষ করিয়া পুনরায় ধর্মশালায় আসিয়া আহারাদি করিলাম । তথায় অবস্থিত-কালতক পাণ্ডাগণ আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত

তীর্থ-কাহিনী ।

কার্যের সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি বিদ্যার অস্ত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক রূপে সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। যাইবার কালে অনেক স্থান ঘুরিতে হয়, একারণ পথের পরিমাণ বা দিক নিরূপণ করিতে পারি নাই, এক্ষণে জানিলাম ষ্টেশনের ঠিক পূর্বে এক মাইল ব্যবধানেই পদগয়ার স্থান। আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া গোদাবরী-স্নানার্থ রাজ-মাহেন্দ্রীর টিকিট লইয়া রওনা হইলাম।

গোদাবরী গঙ্গা ।

মহাদেব বলিয়াছেন—“সাগরসঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম ও অমর-কণ্টক প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ অপেক্ষা গোদাবরী পুণ্যতোয়া, সেজন্ত এই গোদাবরীতীরে আমি সতত বাস করি।”

গোদাবরী—ইনিও বিষ্ণু পাদাঙ্গসম্পূতা, নবগঙ্গাস্তর্গতা গঙ্গা। ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধার জন্ত তপস্তা করিয়া পৃথিবীতে যে গঙ্গা আনয়ন করেন তাঁহার নাম ভাগীরথী বা জাহ্নবী গঙ্গা; এই গঙ্গা অলকানন্দ নামে খ্যাত। মহর্ষি গৌতম তেম্নি ষণ্ড-রূপী ষড়াননকে জীবিত করণোদ্দেশে গঙ্গাধরের আরাধনা করিয়া তাঁহার শীর্ষস্থ জটা হইতে এই গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। যে সময় জটা হইতে বহির্গত হইয়া গৌতম সহ পৃথিবীতে আইসেন, তৎকালে গঙ্গাধর বলেন “গৌতম! তোমা কর্তৃক নীতা গঙ্গা, গৌতমীগঙ্গা বা গোদাবরী নামে খ্যাত হইবেন।” ইনি ব্রহ্মগিরি হইতে উদ্ভূতা হইয়া পূর্ব দক্ষিণ মুখে

সপ্তধা বিভক্ত। হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন । এই গোদাবরী গঙ্গা দৈর্ঘ্যে (৮৯৮) আটশত অষ্টানব্বই ক্রোশ । গিরিবরের যেস্থান হইতে গোদাবরী প্রথমতঃ বহির্গতা হইয়াছেন ঐ অংশটী দেখিতে জটীর স্থায় বোধ হয় । ঐ জটাসদৃশ স্থানকে জটভট্কা বলে । এই স্থানে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব আছেন । ঐ স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ত্র্যম্বকেশ্বর বর্ণন সময়ে লিখিত হইবে ।

গোদাবরী—গঙ্গা তীর্থস্থান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত—সরকার প্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলায় গোদাবরীতীরে অবস্থিত । বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের যোগে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনে নামিতে হয় । রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনই গোদাবরীর ষ্টেশন ।

হাওড়া হইতে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশন (৬৭২) ছয় শত বাহান্তর মাইল, রেলভাড়া (৮৮০) আট টাকা বার আনা । পুরী হইতে রাজমহেন্দ্রী ভাড়া (৫/০) পাঁচ টাকা এক আনা ; পীঠাপুর হইতে রেলভাড়া (১০) আট আনা । আমরা পীঠাপুর হইতে রাত্রি দশ টার সময় রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট দিয়া গেটের বাহিরে আসিয়া তিনজনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাত্রিবাসের স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি । যাহারা রেল হইতে নামিল তাহারা আমাদের আশ পাশ দিয়া ছুটাছুটি করিয়া যাইতে লাগিল, কেহই আমাদের প্রতি কোন লক্ষ্য করিল না । যদি কেহ আমাদের দিগকে দেখে, সেও একটু বিস্ময় ভাবে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়াই অমনি চলিয়া যায় । একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে আবার

তীর্থ-কাহিনী ।

রাত্রি, গভীর অন্ধকার । সহর কোথায় ? বাজার, ধর্মশালা আছে কি না ? ভাড়াটিয়া বাসা কি অগ্ররূপ আশ্রয় পাওয়া যায় কি না,—কিছুই জানিতে পারিলাম না । কাহাকেও কোন কথা—বাঙ্গলা কি হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলে ভাষা না বুঝার জন্য কেহ কোন উত্তর না দিয়া কেবল আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে । ষ্টেসনে যাত্রী থাকিবার ঘর নাই যে সেই খানেই রাত্রি কাটাইব । ক্রমে ক্রমে ষ্টেসনটা লোকশূন্য হইয়া গেল । আমরা হতাশ চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম । অবশেষে ষ্টেসনের পাশ্বে মুক্ত মেজেতে আমরা তিনজন কাপড় বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় লালপাগড়িধারী একজন পুলিশ পুঙ্গব আসিয়া নিজ মূর্তি প্রকাশ করিয়া আমাদেরকে ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল । ভাবিলাম, তুমি পুলিশ শান্তিরক্ষক—তোমার উপযুক্ত কার্যই করিয়াছ । এখন আমরা যাই কোথা ? অন্ধকারে কোনই চেষ্টা করিতে না পারায় অনন্তোপায় হইয়া সড়কের একটু পরিষ্কৃত নয়নজুলি Drain পাইয়া তখাতেই পড়িয়া রাত্রি কাটাইলাম । একরূপ ভাবে রাত্রি যাপন যে কত সুখকর তাহা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন ; বিশেষ করিয়া আর বুঝাইতে হইবে না । তবে মনের দুর্দমনীয় উৎসাহ ছিল বলিয়া কোনমতে রাত্রি কাটাইলাম ।

পর দিবস প্রাতে ষ্টেসনের দক্ষিণদিকে এক মাইল গমন করিয়াই গোদাবরী প্রাপ্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম । গোদাবরী অতি বেগবতী বিস্তৃত নদী । জল ঘোলা—পদ্মানদীর

ভায় । এইখানে স্নান, তর্পণ ভিন্ন অন্য কোন কার্য নাই । আমরা গোদাবরীকূলে বজ্রাদি রক্ষা করিয়া স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া বাসস্থানানুসন্ধানে নগরাভিমুখে চলিলাম । গঙ্গার পূর্ব তীরেই নগর । বাজার প্রায় এক মাইল দূরে ; ধর্মশালাও সেইখানে । আমরা তদ্বদ্যে যাইতেছি ইতিমধ্যে দেখিলাম,—ওয়াল্টার (waltair) ষ্টেশনের ক্ষণিক পরিচিত তৎ-স্থান বাসী দুইটি ব্রাহ্মণ স্নানার্থ গঙ্গায় যাইতেছেন । আমাদেরকে দেখিয়া ধর্মশালায় যাইতে না দিয়া তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে লইয়া স্থান প্রদান করিলেন । আমরা পরমোপকার মনে করিয়া তথায় অতি সুখে মাধ্যাহ্নিক কার্য সমাধা করিলাম ।

আমাদের কার্যের অবসর বুঝিয়া আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণটি আমাদের নিকট আসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণটি পূর্বে দুইবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীর স্বভাবাদি ভালরূপে জানা থাকায় আমাদেরকে ঘৃণা না করিয়া আদর যত্ন করিলেন । বাঙ্গালাভাষা ভাল বলিতে না পারিলেও যাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি জানিয়া লইবার মহা সুযোগ হইল । আমরা কথা প্রসঙ্গে, সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গমন পথে, এ প্রদেশে কোথায় কোন্ কোন্ তীর্থস্থান আছে ; কোন্ ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়, কোথায় থাকিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত ভাবে তাঁহার নিকট শুনিয়া লিখিয়া লইলাম ।

রাজমহেন্দ্রী সহরটি মন্দ নহে । হিন্দু মুসলমান সর্বজাতিরই

তীর্থ-কাহিনী ।

বসতি আছে । লোকের স্বভাব মন্দ বলিয়া বোধ হইল না । এদেশের লোকেরা বাঙ্গালীকে কিছু ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে । তাঁহারা বলেন বাঙ্গালীরা স্বধর্মবর্জিত, স্বেচ্ছাচারী, বিলাসী এবং ইংরেজদিগের অনুকরণ পটু । এদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ, স্বধর্মপ্রিয় । কোন প্রকার মাদক সেবন বা তাম্রকুট-ধূমপান একেবারেই করেন না । নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে কেহ কেহ চুরুট ব্যবহার করে । গুড়ুক তামাক, ছকা, কক্কী, এদেশে আদৌ নাই । সুতরাং আমরা তামাকপাতার কন্দ গুড় * মাখাইয়া তাহারই ধূম পান করিতাম । রেল গাড়ীতে ভদ্র লোকের মধ্যে আমরা প্রায়ই তামাক খাইতে পারিতাম না । ধূমপানের উদ্যোগ দেখিলেই সহযাত্রীরা নানারূপ ঘৃণা সূচক বাক্য বলিয়া নিবেদন করিত । নীচ জাতির সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলে কখন কখন ধূমপান করিতে পাইতাম । এদেশে পান খাইবার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য দেশের স্থায় নানারূপ মসলা সংযোগে খায় না । প্রথমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পান চূর্ণ সংযোগে ক্রমে ক্রমে মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া পরে কালরঙের ছোট ছোট গুবাক দুই তিন খণ্ড মুখে নিঃক্ষেপ করে । আমাদের ইচ্ছা হইলে ঐরূপ পান খাইয়া পান খাওয়ার অভিলাষ মিটাইতাম ।

* কন্দ এক প্রকার গুড় কিন্তু মিহরির স্থায় লোহার টবে প্রস্তুত হয় । খুব শক্ত দ্রব্য, কিন্তু জলে বা ছক্ষে ফেলিবামাত্র গলিয়া যায় । কন্দের দ্বারা বেশ সরবৎ হয় ।

হীনাবস্থ লোকের আবাসগৃহ প্রায়ই গোলাকার (মুর্গা বা মট্কার আয়) তাহা তাল বা নারিকেল পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত । চারিচালা ঘর অতি অল্পই দেখা গেল ; তাহাও তাল বা নারিকেল পত্রের ছাউনী । খড় এদেশে এক বারেই নাই ; তাল ও নারিকেল পত্রই সে অভাব মোচন করে । রেল গমন কালে ময়দানে কেবল তাল ও নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয় । নারিকেলের জল লবণাক্ত ও অপেয় । স্থানীয় লোকের স্বাস্থ্য মন্দ নহে । জল হাওয়া ভাল ; স্থানীয় লোকে গঙ্গোদকই ব্যবহার করে । গোদাবরীর জল পদ্মার জলের আয় ঘোলা, কিন্তু নির্মলীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইলে অতি উত্তম পরিষ্কার পানীয় জল হয় । পুরুষগণ বাঙ্গালীর আয় ধুতি, চাদর, পিরাণ ব্যবহার করে । সকলেই মস্তকের চতুর্দিক মণ্ডলাকারে মুণ্ডন করতঃ মধ্যস্থলে শিখার আয় কেশগুচ্ছ রাখে । ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত্র জাতি মাত্রেই উক্ত প্রকার কেশগুচ্ছের চতুর্দিকে একাঙ্গুলিপ্রমাণ কেশ রাখিয়া মুণ্ডন করে । যদিচ এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, তথাপি যথেষ্টাচারিতা নাই । সহরের বাজারে বেশী অতি অল্পই আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই ; কেন না সকলেরই পরন পরিচ্ছদ একরূপ । হিন্দু ও মুসলমান রমণীতে এই মাত্র প্রভেদ, মুসলমান রমণীগণের ক্রয়গুলের মধ্য হইতে সীমন্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ উকীরেখা আছে ; হিন্দুরমণীর সেরূপ নাই ।

বাজারে সকল প্রকার খাদ্যাদি পাওয়া যায় । শাক সব্জী তরী তরকারী, ফল, মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ; নিরামিষ

তীর্থ-কাহিনী ।

খাদ্যই প্রধান । আমিষ আছে কিনা জানিতে পারিলাম না ।
আমরা বৈকাল বেলায় পুনরায় ষ্টেশনে আসিলাম । কৃষ্ণাগঙ্গায়
স্নান করিবার জন্য রাত্রি দশটার সময় বেজওয়াড়ার টিকিট লইয়া
রেলের উঠিয়া রওনা হইয়া প্রাতে পাঁচটার সময় অভিলষিত ষ্টেশনে
অবতরণ করিলাম ।



কৃষ্ণা-গঙ্গা ।

বিষ্ণুপাদাজ-সমুত্তা নয়টি গঙ্গার মধ্যে কৃষ্ণাগঙ্গা একতম । ইনিও পাপহারিণী পুণ্যসলিলা । পশ্চিম ঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বাভিমুখে বঙ্গোপসাগরে যাইয়া পতিতা হইয়াছেন । উৎপত্তিস্থান হইতে সাগর পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় (৮৯০) আট শত নব্বই ক্রোশ । নিম্নত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ইহার জল মৃত্তিকাসংযোগে অত্যন্ত মলিন ; পানকরা দূরের কথা স্নান করাই কষ্টকর । আবার প্রখর স্রোত জন্ত জল মধ্যে অবতরণ করাও ততোধিক দুঃসাধ্য ।

কৃষ্ণাগঙ্গা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধীন । বেঙ্গল ওয়াড়া জেলা ইহার উত্তর তীরে ।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল ওয়াড়া ষ্টেশন (৭৬৪) সাত শত চৌষটি মাইল, রেল ভাড়া (৯৬৮) নয় টাকা পনেরো আনা । পুরী হইতে রেল ভাড়া (৬০) ছয় টাকা চারি আনা । রাজমহেন্দ্রী হইতে রেল ভাড়া (১৮০) এক টাকা তিন আনা । বেঙ্গল ওয়াড়া ষ্টেশনই কৃষ্ণাগঙ্গার ষ্টেশন ।

আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া উত্তর মুখে অর্ধ মাইল যাইয়াই ধর্মশালা পাইলাম । তথায় বস্ত্রাদি রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নানার্থ কৃষ্ণাগঙ্গায় চলিলাম । ধর্মশালা হইতে দক্ষিণে

তীর্থ-কাহিনী ।

একমাইল দূরে সহর ; তন্নিম্নেই কৃষ্ণাগঙ্গা এবং স্নানের ঘাট । এই স্থানে ইংরেজরাজ একটি ক্যানেল কাটিয়া কৃষ্ণাগঙ্গাকে অগ্রদিকে লইয়া গিয়াছেন ; ক্যানেলের বিরাট কাণ্ড কারখানা দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয় ।

সে যাহা হউক ; আমরা ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি বহুতর যাত্রী স্নান করিতেছে । স্নানঘাটে ব্রাহ্মণ আছে ; তাঁহাকে দুটি পয়সা দিলেই মন্ত্র বলিয়া স্নান ও তর্পণ করান । গঙ্গার প্রথর স্রোতোধ্রুবে সাবধানে স্নান করিতে হয় । আমরা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া স্নান করিলাম এবং তথাতে সন্ধ্যাবন্ধনাদি শেষ করতঃ নৃসিংহজী দর্শনার্থ মান্‌গাল্ গিরি যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম । বেঙ্গওয়াড়া ষ্টেশন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে একটি মাত্র ষ্টেশনে যাইয়া নামিতে হয়, সুতরাং আমরা তথা হইতে আর ধর্মশালায় না যাইয়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম এবং পাঁচ পয়সা দিয়া মান্‌গাল্ গিরি ষ্টেশনের টিকিট লইয়া আটটার সময় রওনা হইয়া অবিলম্বে অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম । ষ্টেশনের একমাইল দূরে পূর্বদিকে যাইয়া গিরি আরোহণ করিতে হয় । আরোহণ জন্ত চারিশত প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আছে । আমরা ঐ সকল সোপান শ্রেণী অতিক্রমণ পূর্বক উপরে উঠিলাম । উপরে উঠিয়া দেখিলাম পর্বতোপরি ছোট ছোট তিনটি ইষ্টকনির্মিত মন্দির ; মন্দির গুলি নূতনই প্রস্তুত ; এখনও কার্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই । একটি মন্দির মধ্যে ভগবান নৃসিংহজি ধাতুময়ী ক্ষুদ্র মূর্তিতে বিরাজিত । তথায় একটি পয়সা প্রণামী দিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিলাম ।

সঙ্গীয় যাত্রীগণ মধ্যে অনেকেই ইঁহাকে পানক (১) অর্থাৎ উপাদেয় চিনির সরবৎ ভোগ প্রদান করিলেন ; এই পানকের নির্দিষ্ট নিয়ম কিছু নাই ; যাহার যেমত ইচ্ছা তিনি সেইরূপ ব্যয়েই দিতে পারেন । এই স্থানে নৃসিংহজি ভিন্ন আর কিছুই দর্শনীয় নাই । আমরা তথা হইতে তৎকালেই ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া টিকিট করিয়া পুনরায় বেজওয়াড়ার পূর্বোক্ত ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করিলাম এবং বিশ্রাম করতঃ রজনীশেষে—সাড়ে তিনটার সময় ষ্টেসনে আসিয়া টিকিট লইয়া মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইলাম । পরদিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় মাদ্রাজ পৌঁছিলাম ।

এখানে মাদ্রাজ দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিলে, তাহা তীর্থ-কাহিনী না হইলেও বোধ হয় পাঠকের নিতান্ত বিরক্তিকর না হইতে পারে এই বিবেচনায় সংক্ষেপে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

হাওড়া হইতে মাদ্রাজ बीच Madras Beach (১০৩২) এক হাজার বত্রিশ মাইল, রেল ভাড়া (১৩।০) সাড়ে তের টাকা, পুরী হইতে (১০৮০) দশ টাকা তিন আনা, বেজওয়াড়া হইতে ভাড়া (৩।০) তিন টাকা আট আনা ।

আমরা মাদ্রাজ बीच Madras Beach ষ্টেসনে পৌঁছিয়া অতীত যাত্রীগণের সঙ্গে ঘোড়গাড়ীতে সহর মধ্যে মাডোয়ারির ধর্মশালায় যাইয়া রন্ধনাদি পূরক ভোজনান্তে রাত্রি হওয়ায় নিদ্রিত হইলাম । পর দিবস প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মাদ্রাজ সহর পরি-

(১) এলাচি, লবঙ্গ, বপূরসংযোগে চিনির সরবৎ ।

তীর্থ-কাহিনী ।

দর্শনার্থ বাহির হইলাম। মাদ্রাজ অতি বিস্তৃত সহর,—দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে অবস্থিত। কলিকাতার ছায় তত পারিপাট্য না থাকিলেও সহরটী মন্দ নহে। হাইকোর্টের গঠন অতি সুন্দর। হাইকোর্ট যেখানে স্থাপিত তাহার সম্মুখেই অতল জলধির উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার লহরীলীলা এবং ভাসমান জাহাজ সকলের অপূর্ব সমাবেশ জনিত সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে দর্শকের মন বেশ প্রফুল্লিত হয়। হাইকোর্টের নিম্নেই হাইরোডের উপর ইলেক্ট্রিক ট্রাম্‌ওয়ের গাড়ী। তৎপরেই মাদ্রাজ বীচ Madras Beach রেল ষ্টেশন। মাদ্রাজ রেল কোম্পানীর কারখানা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ; মাদ্রাজের চতুর্দিকে এগারটী রেল ষ্টেশন। যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই রেল যাতায়াত করা যায়। লবণের কারখানাও অতি বিস্তৃত। লবণ প্রস্তুতের ৬৩টা কল আছে। সহরমধ্যস্থ পথগুলি অপ্রশস্ত। বোধ হয় তজ্জন্যই ভিতরে ট্রাম্‌ওয়ে যাতায়াতের রাস্তা হয় নাষ্ট ; অন্যান্য গাড়ী সকল যাতায়াত করে। সহরের স্থানে স্থানে জলের কল আছে ; সহরবাসীরা কলের জলই পানাদি করে। বহুতর মাড়োয়ারী ধনী মহাজনের বসতি আছে এবং তাহাদের কৃত অনেকগুলি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণ ঐ সকল ধর্ম্মশালায় তিন দিবসের জন্য বিনাব্যয়ে স্থান পায়। অনাথ দরিদ্রগণকে আহার জন্য সিধাও দেওয়া হইয়া থাকে।

কাঞ্চীপুরী ।

জগাম নগরীং কাঞ্চীং কান্তাং ত্রিভুবনাদপি ।
লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ জন্তুংস্তত্রনিবাসিনঃ ॥
শ্রীকান্তানেব কুরুতে পরত্রেহ চ নিশ্চিতং ॥
দৃষ্ট্বা কাঞ্চীং কান্তিমতীং কান্তিমস্তিনিষেবিতাং ॥
কান্তিমানভবৎ সোহপি নাকান্তিস্তত্র কহিচিৎ ॥
তত্র কৃত্যঞ্চ যৎকৃত্যং তৎ কৃত্বা সৰ্বকৰ্ম্মকৃৎ ॥

(কাশীখণ্ড ৭ অধ্যায়ঃ)

অর্থাৎ

ত্রিভুবন অপেক্ষা কমণীয় কান্তিমতী কাঞ্চীপুরীতে স্বয়ং
লক্ষ্মীকান্ত অবস্থিতিকরতঃ সেই স্থানের প্রাণিগণকে ইহ ও পর-
লোকে স্বীয় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন । কান্তিশালিনী কাঞ্চী-
পুরী দর্শন করতঃ মানবগণ কান্তিবিশিষ্ট হয় ; তথায় কেহই
কান্তিশূন্য নাই । কাঞ্চীপুরীতে যে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম কৰ্ম্ম করা যায়
তাহাতেই সমস্ত কৃতকৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় ।

অর্য্যাবর্তে যেমন কাশী ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক,—দাক্ষিণাত্যে
কাঞ্চীপুরীও তেমনি মোক্ষদায়িকা । এই মহাতীর্থ ক্ষেত্র দুই
ভাগে বিভক্ত ; বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী । প্রথমোক্তটি হইতে
দ্বিতীয়টি—দুই ক্রোশ ব্যবধান ।

তীর্থ-কাহিনী ।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন কর্ণাট প্রদেশে চেন্নলপুট জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে কাঞ্চীপুর ।

হাওড়া হইতে মাদ্রাজ (১০৩২) এক হাজার বত্রিশ মাইল, রেলভাড়া (১৩।০) তের টাকা আট আনা । পুরী হইতে ভাড়া (১০৮০) দশ টাকা তিন আনা । মাদ্রাজ হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে চেন্নলপুট ষ্টেশন (৪০) চল্লিশ মাইল, ভাড়া (১৮।১০) সাড়ে সাত আনা, তথা হইতে আক্‌নামক ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ীতে কাঞ্চী-পুরম্ ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্র । যাইবার জন্য প্রশস্ত রাজপথ আছে, পদব্রজে বা ঘোড়াগাড়ীতে যাওয়া যায় ।

আমরা পূর্বাহ্ন দশটার সময় কাঞ্চীপুরম্ ষ্টেশনে নামিবা মাত্রই জনৈক পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । তিন জনে চারি আনা দিয়া একথানা ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম । বেলা বারটার সময় নিরূপিত স্থানে পৌছাইল । আমরা এই স্থানের দর্শনাদি কার্য্য শেষ করিয়া সেই দিনই চারিটার গাড়ীতে ফিরিব বলিয়া ধর্ম্মশালায় না যাইয়া সন্ধ্যার পাণ্ডার আলয়েই উপনীত হইলাম ।

এস্থানের কার্য্য কেবল মাত্র দর্শন ও ভগবান বিষ্ণুর ভোগ প্রদান । এই ভোগ যাত্রীগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই হইয়া থাকে । আমরা ভোগের জন্য পাণ্ডাঠাকুরের নিকট যৎসামান্য কিছু দিলাম । পাণ্ডাঠাকুর আমাদের প্রদত্ত অর্থে ভোগের দ্রব্যাদি আনিবার জন্য বাজারে গেলেন । যাইবার সময় আমাদের বস্ত্রাদি তথায় রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া

কাঞ্চীপুরী ।

গেলেন । আমাদের আদেশমত সকল কার্যেই সাহায্য করিয়া-
ছিলেন । শৌচাদিকার্য্য সকল সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম ।
আসিবার সময় গাড়ীতে সুযোগ না হওয়ায় ধূমপান করিতে পারি
নাই, তাই এক্ষণে বিশ্রামের স্থান প্রাপ্ত হইয়া অবসর বুঝিয়া ধূম-
পানের উদ্যোগে নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু দুঃখ ও হাসির বিষয়—বাটীস্থ
রমণীরা ধূমপানের মহাবিঘ্ন উপস্থিত করিল । ঘণার সহিত তদ্রূপ
ভাষায় বিকৃত মুখে কটু কাটব্য বলিয়া সক্রোধে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত
হইল । তখন কি করি, অগত্যা আমরা বাড়ীর বাহিরে যাইয়া ধূমপান
করিলাম এবং বলিলাম আমরা বাঙ্গালী, তামাক আমাদের জীবন-
সহচর ; সমস্ত ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তামাক ছাড়িতে পারিব না,
ইহাতে তোমরা ঘণাই কর আর তাড়াইয়া দাও । যতক্ষণ সেই স্থানে
ছিলাম ততক্ষণ ঐ রূপ বাড়ীর বাহিরে যাইয়া প্রতিবার তামাক
খাইয়া আসিতাম । ক্ষৌর কার্য্যকেও ইহারা অতি অপবিত্র বলিয়া
জ্ঞান করে । ক্ষৌর হইতে হইলে গ্রামের প্রান্তর ভাগে নির্দিষ্ট স্থানে
যাইয়া ক্ষৌর কার্য্য শেষ করিয়া স্নানান্তে গৃহে আসিয়া থাকে ।
ইহাদের নিকট নাপিত অতি নিকৃষ্ট জাতি, তাহাকে স্পর্শ করিলে
স্নান করিতে হয় ।

সে যাহা হউক, ক্ষণকাল মধ্যেই পাণ্ডাঠাকুর বাজার হইতে
জিনিসাদি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাদেরকে স্নান ও
দেবদর্শনার্থ সঙ্গে লইয়া চলিলেন । নগরের মধ্য দিয়া কিছু দূর
যাইয়াই প্রকাণ্ড দেবালয়ের সদর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম ।
দেবালয়ের চতুর্দিক দেড় মাইল পরিমিত বিস্তৃত স্থান অত্যুচ্চ

তীর্থ-কাহিনী ।

প্রাচীর বেষ্টিত—উত্তর দক্ষিণে দুইটা সূর্যহং দ্বার। উত্তর দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই দ্বিতল বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দিরের পূর্বোত্তর ভাগে অপর একটি মন্দির; তাহার নিকটে পুষ্কর্ণী। আমরা ঐ পুষ্কর্ণীতে স্নান করিলাম। নামিবার অন্ত চারিধারে প্রস্তর দ্বারা সোপানশ্রেণী প্রস্থিত আছে। জল ভাল নয়; স্নান ভিন্ন, পান করা যায় না। স্নানানন্তর ভগবান বিষ্ণুদর্শনার্থ দ্বিতল মন্দিরে উপনীত হইলাম। মন্দিরটা অতি বৃহৎ দ্বিতলবিশিষ্ট—শ্রীবরদরাজস্বামী কৃত। একরূপ দ্বিতল দেবমন্দির অতি অল্পই দেখা যায়। মন্দিরমধ্যস্থ প্রকোষ্ঠে প্রস্তরময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। পার্শ্বস্থ অপর প্রকোষ্ঠে একরূপ বিষ্ণুমূর্তির সহিত অন্যান্য কতকগুলি দেবমূর্তি দর্শন করিয়া পাণ্ডার সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরতলায় উঠিলাম। মন্দির-দ্বারদেশের নিকটস্থ হইয়া দেখি দরজা বন্ধ। শ্রুত হইলাম ভগবানের পূজা হইতেছে। সম্মুখে বিস্তৃত বারেন্দায় কতকগুলি লোক করতাল বাজাইয়া ভজন গান করিতেছে। আমরা তথায় উপবেশন করিয়া গান শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সঙ্গীত ভঙ্গ করিয়া সকলেই দ্বারে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইল, এবং হস্তপ্রসারণপূর্বক পুজারী প্রদত্ত বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিল; তাহাদের দেখাদেখি আমরাও চরণামৃত শিরে ধারণপূর্বক কিছু পান করিলাম। আমরা নবাগত যাত্রী বোধে পুজারীঠাকুর বর্তিকাহস্তে আমাদিগকে ডাকিয়া নিকটে লইয়া “আচ্ছা কর্কে দর্শন কিয়া”

কাঞ্চীপুরী ।

বলিয়া হস্তস্থিত আলোক বিগ্রহের নিকটে ধরিলেন । আমরা তখন উত্তমরূপেই বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিলাম । কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী হইয়া ভগবান দণ্ডায়মান । বিগ্রহের কণ্ঠদেশে একখানি আভরণ আছে ; শ্রুত হইলাম, লর্ড ক্লাইব (৩৬৬১) তিন হাজার ছয় শত একষটি টাকা মূল্যে এই কণ্ঠাভরণ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন—কথা কতদূর সত্য, ভগবানই জানেন ।

সে যাহা হউক, দেবদর্শনান্তে নির্মাল্য লইয়া পূজারী ঠাকুর আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ভগবানের ভোগের জন্য কিছু দিবে ? এখন আমরা মন্দির বিপদে পড়িলাম, কেন না সঙ্গীয় পাণ্ডা পূর্বেই বলিয়াছিলেন ; পূজারী জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যাহা দিবার তাহা দিয়াছি ; এখন ভগবানের সমক্ষে কি বলিব ? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সঙ্গীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম । তৎপর মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, নীচে নামিয়া আসিলাম । যেমন প্রকাণ্ড দেবালয় তদনুরূপ ধুমধাম বা জনসমাগম না থাকায় তেমন আনন্দ বোধ হইল না, যেন বিজয়াদশমীর বিসর্জিত প্রতিমাশূন্য মণ্ডপ—নীরব । বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী স্থান জনশূন্য হইলে যেমন হয়, এস্থানটীও তেমনি বোধ হইতে লাগিল । শুনিলাম শ্রীরামনবমীতে এখানে পনের দিন স্থায়ী একটা মেলা বসে—তখন এইস্থানে ধুমধামের পরিসীমা থাকে না । দেশদেশান্তর

তীর্থ-কাহিনী ।

হইতে বহুলোকের সমাগম হওয়ায় সমস্ত সহর লোকপরিপূর্ণ হয় । আমরা আগ্নিনার চতুর্দিক দেখিয়া বাসায় আসিলাম । তৎপর আমাদের দত্ত ভোগের প্রসাদ লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ উপনীত হইলে, আমরা উহা গ্রহণ করিয়া পরিতোষ পূর্বক আহার করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম ; তৎপরে সিঙ্গারী ওরফে পাণ্ডাকে যথাকথঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া গাড়ীযোগে শিবকাঞ্চী অভিমুখে রওনা হইলাম । এইস্থান হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধান শিবকাঞ্চী ; নগর মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাজপথে পদব্রজে অথবা ঘোড়াগাড়ীতে যাওয়া যায় ।

শিবকাঞ্চী—বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে রওনা হইয়া বেলা অপরাহ্ন দুই-টার সময় শিবকাঞ্চীর শিবমন্দিরের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । জনশূন্য পুরী শা' শা' করিতেছে ; পূজারী পর্য্যন্তও নাই, মন্দির-দ্বার বন্ধ, স্মতরাং শিবদর্শন হইল না । পুরীর চারিদিক বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম ; পুরীর আয়তন দুই মাইল হইবে । এই স্থান চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে শিবমন্দির এবং তৎসহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধালয়, কিন্তু সকল গুলিই একতল—অমূল্যত । কোন গৃহেই কিছু নাই, সকল গৃহই শা', শা', খাঁ খাঁ করিতেছে । আমরা ঐ সকল শূন্য প্রাসাদ দেখিয়া ভাবিলাম দেবতার এরূপ জনশূন্য প্রাসাদের আবশ্যকতা কি ? এ রহস্যের মীমাংসা করিবার জন্য সেখানে জনপ্রাণীটীও নাই ; স্মতরাং তখন মনে হইল, মহাদেব বক্ষরাজ কুবেরের রাজা, তাহাতেই তাঁহার বিভূতি এই সৌধালয় । আর তিনি মহাযোগী—নির্জনপ্রিয় শ্মশানবাসী, তাই বুঝি জনশূন্য শ্মশানতুল্য স্থানে মহাযোগেশ্বর

কাঞ্চীপুরী ।

দেবাদিদেব মহাদেব মহাযোগ সাধনে রত আছেন, এই ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিরা একটা মুদীর দোকানে কিছুকাল বসিয়া থাকার পর জানিতে পারিলাম যে পূজারী মন্দিরের দ্বার খুলিয়াছে । তখন আমরা তাড়াতাড়ি পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দির-দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলাম ! দেখিলাম মহাদেবের অষ্টমূর্তি মধ্যে ইনি ক্ষিতিমূর্তি । গৌরীপট্ট সমেত, উচ্চে প্রায় তিন হস্ত পরিমিত । গৌরীপট্টের পরিধি প্রায় পঞ্চ হস্ত ; মৃণ্ময় জন্য জলাভিষেক হয় না ; এই শিবলিঙ্গের নাম একাম্রনাথ । মন্দিরের পশ্চাৎ—প্রকোষ্ঠের প্রাঙ্গণে একটা কাণ্ডচতুষ্টয় বিশিষ্ট প্রকাণ্ড আশ্রুবৃক্ষ অতি ষত্রে রক্ষিত আছে । বৃক্ষের চতুর্দিক উন্নত করিয়া প্রস্তরদ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । প্রবাদ—পূর্বে এই আশ্রুবৃক্ষের শাখাচতুষ্টয়ে কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর, চারি রসবিশিষ্ট ফল হইত । প্রতিদিন একটা করিয়া পক্কাম্র পতিত হইত এবং সেই পক্কাম্রদ্বারা মহাদেবের ভোগ হইত, তজ্জন্তই এই লিঙ্গের নাম একাম্রনাথ হইয়াছে । আমরা পূজারীর নিকট সেই কথা শুনিয়া বৃক্ষটির নিকট যাইয়া প্রণাম ও আলিঙ্গনদ্বারা স্পর্শ করিলাম । বৃক্ষটি অতি প্রাচীন তথাপি শাখাপল্লবাদি অতি সতেজ দেখা গেল, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে এখন আর ঐরূপ ফল হয় না । আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিলাম ।

এই ষ্টেশন হইতে রেলো বালাজি নামক তীর্থে যাওয়া যায়—রেলভাড়া (৮/০) চৌদ্দ আনা । বালাজি তিন মাইল উচ্চ পর্বতোপরি স্থাপিত । তথায় আরোহণ জন্ত সোপানাবলী আছে ।

তীর্থ-কাহিনী ।

পৰ্বতশীৰ্ষ হইতে পাপনাশিনী গঙ্গা প্রবাহিত। হইতেছেন । তাহাতে স্নান, তর্পণ ও বালাজি দর্শন করিতে হয় । অর্থের ও সময়ের অভাব জন্য আমাদের ভাগ্যে সেখানে যাওয়া হইল না । আমরা কাঞ্চীপুর হইতে ফিরিয়া পুনরায় চেন্নলপুট ষ্টেশনে আসিলাম । এইস্থান হইতে বরাবর রেল সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাওয়া যায় । পথিমধ্যে ছিদামবর নামক তীর্থ দর্শন করিতে হইলে রেল হইতে নামিয়া দর্শন করিতে হয় । আর যদি এইস্থানে হইতেই পদব্রজে মাদুরা জেলা পর্য্যন্ত গমন করিয়া রেল উঠা যায় তাহা হইলে পথিমধ্যে আরও কয়েকটা তীর্থ দর্শন হয় । যাহারা পদব্রজে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের সুবিধার জন্য এপথের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম ।

পাক্ষিক তীর্থ—চেন্নলপুট হইতে এগার ক্রোশ দূরে । পদব্রজে বা গোলকটে যাওয়া যায় । তথায় অবস্থিতি জন্য ধর্মশালা আছে, সেখানে থাকিয়া কার্যাদি করিতে হয় । এইস্থানের কার্য কেবল পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান । তৎকার্য যাত্রীগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই হয় । এইস্থানের পাণ্ডাগণ অতি ভদ্রস্বভাব । এইস্থানের আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যাত্রীগণের প্রদত্ত পিণ্ড পিতৃলোকগণ পক্ষী রূপে আসিয়া ভক্ষণ করিয়া যান । ইহা আজও প্রত্যক্ষ হয়, তাই ইহার নাম পাক্ষিক তীর্থ । পিণ্ডদান ব্যতীত এখানে অন্য কিছু কার্য করণীয় বা দর্শনীয় নাই । এইস্থান হইতে দুই দিবস পদব্রজে গমন করিলে ‘পাপনাশন’ নামক মহাদেব দর্শন হয় । পথে ধর্মশালা আছে তাহাতেই যাত্রীগণ

কাঞ্চীপুরী ।

অবস্থিতি করিতে পারে । পাপনাশন তীর্থ হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে কুম্ভকর্ণ সরোবর । রাম-রাবণের যুদ্ধ সময়ে যুদ্ধে হত কুম্ভকর্ণের মস্তক এই স্থানে পতিত হয় ; সেই কপালখণ্ডে জল সঞ্চিত হইয়া সরোবর রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল । ইহা অদ্যাপিও বর্তমান আছে, এবং উক্ত লিঙ্গকে কুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গ বলে । যাত্রিগণ তথায় গমন করিয়া উক্ত সরোবরে স্নান, তর্পণ ও কুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন । সেখানে অবস্থিতি জন্ত ধর্ম্মশালা আছে । খাদ্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়, কোনরূপ অসুবিধা বা ভয়ের কারণ নাই । তথা হইতে পদব্রজে বা গৌশকটে দেড় দিবস গমন করিলে “অহোবল নৃসিংহ” প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথা হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধানে “পানানৃসিংহদেব” আছেন । বহু উপাদেয় পানক (১) ভোগ হয় । প্রবাদ যে পানক ভোগে এই নৃসিংহদেব সন্তুষ্ট, তাই ইহার নাম পানানৃসিংহদেব হইয়াছে । তথা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে শিয়ালী মহাদেব দর্শন করতঃ আরও আট ক্রোশ গমন করিলে “বিঠলেশ্বর” মহাদেব দর্শন হয় । বিঠল অর্থে তৈলঙ্গী ভাষায় কুকুর । কোন ভক্তের নিবেদিত রোটিকা বিঠল (কুকুর) রূপে মহাদেব আসিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তদবধি ইহার নাম “বিঠলেশ্বর” হইয়াছে । এই স্থান হইতে দুই দিবস গমন করতঃ মাদুরা জেলায় উপস্থিত হইয়া রেল ষ্টেশনে সেতুবন্ধ রামেশ্বর রোড্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত টিকিট লইয়া রেল সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাওয়া যায় ।

(১) এলাইচ, লবঙ্গ, কপূর সহযোগে চিনির সরবৎ ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

দশ যোজন বিস্তীর্ণং শত যোজনমায়তং ।

রামচন্দ্র সমাদিষ্ট নলসঞ্চয়নকিতং ।

সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রেস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥

(পরশর সংহিতা)

সামুদ্রেং সেতুগমনং মহাপাতকনাশনং ।

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

সেতুমারভ্যমানস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবং ।

সংকল্প নিয়তো গত্বা পুরীং বারাণসীং নরঃ ॥

অানীয় গঙ্গাসলিলং রামেশ্বর মভিষিচ্য চ ।

ক্ষিপ্ত্বা সমুদ্রে তদ্বারি ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণং)

অর্থঃ

শ্রীরামচন্দ্রের আদিষ্ট বানরগণের দ্বারা নির্মিত দশযোজন বিস্তৃত ও শত যোজন দীর্ঘ সমুদ্র-সেতু দর্শনে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপও বিনাশ হয় । সমুদ্র সেতু গমনে মহাপাতকও বিনাশ হয়, অস্ত্র পাপের আর কি কথা । (১)

(১) পরশর সংহিতায় রামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন দীর্ঘ বলিতেছে ; কিন্তু আধুনিক লক্ষা বাহা সিংহল নামে পরিচিত তাহার দৈর্ঘ্য বড় জোর পঞ্চাশ ক্রোশও হইবে কি না সন্দেহ । সুতরাং এই পুস্তকে বর্ণিত

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

সংকল্প পূর্বক বারাণসী হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া সেই গঙ্গাজল দ্বারা রামেশ্বর শিবকে অভিষেক (স্নান) করাইয়া সেই স্থানীয় গঙ্গাজল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ।

এই সমুদ্রস্থ সেতুর নাম সেতুবন্ধ । ত্রেতাযুগে রাক্ষসাদিপতি রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কায় গমন জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে নরবানর দ্বারা সেতু বন্ধ হইলে তথায় শ্রীরামচন্দ্র যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন সেই শিবলিঙ্গের নাম রামেশ্বর । শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গমনপূর্বক রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের বধ সাধনান্তে সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমনকালে সমুদ্র, স্বীয় বন্ধন মোচন জন্য প্রার্থনা করায় শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুসারে রামানুজ লক্ষ্মণ ধনুকের ছিলা দ্বারা সেতুর তিন স্থান ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন । ঐ ভগ্ন স্থানের নাম ধনুস্তীর্ণ বা শ্বেত গঙ্গা । যে মানব উক্ত ধনুস্তীর্ণে গমন করতঃ শ্বেত গঙ্গায় অবগাহন পূর্বক শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করেন তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না । স্বরূপরাণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে ।

এইস্থান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে, মাদুরা রামেশ্বর সেতুবন্ধ (যাহা বর্তমান সময়ে রামচন্দ্র নির্মিত সেতুবন্ধ ও রামচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত রামেশ্বর শিব) রামায়ণে উক্ত সেতুবন্ধ রামেশ্বর কেমন করিয়া হয় বৃত্তিতে পারা যায় না । বিশেষতঃ রামায়ণে বর্ণিত রাবণের লঙ্কা উজ্জয়িনীর সহিত সমসূত্রে অবস্থিত । আমি যাহা বর্তমানে স্থানীয় প্রবাদে পাইয়াছি এখানে তাহাই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র । ইহার বিচারভার সাধারণের উপর দিয়া আমি অব্যাহতি লইলাম ।

তীর্থ-কাহিনী ।

জেলার অধীন ভারতমহাসাগরে—ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে
মাল্লার উপসাগরের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপোপরি অত্যাচ্চ মন্দিরমধ্যে
রামেশ্বর শিবলিঙ্গ ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ ।

হাওড়া হইতে মাদ্রাজের রেলভাড়া (১৩) তের টাকা । তথা
হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল (South Indian Railway)
রামেশ্বর রোড পর্যন্ত ভাড়া (৫৮) পাঁচ টাকা বারআনা এবং পুরী
হইতে রামেশ্বর রোড রেলভাড়া (১৪৮) চৌদ্দটাকা পনের আনা ।

মাদ্রাজ বিচ (Madras Beach) ষ্টেশনে অপরাহ্ন চারিটার
সময় গাড়ীতে উঠিয়া, পর দিবস বারটার সময় মাদুরা ষ্টেশনে
অবতরণ করিলাম । সেই স্থানে হাত মুখ ধুইবারও অবকাশ হইল
না ; তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্ম লাইনের গাড়ীতে রওয়ানা হইতে হইল । কেহ
কেহ আহাঙ্গাদির জন্য এইস্থানে ধর্মশালায় চলিয়া গেলেন । যাহারা
চেঙ্গলপুট হইতে নামিয়া পদব্রজে মাদুরা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন
তাহারা এই গাড়ীতে উঠিয়া চলিলেন । এ গাড়ীর গতিও যেমন
ধীর ঝাঁকিও তেমনি গো-শকটের ন্যায়—স্থিরভাবে কিছুতেই
বসিয়া থাকা যায় না । গাড়ীতে আরোহীর সংখ্যা কম ; তাই
রক্ষা, নচেৎ প্রাণ লইয়া টানাটানি । আমরা সকলেই এক এক
বেঞ্চে শয়ন করিলাম । তাতেই কি ছাই আরাম আছে ? ঝাঁকির
চোটে যেন হাড় পাজর খসিয়া গেল । বেলা পাঁচটার সময় সমুদ্র-
তীরে “সপ্তপম” নামক ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে (১) গাড়ী হইতে

(১) এক্ষণে সাঁকো হওয়ায় রামেশ্বর পর্যন্ত রেল গিয়াছে ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

নামিয়া পরিভ্রাণ পাইলাম । সাগরকূলে ছোট ছোট নৌকা লাগান ছিল, যাত্রিগণ রেল হইতে নামিয়া ঐ সকল নৌকায় উঠিলে পর মাঝিরা যাত্রী বোঝাই নৌকা লইয়া অনতিদূরে ষ্টীমারের সঙ্গে লাগাইল ; যাত্রিগণ একে একে যাইয়া ষ্টীমারে উঠিল । যাত্রী উঠা শেষ হইল ষ্টীমার অতল জলধি বক্ষ ভেদ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল । যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর দেখিতে লাগিলাম । অসম জলরাশি প্রসারিত হইয়া দক্ষিণগগনে মিশিয়াছে, সমুদ্র যেন অতি ক্রোধভরে তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ! বাতান্দোলিত তরঙ্গমালার পরস্পর আঘাতজনিত ভীমরব শূন্যপথে মিশিয়া যাইতেছে । তরঙ্গ সকল কেনপুঞ্জ উদ্গার পূর্বক আনন্দে নাচিতেছে । দেখিলে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় । আমাদের ষ্টীমারখানি স্থির জল দিয়া যাইতেছে ; জল—কখন নীল, কখন খেত, কখন বা সবুজবর্ণ—নানারঙ্গের জলরাশি অতিক্রম পূর্বক অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বংশীধ্বনি করিয়া দাঁড়াইল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইখানি নৌকা আসিয়া যাত্রিগণকে লইয়া তীরে নামাইয়া দিল । আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া টিকিট দিয়া ধর্মশালা দিকে চলিলাম । অনতিদূরেই ধর্মশালা, তথায় পৌঁছিয়া সর্বাত্মে রন্ধনাদির যোগাড় করিতে লাগিলাম । সমস্ত দিবস গিয়াছে, শ্রান আহার ত দূরের কথা—মল মুক্ত্যাগও হয় নাই । এক্ষণে রামেশ্বর রোডে পৌঁছিয়া প্রাতঃকৃত্য, শ্রান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া রন্ধন ভোজন করিতে রাত্রি আটটা হইয়া গেল । সমস্ত দিন শ্রান্তি

তীর্থ-কাহিনী ।

ক্লান্তির পর রন্ধন ও ভোজন করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে শরীর অলস হইয়া আসিতে লাগিল এবং শয়নান্তে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম । এই স্থান হইতে আট মাইল দূরে রামনাথ বা রামেশ্বর ধাম । অশ্ব-যান ও গোযান পাওয়া যায় ; যেরূপ প্রশস্ত রাস্তা তাহাতে সামর্থ্য থাকিলে পদব্রজে যাওয়াই সুবিধাজনক । আমরা শেষরাত্রে উঠিয়া পদব্রজে যাওয়া স্থির করিয়া নিদ্রিত হইলাম । রজনী শেষে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সঙ্গীয় যাত্রীগণকে জাগ্রত করিয়া একসঙ্গে রামনাথ-ধামাভিমুখে চলিলাম ; মধ্যো মধ্যো পথিপাশ্বে দুই চাঁর ঘর লোকের আবাসবাটি, এবং স্থানে স্থানে ধর্মশালার ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হইল । তদ্ব্যতীত দুই দিকে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি । এই আট মাইল রাস্তা প্রশস্তভাবে বাঁধান । আমরা এই রাস্তা অতিক্রম পূর্বক বেলা আটটার সময় প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র রামনাথধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । এইস্থানে বলা উচিত যে, আমরা যে সময় ষ্টীমার হইতে অবতরণ করি, ঠিক সেই সময়ে রামনাথের পাণ্ডার একজন গোমস্তা আমাদের অবস্থিতি জ্ঞাত্য অনেকগুলি যাত্রী-নিবাস দেখাইল । এই যাত্রী-নিবাসগুলি পাণ্ডাগণ নিজব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ধর্মশালাও আছে । যে কোন স্থানে যতদিন ইচ্ছা যাত্রীগণ থাকিতে পারেন, তাহার জন্য বাসা ভাড়া লাগেনা । আমরা তিন জনের অবস্থিতির জন্য একটি কুঠারী মনোনীত করিয়া আমাদের আসবাব পত্র সেইখানে রাখিয়া গোমস্তা পাণ্ডার সঙ্গে খোদ পাণ্ডার আলয়ে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি এই তীর্থের কর্তব্য সকল বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, আমরা কিন্তু

বুঝিলাম এই তীর্থে স্নান, তর্পণ ও দর্শন ভিন্ন কোন অন্য ক্রিয়াকাণ্ড নাই । পাণ্ডাঠাকুর যে সকল ক্রিয়া কাণ্ডের কথা বলিলেন তাহার প্রায় সকলগুলিই পাণ্ডা মহাশয়ের স্বার্থসাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে, তবে স্নানের বিষয় কোন জোর জবরদস্তি নাই । সাধ্য হইলে পাণ্ডার কথিত মত কার্য্য অনেকে করিয়া থাকেন । সে যাহা হউক, আমরা বলিলাম, “কেবল রামনাথ দর্শন এবং যে সকল স্থানে স্নান করিতে হয় তাহাই করিব, অন্য কিছু করিতে পারিব না”—পাণ্ডাঠাকুর কিন্তু পুনঃ পুনঃ জেদ করিয়া তদতিরিক্ত কার্য্যের অন্য সম্মত করিতে না পারিয়া অগত্যা রামনাথের পূজা ও ভেট বলিয়া কিছু আদায় করিয়া তবে শাস্ত হইলেন । অতঃপর উক্ত গোমস্তা ও জনৈক ব্রাহ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন “লছমন কুণ্ডে” স্নান করাইয়া রামনাথ যাঁইয়া রামেশ্বর শিব দর্শন করাইয়া আন ।

যে সকল যাত্রী বহুকণ্ঠে অতিযত্নে গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গোদক আনিয়া রামনাথের মস্তকে স্বহস্তে ঢালিয়া স্নান করাইবেন মানস করিয়াছিলেন তাহাদের উক্ত কার্য্য স্বহস্তে করা হইল না । কেন না যাত্রীগণ দূরে থাকিয়া রামনাথ দর্শন ভিন্ন নিকটে যাইবার অধিকার পান না, সুতরাং ঐ গঙ্গোদকপূর্ণ ভাণ্ড পাণ্ডাঠাকুরের নিকট দিতে হইল । পাণ্ডাঠাকুর প্রতিভাণ্ডের রাজকর (১০) পাঁচ সিকা ও পূজক ব্রাহ্মণের দক্ষিণা (১০) চারি আনা মোট (১৫) দেড় টাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইলেন । ঐ কর না দিলে রামনাথের মস্তকে জল চড়িবে না । ঐ দেড় টাকা রাজা পাইয়া থাকেন—পাণ্ডাগণের ইহাতে কোন স্বার্থ নাই । রাজার কার্য্যকারকের নিকট ঐ করের টাকা

তীর্থ-কাহিনী ।

সহ গজোদকপূর্ণ ভাণ্ড দাখিল করিয়া দিতে হয় ; তিনি পুরোহিতের দ্বারা কার্য্য করান । এই রাজ্যফন্দী মন্দ নহে । রাজার এইরূপ শীন প্রবৃত্তি ও নীচাশয়তা চিন্তা করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম । হিন্দুরাজার ধর্ম্ম—সাধারণের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করা ; আর ইনি কিনা নিজ রাজ্য মধ্যে সুদূর দিগ্দেশাগত তীর্থযাত্রীগণের নিকট কর আদায় করিয়া পীড়ন করেন । রাজবুদ্ধি কিনা—তাইতে বেশ ফিকির করিয়াছেন । এই মুখদেশে সবই সম্ভব পায় । যেখানে ভবচন্দ্র রাজা সেখানে অবশ্যই গবচন্দ্র মন্ত্রীও আছে ; আমাদের দেশে হইলে বহু নিন্দা হইত ।

আমরা পাণ্ডার নির্দেশ মত গোমস্তার সহিত লছমন কুণ্ডে গমন করিলাম । রামনাথের মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে এই কুণ্ড ; দেখিলাম ইহা একটা ছোট পুষ্কর্ণী বই আর কিছুই নহে । চারিধারই প্রস্তর দ্বারা বাঁধান । পূর্বদিকে স্নানের ঘাট তত্পরি একটা ইষ্টকনির্ম্মিত উন্মুক্ত গৃহ । স্নানের ঘাটে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়াছে ; কেহ স্নান করিতেছেন, কেহবা জল সন্নিধানে সোপানোপরি বসিয়া ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্র বলিয়া সংকল্প দিতেছেন, কেহ বা উন্মুক্ত ইষ্টকালয় মধ্যে বসিয়া দানাদি করিতেছেন ; আবার কোথাও কোন ব্রাহ্মণ কোন যাত্রীর সহিত দক্ষিণা লইয়া বাগ্ বিতণ্ডা ও গণ্ডগোল করিতেছেন ; অন্যত্র কোন ব্রাহ্মণ কোন যাত্রীকে নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া স্বীয় মতলব সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন । স্নানের ঘাটটী সর্বদার জন্যই সরগরম এবং এই দৃশ্য বড়ই আনন্দপ্রদ । আমরা এই সকল দেখিয়া

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

তিনিয়া আর ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকটে না গিয়া লছমন কুণ্ডের জলে নামিবার উপক্রম করিতেই গোমস্তা পাণ্ডা আমাদিগকে ডাকিয়া গৃহে লইয়া বসাইল । তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে নানারূপ ধর্মের কথা বুঝাইতে লাগিল । স্থানীয় ভাষা আমরা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও ভাব ভঙ্গীতে যাহা বুঝিতাম—এখন সময় বুঝিয়া একেবারে অবুঝের মত হইয়া বসিলাম । পাণ্ডা ঠাকুরও আমাদিগকে একেবারে নিরেট বোকা ঠাওরাইয়া বিরত হইলেন । পাণ্ডার ভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আমরা তিন জনই উঠিয়া লছমন কুণ্ডে যাইয়া স্নান করিলাম, সংকল্পদিবার জন্তও আর ঠাকুরকে ডাকিলাম না । তখন ঠাকুর এককালীন নিরাশ হইয়া একজন কনেষ্টবলসহ উপস্থিত হইয়া “চারি পয়সা হিসাবে কর দিতে হইবে” বলিয়া আমাদের উপর দাওয়া করিয়া বসিল । তখন অনন্তোপায় হইয়া কেহ কেহ ঐ কর দিল, কেহ কেহ বা গোলমাল করিয়া চলিয়া গেল । বাসায় উপনীত হইয়া বজ্রাদি পরিবর্তন করতঃ রামনাথ দর্শনার্থ প্রস্তুত হইলাম । গোমস্তা পাণ্ডা একটা তাম্র ঘড়া সহ আসিয়া বলিল “দর্শন করিয়া আসিবার সময় মন্দিরমধ্যস্থ গোরীকুণ্ড হইতে জল আনিতে হইবে, ঐ জলই রন্ধন ও পান করিতে হইবে ।” বাহিরে যেখানে যে কুণ্ডই থাকুক সে সকল জল রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয় না । ঐ সকল কুণ্ডাদক বিশ্বাদ ও ক্ষার বিশিষ্ট ।

আমরা তাম্র ঘড়া হস্তে করিয়া ৬ রামনাথ দর্শনে চলিলাম । লছমনকুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামনাথের মন্দিরের সদর দ্বার পর্যন্ত এক মাইল পরিমিত প্রশস্ত পথের উভয় পাশেই শেণীমূ

তীর্থ-কাহিনী ।

ভাবে স্থানীয় লোকের বসতি, দোকান গৃহ ও ধর্মশালা । আমরা এই উভয় পার্শ্বস্থ সৌধালয়ের মধ্যস্থিত প্রশস্ত পথের উপর দিয়া অর্ধ মাইল গমনের পর পুরদ্বারে উপনীত হইলাম ; পুরদ্বারটি প্রায় (৬০।৭০) ফাট সত্তর হাতের নূন উচ্চ নহে—ত্রিতলবিশিষ্ট । প্রবেশ পথ প্রায় দশ হস্ত প্রশস্ত ; উচ্চ অনুমান বিংশতি হস্ত পরিমিত । আমরা কন্মিন কালেও এরূপ প্রকাণ্ড দেবালয় দর্শন করি নাই ; এই দেবালয়ের মধ্যে একটি পুষ্কর্ণী ও উনিশটি কুণ্ডতীর্থ আছে । দেবালয়ের আয়তন চারি মাইল, এবং এই স্থান উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত । পূর্ব পশ্চিমে বৃহৎ দ্বার, আমরা পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম । পর্ব্বোপলক্ষে এই দেবালয়ের মধ্যে বাজার বসে । বহুতর যাত্রীর সমাগম হওয়ায় তখন এই স্থান একটি নগরে পরিণত হয় । তৎকালে রামনাথের অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিকে বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহ বাহির করা হয় । সর্ব্বদা নৃত্য, গীত, বাদ্য ও আনন্দকোলাহলে স্থানটি আনন্দময় হইয়া উঠে । প্রত্যহ রাত্রিকালে আট দশটি বড় বড় ইলেকট্রিকলাইট্ (Electric Light) দ্বারা আলোকিত করা হয় ; ইহা ভিন্ন নাট মন্দিরের প্রথম দ্বারদেশে দীপমালা ও নাটমন্দিরের মধ্যে ঝাড়, লণ্ঠন দ্বারা আলোকিত করা হয় । আমরা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে শ্রীরামনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ উক্ত নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া গলগলীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গরূপী ভূতভাবন ভবানীপতি ৩রামেশ্বরকে দর্শন করিতে লাগিলাম । নিকটে যাইবার

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

এখা না থাকায় ৩৭রামনাথের সম্মুখস্থ নাটমন্দির মধ্যস্থ প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড ষণ্ড পাশেই যাত্রীগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া রামনাথ দর্শন করিয়া থাকেন । আমরা দর্শনান্তে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের চারিদিকই লম্বা দালান দ্বারা বেষ্টিত, তন্মধ্যে বহুতর দেব দেবীর মূর্তি । আমরা ঐ সকল দেবদর্শন করিতে করিতে শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে উপনীত হইয়া ভবভয়হারিণী, জগজ্জননী পার্বতী দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক মারের ভুবনমোহিনী অপরূপ রূপ দর্শন করিলাম । মারের প্রস্তরময়ী বিভূষামূর্তি—আপাদমস্তক বহুবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন । দর্শকবৃন্দ স্থানে স্থানে বসিয়া কেহ কেহ সুর-তান-লয়-যোগে ক্রতি-মধুর স্তব পাঠ করিতেছেন । কেহ কেহ তানপুরা বা সেতার লইয়া ভজন গান করিতেছেন, কেহ কেহ তদগতচিত্তে জপ বা ধ্যান করিতেছেন, কেহ কেহ বা ভাবাবিষ্ট হইয়া আনন্দময়ী মা'র আনন্দময়ী মূর্তি দর্শন করিতেছেন । মা—সদানন্দময়ী, তাই এস্থলে পূর্ণানন্দ বিরাজমান । শ্রীরামনাথের মন্দিরের স্তায় ঝাড়, লণ্ঠন দ্বারা এ মন্দিরটিও উত্তমরূপে সুসজ্জিত । এই সকল দর্শনান্তে মা'কে প্রণাম করিয়া মন্দির পরিক্রমণ করিলাম । এই মন্দিরের চতুর্দিকও দেবালয়ে বেষ্টিত । দেখিতে দেখিতে পরিক্রমণ করিতে হয় ।

পার্বতীদেবীর রত্নশালার সন্নিহিতে একটি কুণ্ডতীর্থ আছে । ষতগুলি কুণ্ড আছে তাহার মধ্যে এইটির জল সর্বাপেক্ষা ভাল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

কিন্তু কোন যাত্রীকেই এই কুণ্ড স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না । তালাচাবি দ্বারা সর্বদা বন্ধ থাকে । ঐ কুণ্ডের জলেই পূজা, ভোগ ও রন্ধনাদি হইয়া থাকে । আমরা কুণ্ডরক্ষককে একটা পয়সা দিয়া কুণ্ড হইতে এক ঘড়া জল লইলাম ; যে কয়েক দিবস তথায় ছিলাম উক্ত উপায়ে পানীয় জল সংগ্রহ করিতাম । ৬ রামনাথের মন্দিরের অপরদিকে একটা কাছারী আছে, তাহাতে অনেকগুলি কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ; তাঁহারা বিগ্রহের আর ব্যয়ের সমস্ত হিসাব রাখেন । অপর একটা গৃহে পর্কোপলক্ষে বিগ্রহ সজ্জার আনুষ্ঠান সমুদয় রক্ষিত আছে । অন্য একটা গৃহ ভাণ্ডারখানা ; তৎসন্নিহিত অপর গৃহে কার্য্যকারকদের থাকিবার স্থান । এই সকল গৃহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গঠিত নহে । সমস্ত গৃহের ছাদ পরস্পর সংলগ্ন থাকায় জল বা সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না ; অথচ স্থানে স্থানে ভিত্তি না থাকায় উন্মুক্ত পথে বায়ুপ্রবাহ ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে । আমরা ইতস্ততঃ সমস্ত পুরী দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড হইতে জল লইয়া বাসায় আসিয়া রন্ধন ও ভোজন নির্বাহ করিলাম ।

শ্বেতগঙ্গা বা ধনুস্তীর্থ—ইহা রামনাথ ধাম হইতে আট মাইল দূরে । স্থলপথে—পদব্রজে বা গো-শকটে, অথবা নৌকাযোগে—সমুদ্রপথে যাওয়া যায় । আমরা অন্ত্যান্ত যাত্রীর সঙ্গে একযোগে স্থলপথে যাওয়ায়, যাতায়াতের নৌকাভাড়া প্রত্যেককে দুই আনা করিয়া দিতে হইয়াছিল । রাত্রিশেষে—চারিটার সময় নৌকায় উঠিয়া বেলা সাতটার সময় শ্বেতগঙ্গার স্নানঘাটে পৌঁছিলাম ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।

সেতুবন্ধনের সমীপস্থ সমুদ্রের বালুকাময় স্তরই খেতগঙ্গা । এই স্থানে সংকল্প পূর্বক স্নান করিতে হয় । মন্ত্র বলিবার ব্রাহ্মণকে ছু' একটি পয়সা দিলেই তিনি সংকল্পের মন্ত্র বলিয়া স্নান করান । তদ্বিন্ন এখানে অন্য কোন কর্তব্য কার্য্য নাই । আমরা স্নানান্তে নৌকাযোগে এগারটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম ।

পরদিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে চব্বিশতীর্থ স্নানে চলিলাম । রামনাথের পুরীর মধ্যেই উনিশটি কুণ্ড তীর্থ আছে ; অবশিষ্ট পাঁচটি পুরীর বাহিরে—কিঞ্চিৎ ব্যবধানে । ঐ সকল কুণ্ডতীর্থের পৃথক পৃথক নাম আছে ; তবে এই কুণ্ডগুলি ইঁদারা বই আর কিছুই নয় । উহার নিকট বাইয়া জলোত্তোলনপূর্বক স্নান করিতে হয় । এইরূপে চব্বিশটি কুণ্ডে স্নান সমাধা করিয়া বাসায় ফিরিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল । আহারান্তে বৈকালবেলায় রামদ্বারকার চলিলাম । রামদ্বারকার নাম শুনিয়া মনে মনে নানারূপ কল্পনা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে উপস্থিত হইয়া দেখি আমাদের সে কল্পনা জল্পনা মাত্র । রামনাথের মন্দির হইতে একমাইল দূরে উন্নত বালুকাস্তূপোপরি একমাত্র ইষ্টকনির্মিত ছোট একটি গৃহ বৈ আর কিছুই নহে । অভ্যস্তরে শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্কিত একখানি প্রস্তর গ্রথিত আছে । প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র আগমনকালে এইস্থানে প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন—সেই পদচিহ্ন । এই গৃহের ছাদে উঠিলে সেতুবন্ধরামেশ্বরের চতুঃসীমাই দৃষ্ট হয় । আমরা তথা হইতে সন্ধ্যার প্রাকালে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম । এই স্থানের দর্শনীয় বাহা কিছু এই পর্য্যন্তই শেষ হইল ।

তীর্থ-কাহিনী ।

এখানে লোকের বসতি সংখ্যা অতি কম । সাধারণ একটি বাজার আছে তাহাতে সামান্য তরীতরকারী বাহা পাওয়া যায়, তাহাও দুর্লভ । দুই তিনখানি মিঠাইয়ের দোকান আছে, তাহাতে তদেশীয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হয় । ফলকথা এই স্থানে আহাৰ্য্য দ্রব্য ভালরূপ পাওয়া যায় না । থানা, পোষ্টাফিস্, টেলিগ্রাফ্, আফিস্ ও একটি খয়রাতি ডাক্তারখানা মাত্র আছে । জল ভাল নয়—হাওয়া মন্দ নয় ।



কামাখ্যা ।

দেব্যাঙ্ক যোনিপাতেন কামাখ্যাপীঠমুক্তমং ।
সর্বোৎকৃষ্টস্ত তজ্জাতং ভুক্তিমুক্তিবিধায়কং ॥
(শিবপুরাণম্)

যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা ।
যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষণরূপিণী ॥
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাচ্ছমানন্দোহথ ভৈরবঃ ।
সর্বদা বিহরেদেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্রদেবতা ।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাস্বিকা ॥
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সধুমিনী ।
এতানি নব পীঠানি সংশস্তি বরভৈরবাঃ ॥
সর্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে ।
গৌরীশিখর মাকুছ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

(পীঠমালা)

মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষণরূপিণী ।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

(কামাখ্যাতন্ত্রম্)

তীর্থ-কাহিনী ।

অর্থাৎ

বিষ্ণুচক্রে ছিন্না ভগবতী সতীদেবীর যোনিদেশে কামপৰ্বতে পতিত হওয়ায় ভুক্তি (অশেষভোগ) ও মুক্তিদায়ক সর্বোত্তম কামাখ্যা নামে পীঠ হইয়াছে ।

কামগিরিতে যোনি পতিত হওয়ায় সেই স্থানে যোনিপীঠ ও কামাখ্যা নামী দেবী আছেন । যে কাম পৰ্বতে ত্রিগুণের অতীতা রক্ত পাষণরূপিণী কামাখ্যাদেবী বিরাজিতা এবং মাধব-রূপী উমানন্দ নামে ভৈরব বিরাজিত, যেখানে দেবী সকল সময়ে বিহার করিয়া থাকেন, সেই কামগিরিতে শ্রীভৈরবী তারা, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাস্বিকা, বগলা, কমলা, ভুবনেশ্বরী ও ধুমাবতী এই নবপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে শ্রেষ্ঠ নবভৈরব রক্ষা করিতেছেন । দেবী বলিয়াছেন “অন্য স্থানে আমি বিরলা হইলেও কামরূপে কুমারীরূপে গৃহে গৃহে বিরাজিতা আছি ।”

যে ব্যক্তি মনোভব (যোনি) গুহামধ্যে রক্তপাষণরূপিণী মহামুদ্রা স্পর্শ করে তাহার পুনর্জন্ম হয় না ।

আসাম প্রদেশে গোহাটী জেলায়—সহর হইতে তিন মাইল দূরে নীলাচলোপরি কামাখ্যা দেবীর মন্দির ।

শিয়ালদহ হইতে গোহাটী (৪৮৯) চারিশত ঊননব্বই মাইল, ষ্টীমার ভাড়া সমেত রেল ভাড়া (৮৮/১০) আট টাকা সাড়ে তিন আনা । শিয়ালদহ হইতে রওয়ানা হইয়া দামুকদিয়া পর্যন্ত আসিয়া, ষ্টীমারে পদ্মানদী পার হইয়া সাঁড়াঘাটে পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া তিস্তা পর্যন্ত আসিয়া তথা হইতে অন্য গাড়ীতে ধুবড়ি পৌছা যায়

কামাখ্যা ।

এবং ধুবড়ি হইতে টীমার যোগে গোহাটী যাইতে হয় । পূর্ব বিভাগের যাত্রিগণ যাহারা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (Assam Bengal Railway) যাইবেন তাঁহারা উক্ত রেলের লম্ভিৎ জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া ব্রাহ্ম লাইনের গাড়ীতে গোহাটী পৌঁছিবেন ; গোহাটী জেলা হইতে শিলংএর বাকী রাস্তায় তিন মাইল যাইয়া কামাখ্যা পর্বতারোহণ করিতে হয় । পর্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্যন্ত প্রশস্ত সোপানাবলী গ্রথিত থাকায় অনায়াসে গমন করা যায় ; পর্বতারোহণ জন্য ডুলিও পাওয়া যায় । অনুমান দেড় মাইল পথ উল্লেখ উত্তিত হইলেই কামাখ্যা মায়ের সুরহং মন্দির পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহামুদ্রা (যোনিপীঠ) । মহামুদ্রা একটি ক্ষুদ্র গুহা, সর্বদাই স্বর্ণনির্মিত টোপর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । মহামুদ্রার মন্দির দ্বারদেশে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, অনেক যাত্রীই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ।

গোহাটী পৌঁছামাত্রই পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া অবস্থিতি জন্য উপযুক্ত বাসা প্রদান করেন । যাত্রিগণকে বাসা ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়, তবে দু'একটি যাত্রী হইলে বাসা ভাড়া করিতে হয় না, পাণ্ডাগণ নিজ বাড়ীতেই স্থান দিয়া থাকেন ।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের উত্তর দিকে চতুষ্কোণ প্রশস্ত একটি কুণ্ড আছে ; কুণ্ডের চতুর্পার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা বাধান । স্থানীয় লোক স্থান ভোজনাদি কার্য্যে এই কুণ্ডের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন ;

তীর্থ-কাহিনী ।

যাত্রীগণকেও ঐ জল ব্যবহার করিতে হয় । যাত্রীগণ এইস্থানে আগমন করতঃ প্রথমতঃ এই কুণ্ডে অবগাহন পূর্বক স্নান ও তর্পণ করিয়া তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত পার্কণ শ্রদ্ধ করিবেন । শ্রদ্ধের সমস্ত দ্রব্যই পাণ্ডাগণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া শ্রদ্ধ করাইয়া থাকেন । কুণ্ডের দক্ষিণ ঘাটের উভয়দিকে প্রস্তর দ্বারা বেদিকার মত উচ্চ করিয়া বাঁধন আছে, সেই স্থানে বসিয়া শ্রদ্ধ করিতে হয় । তৎপর পীঠপূজা ও কুমারী পূজা উভয়ই সাধ্যানুসারে ষোড়শোপচারে করিতে হয় । এখানে কুমারী পূজা, কুমারীকে ভোজন করান এবং কুমারীকে দান করাই প্রধানকার্য্য । কামাখ্যা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

পূজিতৈকা কুমারী চেতবৈব পূজনং ভবেৎ ।

কুমারী-পূজনফলং যয়া বক্তুং ন শক্যতে ॥

একা চৈদ্যুবতী দেবি পূজিতা স্নাতমলোকিতা ।

সর্বাএব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ স্য ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ

কুমারী পূজনের ফল আমি বর্ণনা করিতে অশক্ত । একটি কুমারী পূজিতা হইলেও তোমারই পূজা হয় ; আর যদি একটি মাত্র যুবতীর অর্চনা করা যায় তদ্বারাই সমস্ত দেবীগণ পূজিতা হইয়া থাকেন ।

অনন্তর কালী, তারা প্রভৃতি আরও নয়টি ষোনিপীঠ আছে, সে সকল দর্শন ও পূজা করিতে হয় । পাণ্ডাগণ সঙ্গে থাকিয়া

কামাখ্যা ।

দর্শন ও পূজা করাইয়া থাকেন । ভূমিকম্পে অনেকস্থান লুপ্ত হওয়ায় সমস্ত দর্শন হয় না, অথচ পাণ্ডাগণ নবযোনি দর্শনের এক আনা হিসাবে দক্ষিণা লইতে ছাড়েন না । উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে হইলে গোহাটী হইতে নৌকা যোগে যাইতে হয় । ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে দ্বীপাকার পর্বতোপরি ইনি প্রতিষ্ঠিত । বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় কোন নাবিকই তথায় যাইতে সাহসী হয় না । তদ্বিন্ন অল্প সময়ে যাত্রীগণ অনায়াসে যাইয়া উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে পারেন ।

এই স্থানের প্রধান একটা কার্য্য স্বীয় ইষ্টে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য পুরস্চরণ করা এবং প্রায় সকল যাত্রীই পুরস্চরণ করিয়া থাকেন । তন্ত্রে লিখিত আছে—নীলাচলে বার, তিথি বা কুর্শ্ব, চক্রাদি কিছুই আবশ্যক হয় না, সে জন্য অনেক যাত্রীই কেহ খণ্ডা পুরস্চরণ,—কেহ মহা পুরস্চরণ করিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণ-ভোজন কার্য্যমাত্রেরই কর্তব্য । শাস্ত্রে লিখিত আছে—

যদযদঙ্গং প্রহীয়েত জ্ঞানতোহজ্ঞানতো হপি বা ।

তৎ সর্বং সাস্ততাং যাতি ব্রাহ্মণস্ত চ ভোজনাৎ ॥

অর্থাৎ

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কোন কার্য্যের অঙ্গহানি হয়, তবে ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা সেই সেই কার্য্যের সেই সেই অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় । এজন্য এখানেও ব্রাহ্মণ ভোজন করান অবশ্য কর্তব্য ।

তীর্থ-কাহিনী ।

বশিষ্ঠাশ্রম—গৌহাটী জেলা হইতে দক্ষিণে পাঁচ ক্রোশ দূরে পৰ্বতাভ্যন্তরে বশিষ্ঠাশ্রম । এইস্থানে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা করিলে পূৰ্ব পূৰ্ব সন্ধ্যা পতিত জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন । বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, ঐস্থানে কিছুই পাইবার উপায় নাই । গৌহাটী জেলা হইতে বাঁধা রাস্তায় তিন মাইল পথ অতিক্রম পূৰ্বক পৰ্বতমধ্যস্থ নিবিড় বন-জঙ্গলময় সংকীর্ণ পথে এক ক্রোশ গমন করিলে আশ্রম পাওয়া যায় । আশ্রমের চতুর্দিকই পৰ্বত ও অরণ্য, এরূপ জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে যে হিংস্র জন্তু নাই তাহা বিশ্বাস হইল না ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন জন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । সে যাহা হউক, এই স্থানে বশিষ্ঠ-দেবের প্রস্তরময় মন্দির এবং তৎসন্নিহিত প্রশস্ত নাটমন্দির মাত্র দৃষ্ট হইল । এই মন্দিরদ্বয় কোচবিহারের ভূতপূৰ্ব মহারাজের ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত ; যাত্রিগণ এই নাটমন্দিরে অবস্থিতি করেন । এই নাট মন্দিরের পশ্চাট্টাগে অনতিদূরে নিৰ্ব্বারবারি কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে । অতি শীতল ও সুনিৰ্ম্মল জল-পান ও অবগাহনে আতপতাপে তাপিত পথিকের ক্ষণকাল মধ্যোই শ্রান্তি দূর হয় । স্থানটীর স্বভাব সৌন্দর্য্য মন্দ নহে—প্রকৃতির যেন গুরু গম্ভীর প্রশান্তভাব । আম, জাম, পনস প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও পুষ্প-পাদপদারা আশ্রমটী পরিশোভিত ; ফল কথা স্থানটী শান্তিময়—মুনি ঋষির আশ্রমের উপযুক্তই বটে । আমরা এই স্থানটীতে উপস্থিত হইয়া দিবা রাত্রি সেইখানেই যাপন করিলাম । পরদিন প্রাতে রওনা হইয়া অতিশ্রমে পদব্রজে মধ্যাহ্ন কালে বাসায়

কামাখ্যা ।

আসিলাম । তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দান দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে হইল । কামাখ্যা তন্ত্রে কথিত আছে কামাখ্যাবাসিনী কুমারীগণই দেবীরূপা ; কোন প্রকারে ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অভক্তি প্রদর্শন করিতে নাই, প্রত্যুতঃ ভক্তিভাবে ইহাদিগের সন্তোষ সাধন করা উচিত ।

এই কামাখ্যায় বহু পাণ্ডা ও মালাকার বাস করে । মালাকারেরাই মহামুদ্রা স্নান করাইয়া পটুবসন দ্বারা আবৃত করতঃ পুষ্পমালা দ্বারা উত্তম রূপে সজ্জীভূত করিয়া তত্পরি স্বর্ণ নির্মিত টোপর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মন্দির হইতে বাহির হয় ; তদনন্তর পূজক ব্রাহ্মণ মায়ের পূজা ও ভোগাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন । প্রবাদ যে মায়ের আদেশানুসারেই একুশ নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । ইহাতে মালাকারগণের প্রতি মায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রমাণিত হয় । অন্ববাচীতেই কামাখ্যা দর্শনের প্রশস্তকাল, কিন্তু তৎকালে দিন-ত্রয় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকায় কেহই মায়ের দর্শন পায় না ; তখন পূজা ভোগ সমস্তই বন্ধ থাকে । অন্ববাচী অস্তে দরজা খোলা হয়, আবার পূর্বের স্থায় দর্শন ও পূজা চলিতে থাকে । এস্থানের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে অষ্টাহের কমে হয় না । যাতায়াত ও স্থানীয় খরচ প্রভৃতিতে প্রতি যাত্রীর প্রায় পঁচিশ টাকা আবশ্যক ।

স্থানীয় লোকের স্বভাব অতি নম্র, পাণ্ডাগণ যাত্রীর সহিত সকলেই ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সকলের অবস্থা অতি হীন । ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার এবং চাল চলন সকলই বাঙ্গালীর স্থায় । সকলেই আমিষভোজী, পর্ব্বতের উপরেই

তীর্থ-কাহিনী ।

একটি সামান্য বাজার আছে, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের আবশ্যকীয় সমস্ত খাদ্যাদিই পাওয়া যায় । বিশেষ প্রয়োজন হইলে জিনিস পত্র গোঁহাটী সহর হইতে খরিদ করিয়া আনিতে হয় । স্থানটী দিন দিনই অরণ্যময় হইতেছে । স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্দ নয়, জল একমাত্র পূর্বোক্ত কুণ্ডের । বহু সাধু সন্ন্যাসী নিরন্তর এই স্থানে উপস্থিত থাকেন । সাধু সন্ন্যাসী গণ মায়ের প্রসাদ পাইয়া থাকেন ; যাত্রি-গণও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে কিছু কিছু দিয়া থাকে ।



চন্দ্রশেখর বা বালাকুণ্ড ।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড পূর্বে মন্দাকিনী স্রুতা ।
উত্তরে চম্পাকারণ্যং দক্ষিণে বাড়বানলঃ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং ময়া প্রোক্তং পঞ্চকোশং মহাফলং ।
যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে জন্তুনির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে রম্যে লোকামর-বিধায়িনি ।
কলৌ কাশ্যাধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে ॥
যদি কদাচিৎ পুরুষঃ পুণ্যবান সৎকুলোদ্ভবঃ ।
গত্বা চ ত্রিয়তে তত্র স গচ্ছেচ্ছিবসম্মিধিঃ ॥
বারাণশ্যঞ্চ কৈলাসে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥
চট্টলে দক্ষিণে বাহুর্ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥
তস্মৈব কটিদেশস্থে বিরূপাক্ষে মহেশ্বরঃ ।
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যঃ সমারোহয়েন্নরঃ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাশ্নোতি মানবঃ ।
বিংশতিকুলসহিতঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥

(চন্দ্রশেখরমাহাত্ম্যং, পীঠমালা চ)

তার্থ-কাহিনী ।

অর্থাৎ

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্বে মন্দাকিনী গঙ্গা, উত্তরে চম্পকারণ্য, দক্ষিণে বাড়বানল—এই চতুঃসীমাবস্থিত পঞ্চ ক্রোশপরিমিত স্থানের নাম চন্দ্রশেখর । এই ক্ষেত্র মধ্যে কোন প্রাণী মৃত হইলে নির্বান মুক্তি প্রাপ্ত হয় । অতি রমণীয় এই চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র মনুষ্যের অমরত্ব বিধান করেন । শ্রীশ্রীশিব বলিয়াছেন “কলিযুগে কাশী-ক্ষেত্র অপেক্ষাও এই চন্দ্রশেখর পর্বত আমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ । যদি কোন সৎকুলোদ্ভব পুণ্যবান পুরুষ চন্দ্রশেখরে গমন করিয়া সেইখানে দেহতাগ করেন, তবে তিনি আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন । কাশীক্ষেত্র, কৈলাস ও চন্দ্রশেখর—এই তিন স্থান আমার প্রিয় হইলেও কলিযুগে চন্দ্রশেখরেই বাস করিয়া থাকি । শ্রীচন্দ্রশেখর আরোহণ করিলে লোকে মুক্তি লাভ করিয়া বিংশতি কুল পর্যন্ত শিবলোক প্রাপ্ত হয়” ।

চট্টলে দেবীর দক্ষিণ বাহু পতিত হওয়ায় তথায় ব্যক্তরূপা ভবানীদেবী ও চন্দ্রশেখর নামে ভৈরব বিরাজিত আছেন ।

শিয়ালদহ হইতে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনের রেলভাড়া (৪৥/০) চারি টাকা নয় আনা । সীতাকুণ্ড ষ্টেশনই চন্দ্রনাথ তীর্থের ষ্টেশন ।

চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইবার এখন কোন কষ্ট নাই । আসাম বেঙ্গল রেল (Assam Bengal Railway) হওয়াতে সকলেই সকল স্থান হইতে অতি সহজেই যাতায়াত করিতে পারেন । এষ্ট তীর্থে যাইবার জন্য চারিটা রাস্তা আছে । পূর্ববঙ্গ ছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বে, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম দেশবাসীকেই কলিকাতা পৌছিয়া শিয়ালদহ

চন্দ্রশেখর বা বালাকুণ্ড ।

হইতে গোয়ালন্দ হইয়া ষ্টীমারে, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের (Assam Bengal Railway) প্রধান ষ্টেশন চাঁদপুর, হইয়া যাইতে হয় । পূর্ববঙ্গ বাসিগণ অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলার লোক সকল নারায়ণগঞ্জ হইয়া ষ্টীমারে চাঁদপুর, আর আসাম বিভাগের যাত্রী সকল ষ্টীমারে গোয়ালন্দ হইয়া চাঁদপুর পৌঁছিয়া রেল সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে আসিয়া নামিতে পারেন । আর যাহারা কলিকাতা হইতে একেবারে ষ্টীমারে যাইবেন, তাহারা চট্টগ্রাম জেলায় পৌঁছিয়া ট্রেনে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারেন । শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ রেল ভাড়া (১৮/০) এক টাকা পনের আনা, তথা হইতে চাঁদপুর ষ্টীমার ভাড়া (১।০) এক টাকা চারি আনা । চাঁদপুর হইতে পুনরায় রেলপথে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে রেলভাড়া (১।৮/৫) এক টাকা সওয়া ছয় আনা ।

যাত্রিগণ ট্রেন হইতে অবতরণ করিবা মাত্র খোদ পাণ্ডার গোমস্তা আসিয়া যাত্রীদিগকে অতীব যত্নের সহিত লইয়া যাইয়া বাসা প্রদান করেন এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন ; তাহাতে যাত্রিগণকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না । যাত্রিগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন গোমস্তার সহিত যে কোন পাণ্ডার বাড়ী যাইতে পারেন । যতদিন থাকিবেন খোদ পাণ্ডার গোমস্তা সঙ্গে থাকিয়া উপস্থিত কার্য্য নির্বাহ করাইয়া দিয়া থাকেন । খোদ পাণ্ডার বেতনভোগী ব্রাহ্মণ আছে, তদ্বারা তৈরিক তাবৎ কার্য্য নির্বাহ হয়, তজ্জন্য উক্ত ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না ।

এই স্থানের কার্য্য—কুণ্ডাদিতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেব দর্শন,

তীর্থ-কাহিনী ।

পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি ; যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি সেই রূপ অর্থব্যয়ে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন । এস্থানের পাণ্ডা-গণের স্বভাব অতি নম্র ; ষাত্রিগণের সহিত বেশ ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন । খোদ পাণ্ডার কার্য্য সাফল্য প্রদান করা ; তাহাও ষাত্রিগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই হয় । শিবচতুর্দশীই চন্দ্রনাথ দর্শনের প্রশস্ত কাল ।

এই তীর্থে দর্শনীয় বহুতর বিষয় আছে ; সে সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে হইলে এই পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বর্ধিত হয়, এজন্য সংক্ষেপে এই স্থানের কার্য্য সকল লিখিত হইল ।

বাসকুণ্ডতীর্থ—এইস্থানে স্নান ও তর্পণ ; কুণ্ডপার্শ্বস্থ মন্দিরে ব্যাসাদি দর্শন, স্পর্শন, যথাশক্তি পূজা, নমস্কার, বটুকমূলে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান, জল সেচন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ।

তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ অথবা অশক্তপক্ষে ভোজ্যদান বা পিণ্ডদান ।

জ্যোতির্ময়—অগ্নিদর্শন, স্পর্শন, হোম ও প্রণাম ।

সীতাকুণ্ড—স্নান ও এইস্থানে পঞ্চ কুণ্ডদর্শন ।

মন্মথনদে স্নান ও তর্পণ এবং এই স্থানে দক্ষিণাকালী দর্শন ও প্রণাম ।

সয়ন্তুলিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও প্রদক্ষিণাদি ।

গয়াক্ষেত্র—পার্বণশ্রাদ্ধ, মাতৃ, পিতৃ, দ্বী বোড়শী ও যুগুন ।

সরস্বতীশিলায়—উনকোটি বিক্রপাক্ষ শিবদর্শন ।

পাতালে—হরগৌরী ও দ্বাদশ শালগ্রাম দর্শন । চন্দ্রনাথ দর্শনাদি ।

চন্দ্রশেখর ।

বাড়বকুণ্ডে—স্নান, তর্পণ ও হোম ।

ব্যাসকুণ্ডে ও দধিকুণ্ডে—স্নান বা অভিষেক ।

লবণাকুণ্ডে—স্নান, তর্পণ ও হোম ।

সূর্যাকুণ্ডে—অভিষেক ও হোম ।

সহস্রধারায়—স্নান ও তর্পণ ।

ব্রহ্মকুণ্ডে—স্নান ।

সুরধুনী গঙ্গায়—স্নান, দর্শন, স্পর্শন ও হোম ।

কুমারীকুণ্ডে—স্নান, তর্পণ, হোম ও কুমারী পূজা । তৎপর
ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাফল্য গ্রহণ ইত্যাদি করিতে হয় ।

স্বরভূনাখাদি—স্বরভূনাথের মন্দির প্রায় একশত বত্রিশ হাত উচ্চ
পর্বতোপরি অবস্থিত । এই স্থানে আরোহণ জন্য ইষ্টক নির্মিত কুড়িটা
সিঁড়ি আছে ; এই সোপান শ্রেণী দ্বারা উপরে উঠিতে হয় ।
আরোহণে বিশেষ কষ্ট নাই । এই মন্দিরটি পর্বতের সমতল ক্ষেত্রের
উপর, মন্দিরের তৃতীয় প্রকোষ্ঠে স্বরভূলিঙ্গ দর্শন ও পূজাস্থে তথা
হইতে অবতরণ করিয়া অন্য পথে পর্বতারোহণ করিতে হয় । এই
পথ পূর্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত ও বন্ধুর ; ধীরে ধীরে পর্বতের কটদেশ
পর্যন্ত উঠিলে বিরূপাক্ষ শিবমন্দির পাওয়া যায় । পূর্বোক্ত স্বরভূ
নাথের মন্দির অপেক্ষা এস্থান প্রায় ছয়শত হাত উচ্চ—পর্বতের
সমতল স্থানে ; তথায় বিরূপাক্ষলিঙ্গ দর্শন ও পূজা অস্তে চন্দ্রনাথ
দর্শনে উঠিতে হয় । চন্দ্রনাথের মন্দির প্রায় সাতশত ত্রিশ হাত উচ্চ
পর্বতের শীর্ষদেশে—সমতল স্থানে । এস্থান অত্যন্ত দূরারোহ,
পথ—অপ্রশস্ত ও বন্ধুর । অনেকস্থানেই গাছ ও লতার আশ্রয়ে

তীর্থ-কাহিনী ।

উপরে উঠিতে হয় ; মানুষ্য ব্যতীত তথায় অন্য জীব আরোহণ করিতে পারে না । পথটী এতই দুরারোহ যে বলবান ব্যক্তি-কেও পথিমধ্যে দুই একবার বিশ্রাম করিতে হয় । ভগবান চন্দ্রনাথের কৃপায় অতি বৃদ্ধগণও ধীরে ধীরে এ পথ আরোহণ করিয়া থাকেন । আমরা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে আরোহণ করিয়া শিখর সমীপস্থ হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করায় মস্তক ঘূর্ণন ও গাত্র কম্পন উপস্থিত হইল, সুতরাং নিরুপায় হইয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম । কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় উদ্ধাবলোকনে উঠিতে লাগিলাম । কঠিন পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে সেই দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া শিখরদেশে উপনীত হইয়া দেখিলাম অল্লোচ্চ মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন । ষাট্টিগণ ভক্তি-রসাভিষিক্ত চিত্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া লিঙ্গরূপী চন্দ্রনাথের অর্চনা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতেছেন । আমিও সমভিব্যাহারী ষাট্টিগণ সহিত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ দর্শন ও পূজাদি করিয়া অতুল আনন্দানুভব করিলাম ; এবং বাহিরে আসিয়া মন্দির সমীপস্থ অশ্বখ বৃক্ষের শুশীতল ছায়ায় উপবেশনান্তে তথাকার অপূর্ব শোভাদর্শন করিতে লাগিলাম । গ্রাম, নগর, অট্টালিকা, সরোবর, বন, উপবন, নদ, নদী, সাগর, পর্বতশ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ প্রভৃতি এককালীন নয়নপথে পতিত হওয়ায় তাহাদিগের পরমাশ্চর্য্য অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আনন্দানুভব-রসে মনঃপ্রাণ অভিষিক্ত হইতে লাগিল । শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথের কি

অত্যানন্দদায়িনী বাসস্থলী, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল, এই সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মহা মহিমার অর্ণব জগদীশ্বর মহেশ্বরের বিভূতির প্রশংসা গান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাস্তবিকই তখন আমার অন্তঃকরণে কি এক অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। পাঠক ! যদি মন প্রাণ জুড়াইতে চাও, যদি পাপতাপে তাপিত দেহ সুশীতল করিতে চাও, যদি স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখিতে চাও তাহা হইলে অবিলম্বে চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ চন্দ্রশেখরে গমন কর ।

অনন্তর অপর রাত্তা দিয়া ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া বাসার আসিলাম। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত সমস্তই তীর্থময় ; পর্ব্বতের মধ্যভাগে সীতাকুণ্ড, ব্যাসতীর্থ ; গুহা মধ্যে শত্ৰুনাথ গয়া (মন্মথনদ) (১) এখানে পিতৃগণের পিণ্ডদানে পিতৃগণ চিরতৃপ্তি লাভ করেন। যাত্রিগণ মন্মথনদে স্নানকরতঃ পিণ্ড প্রদান করেন। সীতাকুণ্ড হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাড়বাকুণ্ড ; অত্যন্ত গভীর জল নিম্নে লৌহজাল বসান আছে, ঐ জালের উপর দাঁড়াইয়া স্নান করিতে হয়। কুণ্ডের একদেশ দিয়া দিবারাত্রি অনবরত অগ্নি জলিতেছে, এই পবিত্র অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিময় জলকুণ্ড বিশ্বয়জনক। সমর

(১) লোকপরম্পরায় ক্রত হওয়া যায় চন্দ্রশেখরে গঙ্গাস্রের পদগয়া, কিন্তু তাহার প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরন্তু গঙ্গাস্রের পদ পীঠাপুরে পতিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় ; তদ্বিষয়ে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। যেমন কালীধামে শিবগয়া, অযোধ্যায় রামগয়া ইত্যাদি অস্রও গয়া আছে সেইরূপ চন্দ্রশেখরে শত্ৰুগয়া।

তীর্থ-কাহিনী ।

সময় সমস্ত কুণ্ড অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া ঐ অগ্নি তৎক্ষণাৎ স্থানে বাইতেছে । এই অগ্নিতে হোম করিতে হয় । পাতালতল হইতে এই জলাগ্নি উত্থিত হইয়া অতিরিক্ত জল একটা প্রণালী দ্বারা কুণ্ড হইতে নিকাসিত হইয়া ব্যাসকুণ্ডে পতিত হইতেছে । অগ্রে এই ব্যাসকুণ্ডে স্নান করতঃ বাড়বকুণ্ডে স্নান করিতে হয় । কুণ্ডের জল সুখোষ । এই বাড়বকুণ্ডের বহির্ভাগে অনতিদূরে দধিকুণ্ড, লবণাক্ষ-কুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ডতীর্থ আছে । দধিকুণ্ডে দুগ্ধ নিঃক্ষেপ মাত্রেই দধি হয়, লবণাক্ষ কুণ্ডের জল লবণাস্বাদ, সূর্য্যকুণ্ডের অগ্নি কিছু বেগুনিবর্ণ । কি পরমাশ্চর্য্য কোশলে এক স্থানে এই প্রকার বিভিন্ন কুণ্ড সকল সমাবিষ্ট হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ মানব চমৎকৃত না হয়, বা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহা-মহিমাম্বিত মহেশ্বরের শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন ।

অতঃপর গুরুধ্বনি ও সহস্রধারাও অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য । গুরুধ্বনি ইহা শিল্পময় পর্ব্বতাজ—গগুশৈলের পাদ দেশ, অত্যন্ত পরিসর বিশিষ্ট একটু স্থান ; এইস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভ আছে, কোনরূপ দাহ পদার্থের সংস্রব নাই এবং অগ্নিও দৃষ্ট হয় না অথচ পাতাচ্ছাদিত জলিতাগ্নির স্থায় গুরুতর ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়, কৌতুকদর্শী দর্শকবৃন্দ মধ্যে কেহ কৌতুকচ্ছলে কোন প্রকার দাহ পদার্থ দিবাযাত্রাই অগ্নি জলিয়া উঠে । এইস্থান হইতে সহস্রধারা বাইতে হয়, ইহা একটা জল প্রপাতের স্থায় ; অত্যাচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে জলরাশি বহুধারায় প্রবল বেগে নিম্নে পড়িতেছে, জল অতি সুশীতল সুনির্ম্মল,—পানাবগাহনে সম্পূর্ণ

চন্দ্রশেখর ।

শৈত্যসুখ অনুভূত হয় । তথাকার সুস্বিদ্ধ মারুতহিলোলে সমস্ত ক্লান্তি দূরীভূত হইয়া নিরুপম সুখ সঞ্চার হইতে থাকে । চন্দ্রশেখরের যাবতীয় তীর্থই অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক । এইস্থান হইতে আবার পর্ব্বতশীর্ষস্থ ব্রহ্মকুণ্ডে যাও, দেখিবে তথাকার কুণ্ডের জল চিরোক্ষ—অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানেই এইরূপ কাণ্ড । সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরে কুমারীকুণ্ড ষ্টেশন, সেখানেও দেখিবে জলের উপর অগ্নি জলিতেছে । এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন জন্ত কাহার ইচ্ছা না বলবতী হয় ?

শিবচতুর্দশীতে এইস্থানে সীতার বাজারে একটি মেলা বসে এবং তৎকালে বহুতর বাজীর সমাগম হয় । আহারীয় সমস্ত দ্রব্যই সীতার বাজারে পাওয়া যায় । এইস্থানে থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল, ডাক্তারখানা এবং মুনসেফী আদালত আছে ; এই স্থান চট্টোগ্রাম জেলার অধীন, চট্টোগ্রাম বিভাগ ।

অবন্তী ।

পাপাদবন্তী সা বিশ্ব মবন্তীতি নিগদ্যতে ।
যুগে যুগেহন্যনাম্নী সা কলা বুজ্জয়িনীতি চ ॥
বিপন্নো যত্র বৈ জন্তুঃ প্রাপ্যাপি শিবতাং স্ফুটং ।
ন পূতিগন্ধং প্রাপ্নোতি, ন সমুচ্ছি যতে কচিৎ ॥
যমদূতা ন যন্তাং হি প্রবিশন্তি কদাচন ।
পরং কোটিনি লিঙ্গানি তন্তাং সন্তি পদে পদে ॥
হাটকেশো মহাকাল স্তারকেশ স্তথৈবচ ।
একং লিঙ্গং ত্রিধা ভূত্বা ত্রিলোকীং ব্যাপ্য সংস্থিতঃ ॥
জ্যোতিঃসিদ্ধবটো জ্যোতি স্তে পশ্যন্তীহ যে দ্বিজাঃ ।
অথবা শ্রীমহাকাল দ্রষ্টারঃ পুণ্যরাশয়ঃ ।
মহাকালস্য তল্লিঙ্গং যৈর্দৃষ্টং দৃষ্টিভিঃ কচিৎ ।
ন স্পৃষ্টাস্তে মহাপাপৈর্ন দৃষ্টাস্তে যমোদ্রুটৈঃ ।
মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি সন্ততং ।
স্মরতঃ স্মরতো নিত্যং স্মরকর্ণাস্মরান্তকৌ ॥

অবন্তী ।

অর্থাৎ

বিশ্বকে পাপ হইতে অবন্ (রক্ষণ) করে বলিয়া সেই পুরীর নাম অবন্তী । যুগে যুগে ঐ পুরীর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও কলিকালে উজ্জয়িনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । এইখানে মৃত্যু হইলে প্রাণি-গণ শিবস্থ প্রাপ্ত হয়, শবদেহ-পুতিগন্ধ বা অধোগতি প্রাপ্ত হয় না । যে অবন্তীপুরীতে যমদূতগণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অবন্তীপুরীতে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ আছেন । একমাত্র শিব-লিঙ্গ হাটকেশ্বর, মহাকাল, ও তারকেশ্বর, এই ত্রিমূর্তিতে ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন । সিদ্ধবট নামক স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন, দ্বিজগণ তাঁহার দর্শন করেন । মহাকালকে দর্শন করিয়া যাঁহারা বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহাকে দর্শন পায় । সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তিগণ মহাকাল লিঙ্গ দর্শন করিলে তাঁহাকে আর পাপ অথবা যমদূতগণও স্পর্শ করিতে পারে না । যাঁহারা মহাকাল, মহাকাল এই নাম মাত্র নিরন্তর জপ করে বিষ্ণু এবং মহাদেব তাঁহাদিগকে স্মরণ করেন ।

এইস্থান রাজপুতনা—মালব রাজ্যের রাজধানী । পূর্বে গোয়ালিয়ারের মহারাজার অধিকারে ছিল, এক্ষণে সিন্ধিয়ার মহারাজার অধিকার ভুক্ত হইয়াছে । এই তীর্থ সিপ্রা নদী তীরে । অবন্তীর বর্তমান নাম উজ্জয়িনী ।

হাওড়া হইতে উজ্জয়িনীর রেলভাড়া (১১৥/০) এগার টাকা নয় আনা । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে (East India Railway) হাতরস্, তথা হইতে অল্প গাড়ীতে মথুরা,—মথুরা হইতে বোম্বাই বরদা

তীর্থ-কাহিনী ।

এণ্ড সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেল (Bombay Baroda and Central Indian Railway) নাগদহ—নাগদহ হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেল (Great Indian Peninsular Railway) উজ্জয়িনী স্টেশন । এই স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সিপ্রা নদী তীরে একটি ধর্মশালা আছে ।

সপ্তপুরী (১) মধ্যে অবস্থী অন্ততম পুরী, ইহা দর্শন না হওয়ায় অনেক সময়েই মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হইত । শরীর ক্ষণভঙ্গুর—আধি ব্যাধি জড়িত ; তার পর, সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকায় অনেক সময় অনবকাশত আছেই, এতদ্বিধা সঙ্গী যোজনা হয় না, এই সকল কারণে ভাবিতাম বুঝি অবস্থী দর্শন আমার ভাগ্যে নাই । অবস্থী দর্শন জন্ত আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও, নানা কারণে যেমন নৈরাশ্র্যই প্রবল হইতে লাগিল, আবার অন্তরিকে নৈরাশ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনোবেগ ক্রমে বর্ধিত হইয়া চিন্তাচঞ্চল্য বাড়াইয়া দিতে ছিল, এবং সত্য কথা বলিতে যেন সেই চিন্তাচঞ্চল্যে বিচলিত হইয়া অবশেষে স্থির করিলাম “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন”—এই মনে করিয়া চিরবাস্তিত অবস্থীধাম দর্শনে বাইতে কুতসংকল্প হইলাম । কিন্তু সঙ্গী যোজনা হয় না, শেষ স্বগ্রামবাসী বৈদেশিক পথানভিজ্ঞ একটি লোককে কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য স্বীকারে সহযাত্রী করিয়া এবং গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন দর্শনার্থে আরও চারিটি বাত্রী সহকারে ১৩১৭ সালের

অবস্খী ।

২রা আষাঢ় তারিখে বাড়ী হইতে রওনা হইলাম । পশ্চাত্তর যাত্রীদিগের সঙ্গে গয়া, কাশী, প্রয়াগ দর্শনান্তে বৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া লোকপরম্পরায় অবস্খী যাইবার পথ ঘাট কিয়ৎ-পরিমাণে অবগত হইলাম ।

১০ই শ্রাবণ প্রাতে অবস্খী বা উজ্জয়িনী গমনাভিলাষে বৃন্দাবন হইতে রওনা হইলাম । বৃন্দাবন ষ্টেশনে যাইয়া উজ্জয়িনীর টিকিট না পাওয়ায় এক আনা দিয়া মথুরা জংসনের টিকিট লইয়া রওনা হইলাম । মথুরা জংসন ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই শুনিলাম উজ্জয়িনীর গাড়ী প্রস্তুত, শীঘ্রই রওনা হইবে, তখন তাড়াতাড়ি (৩৮/০) তিন টাকা পনের আনায় টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম । আটটার সময় গাড়ী ছাড়িল । গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, আমরা ভিন্ন আর একটীও বাঙ্গালী নাই, সমস্তই হিন্দুস্থানী লোকে পূর্ণ, গাড়ীতে আলাপ করিয়া যে সুখী হইব সে আশাও নাই ; এমন স্থলে “তত্র মোনং হি শোভনং” । সুতরাং এই ভাবিয়া বেঞ্চের কোন্ঠেসা হইয়া বসিয়া “মহাকাল” চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিলাম । সময় বুঝিয়া ভবথপুর ষ্টেশনে জলযোগ করিয়া লইলাম । ক্রমে দিবাবসান হইয়া রাত্রি হইল,—রাত্রিতেও মধ্যাহ্নের স্তায় একটী ষ্টেশনে গাড়ী কিছু বেশী কাল থাকায় আমরা নামিয়া পুনরায় জলযোগ করিয়া লইলাম । জলযোগান্তে গাড়ীতে উঠিয়া কখন শয়নে—কখন উপবেশনে রাত্রি প্রায় অতিবাহিত হইয়া পাঁচটার সময় নাগদা-জংসন ষ্টেশনে নামিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম । নাগদা হইতে সাড়ে সাতটার সময়ে জি, আই, পি,

তীর্থ-কাহিনী ।

(G. I. P. Railway) রেলের উঠিয়া তিনটী ষ্টেশন বাইরা উজ্জয়িনী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম । এইখানে অবতরণ করিবারাত্রই পাণ্ডা (কিশোরিলাল) যুটিয়া গেল । তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সহরের মধ্যদিয়া একমাইল গমনান্তে সিপ্রাতটে রামঘাটে রুদ্র সাগরের নিকট ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম । ধর্মশালায় বজ্রাদি রাখিয়া স্নান ঘাটে বাইরা স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি শেষ করতঃ মহাকাল দর্শনে চলিলাম । পূর্বেই বলিয়াছি সপ্তপুরী মধ্যে অবস্থী অন্ততম পুরী । এই অবস্থী দর্শনে সপ্তপুরী দর্শন পূর্ণ হইল ; তারপর, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে মহাকাল অন্ততম জ্যোতির্লিঙ্গ, ইহাকে দর্শন করিব,—হৃদয়ে অপার আনন্দ উপস্থিত হইল । বহুদিন যে আশাবীজ হৃদয় ক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলাম, ইদানীন্তন মনে হইত ঐ বীজ উষর মৃত্তিকায় বা প্রস্রব মধ্যে রোপিতের জায় কখন অঙ্কুরিত, পুষ্পিত কিম্বা ফলিত হইবে না ; কিন্তু পিতামাতা ও কুলদেবতার আশীর্বাদে আজ সেই আশা ফলবতী হওয়ায় হৃদয়ে অতুল আনন্দানুভব হইতে লাগিল । শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসা যেন মুহূর্তের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল । পাণ্ডাঠাকুরের নিযুক্ত লোকের সঙ্গে সেই কালান্তক—কালভয় নিবারক মহাকাল দর্শনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । যে রাম ঘাটে স্নানাদি করিয়াছি ঐ ঘাটের উপরেই পিশাচমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন, পূজা ও বন্দনাদি করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ দর্শনাদি করিলাম । তৎপর অগস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শনাদি করিতে হয় । কাশীতে যেমন মহাকাল ভৈরব—

অবস্থা ।

এখানেও সেইরূপ অগস্ত্যশ্বর লিঙ্গ । ইহার পূজনাতির পর
হর্ষদেবী ও অন্নপূর্ণা দর্শন ও বন্দনাদি অস্ত্রে কিছু দূরে গমন করিলেই
মহাকালের মন্দির পাওয়া যায় । এখানে যতগুলি মন্দির আছে
তন্মধ্যে এই মন্দিরটি সর্বপেক্ষা বৃহৎ । ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দির
মধ্যস্থ পথে তলদেশে যাইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীশ্রী মহাকাল শিবলিঙ্গ
দর্শন করিতে হয় । এই মহাকাল শিবলিঙ্গ উচ্চ হস্তদ্বয়
পরিমিত—সু দৃশ্য । মহাকালের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ভক্ত
ব্রাহ্মণগণ বসিয়া স্বরসংযোগে স্তবাদি পাঠ করিতেছেন । আবার
কতকগুলি যাত্রী ভক্তি ভরে, গদগদস্বরে মুদ্রোচ্চারণ করিয়া
মহাকালের মস্তকোপরি গজাজল বিশ্বদলাদি অর্পণ করিতেছেন,
কেহ কেহ বা ভূপৃষ্ঠে জামুসংলগ্ন করতঃ গললগ্নীকৃতবাসে কুতা-
ঞ্জলি পূর্বক মহাকালের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া আত্মনিবেদন
করিতেছেন । ঐ সকল ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া দেখিলেই মনে হয়
সকলের মুখেই একটি অলৌকিক, অভূতপূর্ব, অপার্থিব ভাবের
আবির্ভাব হইয়াছে । আমিও সদানন্দের আনন্দনিকেতনে আসিয়া
অপার পরমানন্দলাভ করিলাম । আমি শ্রীশ্রীমহাকালকে দর্শন করি-
তেছি এমন সময় সহসা মহাকালের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে দৃষ্টি নিপ-
তিত হওয়ার শ্রীশ্রীপার্বতী মাতা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । তদর্শনে
মনে হইল, বুঝি এই কৈলাস ধাম,—তাই হরপার্বতী এক সঙ্গে
বিরাজিত । কলিতে প্রায় মনুষ্যই অধর্ম্মাচারী, অবিশ্বাসী এবং
অলস প্রকৃতি ; নতুবা যদি কৈলাস জ্ঞানে এইস্থান দর্শন করেন
তাহা হইলে অনায়াসেই জীব মুক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু

তীর্থ-কাহিনী ।

আয়াসসাধ্য কার্যে কেহই প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াই বোধ হয় এই স্থানের নাম উজ্জয়িনী দিয়াছেন । সে বাহা হউক, আমরা ত্রীশ্রীমহাকাল ও পার্বতী মাতাকে দর্শন পূজা, আশ্ব-নিবেদন, প্রণিপাতপূর্বক তথা হইতে বহির্গত হইয়া অন্তপথে কয়েকটা সোপান অতিক্রমাস্তে ঐ মন্দিরের উপরতালায় উঠিলাম । মন্দিরটা যে দ্বিতল তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই, উপরে উঠিয়া জানিলাম মন্দিরটা—দ্বিতল । মহাকালের মন্তকোপরি মন্দিরের মধ্যস্থানে ওঁ কারেশ্বর নামক স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছেন । তাঁহাকে দর্শন, পূজা, স্পর্শন ও প্রণাম করিয়া ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । অহারাতে আর কোন স্থানেই যাওয়া হইলনা ; পূর্বদিন দিবা রাত্রি রেলের অতিবাহিত হইয়াছে, সেজন্য অহারাতে আলস্য ও শ্রান্তি কিছু বেশী বোধ হওয়ার আমরা দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও সমস্ত রাত্রি ধর্মশালাতেই বিশ্রাম করিলাম । পরদিবস সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্তে স্নান, সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের নিযুক্ত লোক সঙ্গে লইয়া স্থানীয় দেব দর্শন ও পঞ্চ ক্রোশ পরি-ক্রমণার্থ বহির্গত হইলাম । সমস্ত পথ গাড়ীতে যাওয়া যায় না, বিশেষতঃ পদব্রজে দেবদর্শনে গমনকরা শাস্ত্রোক্ত এবং চিত্ত প্রশমকর, সেইজন্য পদব্রজেই চলিলাম । দর্শনীয় প্রত্যেক স্থানের ও প্রত্যেক দেবতার ঐতিহাসিক ঘটনা লিখিতে গেলে এত বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া সংক্ষেপে সমস্তবিস্তৃত করিলাম ।

সিপ্রাতটে পিশাচমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন প্রণামাস্তে রামঘাট,

অবস্থা ।

ছত্রিঘাট, গন্ধর্ববতীঘাট, গন্ধর্ব মহাদেব শিবলিঙ্গ ; মঙ্গলঘাট, অনন্ত ভগবান (বিষ্ণুমূর্তি) গণপতি প্রভৃতি দেবদর্শন করিয়া দত্তাত্রেয় ঘাটে উপনীত হইতে হয় । এই ঘাটের পর পারে মহারাজা রণজিৎ সিংহের আবাস স্থান—ঐ ঘাট হইতেই উহা দৃষ্ট হয় । তৎপর প্রয়াগ ঘাটে—প্রয়োগেশ্বর শিবলিঙ্গ, মহা শ্মশান, তিলভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ ; তাহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বটবৃক্ষতলে ছোট একটি মন্দির মধ্যে রণমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শনাদির পর তৎসন্নিহিত কপিলঘাট বা কপিলতীর্থে স্নান করিতে হয় । এই স্থান হইতে সিপ্রাতট পরিত্যাগ করিয়া কিম্বদ্বারে ভর্তৃহরির গোফা (গুহা)য় আসিতে হয় । ঐ গোফাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বনামধ্যাত মহাকবি ভর্তৃহরি তপশ্চা করিতেন । তাহা পবিত্র স্থান বোধে অনেক যাত্রীই দর্শন করিয়া থাকেন । ঐ গোফার উপর প্রস্তর দ্বারা একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছে । বর্ত্তিকাহস্তে গৃহমধ্যস্থ পথ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তলদেশে যাইলে তাপসের আসন মাত্রই দর্শন হয়, অত্য়কিছু দর্শনীয় নাই । আমরা ঐ পবিত্র স্থান মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বাহিরে আনিয়া একটি সাধুর নিকটে বসিলাম । সাধু মহারাজ, সেই ভর্তৃহরি মহাত্মার স্থানটী অধিকার করিয়াছেন । এই গোফাটী সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশেরও কিছু বেশীদূর ব্যবধানে অবস্থিত । ঐস্থান হইতে প্রান্তর মধ্যদিয়া উত্তর ভাগে অর্দ্ধমাইল বাইয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত কালিকাদেবী দর্শন করিতে হয় । কালী মূর্তি বলিলেই আমাদের স্বতঃই মনে হয় শবাসনা, নৃমুণ্ডধারিণী, অসিধরা, বরাভয় করা চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহা মেঘপ্রভা, দিগ-

তীর্থ-কাহিনী ।

বসনা, করালবদনা ভীমা মূর্তি । এই কালী মূর্তিতে ঐ সকল কিছুই নাই, আছে কেবল মন্দির মধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে সিন্দূর মণ্ডিতা অতি-বিকটবদন মাত্র । ইহার ষথারীতি পূজা ভোগাদি হইয়া থাকে । এইস্থানের অদূরে গণপতি ও তৎসম্বিহিত স্থানে কৃপানিধান্জি শিবলিঙ্গ, ভগবান বিষ্ণুমূর্তি ও ক্ষেড়াপতি হনুমান আর কিঞ্চিদূরে গোরাভৈরব শিবলিঙ্গ । এই সকল দর্শন করিয়া সে স্থানে হইতে প্রাস্তর মধ্যদিয়া এক মাইল যাইয়া সিপ্রা নদী পার হইতে হয়—পারের দক্ষণ পারানীকে একটা পয়সা দিতে হয় । এই ঘাটের অর্দ্ধ মাইল দূরেই কেল্লা (এক্ষণে জেলখানা) ; ঐ কেল্লাস্থান দক্ষিণে রাধিয়া নদীতীর দিয়া অর্দ্ধমাইল গমন করিয়া কাল ভৈরব শিবলিঙ্গ দর্শনাদির পর প্রত্যাবর্তন করিয়া সিপ্রাতটে আসিতে হয় । এই স্থানে ঘাটটা প্রস্তর সোপান দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান । ঘাটের নিকটেই একটা বটবৃক্ষ আছে—ঐ বটবৃক্ষকে সিদ্ধবট বলে ; সিদ্ধবটকে দর্শন ও প্রণাম করিতে হয় । এইস্থানে একটা ধর্মশালা আছে । এই ধর্মশালার তলদেশে গুপ্তেশ্বর শিবলিঙ্গ ও কার্তিক স্বামীর গুহা আছে । ঐস্থান হইতে ফিরিয়া পুনর্বার পারঘাটে পার হইয়া প্রায় এক মাইল প্রশস্ত সড়ক পথে গমন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করতঃ প্রাস্তর মধ্যদিয়া এক মাইল যাইয়া ধর্মরাজের মন্দির ও মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ দর্শনাদি করিয়া পুনরায় তথা হইতে এক মাইল আসিয়া অঙ্গপাত, বিশ্রাম জনার্দন, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করিয়া বিষ্ণুনাগরের নিকট উপস্থিত হইতে হয় । বিষ্ণুনাগরের নিকটে দামোদর কুণ্ড ও তন্তীরস্থ মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত

অবস্থা ।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি এবং অপরমন্দির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা দর্শনাদি করিয়া পশ্চিমধ্যে অশ্রান্ত দেব দর্শনাস্থে মহামুনি সন্দীপনীর আশ্রমে আসিতে হয় । এই আশ্রম সন্নিহিত একটি কুণ্ডকে গোমতী গঙ্গা বলে, এই গোমতী গঙ্গার বারি শিরে ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় । পূর্বকালে সম্ভবতঃ আশ্রমস্থান ফলপুষ্প শোভিত নির্জন বন্য প্রদেশ ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে অট্টালিকাময় ছোট একটি বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে । ঐ বাড়ীর মধ্যস্থলে প্রস্তরনির্মিত গৃহমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বল-দেবের বসিবার গদী আছে । পূর্বদিকের গৃহমধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সন্দীপনী মুনির প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে । তথা হইতে পাকা সড়কপথে প্রায় এক মাইল আসিলে সহরপল্লী প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমরা এই সহরপল্লী মধ্যে চৌধটি ভবানী দর্শন করিয়া ধর্মশালা অভিমুখে আসিতে লাগিলাম । সহর মধ্যে নৃসিংহজি, শঙ্করজি প্রভৃতি দেব দর্শন করিয়া বিষ্ণুমন্দির ও বিক্রমাদিত্যের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং সদর দরজা দেখিয়া ধর্মশালায় পৌঁছিতে ৩টা বাজিয়া গেল ।

পরদিবস ব্রাহ্মণ-ভোজনাস্থে বৈকালে বাজার দেখিতে চলি-লাম ; বাজারটি মন্দ নহে । বড় বড় দোকান সম্বিষ্ট আছে, সমস্ত গৃহগুলির ছাউনী খোলার । দ্বিতল ত্রিতল গৃহও আছে, তাহাদের মস্তকও খোলা দ্বারা মণ্ডিত । সহরতলীর রাস্তাঘাট অপরিষ্কৃত ; পল্লীর রাস্তা ততোধিক । জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত না থাকাতেই রাস্তাগুলি গলিত পুতিগন্ধময় । সহরবাসী মুসলমান

তীর্থ-কাহিনী ।

ধনীই অত্যধিক ; হিন্দু—বিশেষতঃ পাণ্ডাদের অবস্থা নিতান্ত হীন ।
গাঙাগণ বাজীদিগের সহিত কোন অসদ্ব্যবহার করেন না । সহরের
নানাস্থানে জলের কল আছে—কিন্তু দূরে দূরে । রাত্রিকালে
আলোর বন্দোবস্তও আছে বটে, কিন্তু সহর পল্লীর আলোগুলি অতি
দূরে একত্রে চলা ফেরা বড়ই অসুবিধা । মহারাজার বিশেষ দৃষ্টি না
থাকাতেই এই সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।



উঁকারেশ্বর

৩

অমরেশ্বর ।

মধ্যপ্রদেশে নিম্নার জেলার অধীন নর্মদা নদীর কূলে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিংগ অমরেশ্বর ও পরগারে বিদ্যমান পর্বতের উপরিভাগে উঁকারেশ্বর ।

হাওড়া হইতে উজ্জয়িনী রেলভাড়া (১১৮/০) এগার টাকা নয় আনা, তথা হইতে মেরাটকা (মেরিঘাট ৮৮/১৫) পৌনে পনের আনা । মেরাটকা হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সাড়ে তিন ক্রোশ ব্যবধানে ; বয়াল (গো) গাড়ীতে বা প্রশস্ত সড়ক পথে পদব্রজে যাওয়া যায়—ঘোড়ার গাড়ী নাই । বয়াল (গো) গাড়ীর ভাড়া সাত আনার বেশী নহে, বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় ।

উজ্জয়িনী দর্শন শেষ করিয়া প্রাতে সাড়ে আটটার সময় রাজপুতনা মালওয়া রেল (Rajputna Malaya) উঠিয়া এগারটার সময় মহ নামক ষ্টেশনে নামিলাম ; এই স্থান হইতে অত্র গাড়ীতে যাইতে হয় । গাড়ীর অপেক্ষায় অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হইল । এই অবসরে জলযোগাদি করিয়া লইলাম । দেড়টার সময়ে গাড়ী আসিলে সেই গাড়ীতে উঠিলাম । এই গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে ইঞ্জিন । কেন যে ঐরূপ দুইখানি ইঞ্জিন, প্রথমে তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে

তীর্থ-কাহিনী ।

পারিলাম না। কিন্তু দুইটা ষ্টেশন অতিক্রম করিতে না করিতেই এক অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এই অভিনব রাজ্যের চতুর্দিকেই কেবল বিশাল পাহাড়—জনপদ বা কৃষিক্ষেত্রাদি কিছুই নাই। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের গাড়ী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; এমনি অন্ধকার যে নিকটস্থ লোকও দৃষ্ট হয় না; যেন ঘোর মেঘাবৃত তমসাচ্ছন্ন অমানিশা। কেবল গাড়ীর শব্দমাত্রই শ্রুতিগোচর হইতেছিল, আর যেন বোম্ব হইতেছিল যে ক্রমে ক্রমে কিছু উর্কে উঠিতেছি। পূর্বে গাড়ীতে যে দুইখানি ইঞ্জিন সংযোজন দেখিয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম এই পর্বত ভেদ করিয়া দ্রুত যাওয়ার জন্যই দুইখানি ইঞ্জিন সংযোজিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকার ভেদ করিয়া পরিষ্কার আলোকে আসিলাম। আবার পূর্ববৎ অন্ধকার—আবার কখন আলোক। এমনই ভাবে কখন বা আলোক কখন বা অন্ধকার-রাশি ভেদ করিয়া পার্শ্বত পথে আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী ক্রমে পার্শ্বত পথ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া—ষ্টেশনে থামিল। অমনি পশ্চাতের ইঞ্জিনখানি খুলিয়া গেল, গাড়ী পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। ক্রমে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চারিটার সময় সরাটকা বা সেরিঘাট ষ্টেশনে গাড়ী লাগিবামাত্র বহুসংখ্যক যাত্রী সহ ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইলাম। বৈশাখ, শ্রাবণ এবং কার্তিক এই তিন মাস ওঁকারেশ্বর দর্শনের প্রশস্ত কাল; এটা শ্রাবণ মাস তাই বহু সংখ্যক যাত্রী চলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল আমরাহু'জন

ওঁকারেশ্বর ও অমরেশ্বর ।

মাত্র । ষ্টেশনে উপনীত হইবামাত্র বহুতর পাণ্ডা আসিয়া আমা-
দিগকে ধরিল । এই স্থানে বাত্রী রাখিবার জন্য পাণ্ডাগণের আগন
আগন গৃহ আছে । বাত্রীগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন পাণ্ডা স্বীকার
করিয়া তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন, ধর্মশালাও আছে,
তাহাতেও থাকা যায় । এই স্থান হইতে ওঁ কারেশ্বর সাত মাইল
দূর ; সড়ক পথ—গাড়ী বা পদব্রজে যাওয়া যায় । অপরায়
ছয়টার মধ্যে নন্দদা পার না হইলে রাত্রিতে পার হওয়া যায় না ।
কাছেই অনেক বাত্রী সেদিন ঐ স্থানেই থাকিয়া যায় । আমরা
বাইব কি থাকিব ভাবিতেছি ইতিমধ্যে একজন মাড়োয়ারিকে
(১৭০) দশ আনা ভাড়া বন্দোবস্তে একখান বয়াল (গো) গাড়ী
ভাড়া করিয়া গমনোদ্যত দেখিয়া আমরা দুইজন তাহার গাড়ীর
অংশীদার হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম । পরপারে বাইতে না
পারিলেও থাকিবার অনুবিধা নাই । সেঠের (মাড়োয়ারির)
পরামর্শে গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় নন্দদাকূলে পৌঁছিলাম ; কিন্তু
পার হইবার উপায় নাই, নৌকা বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং সে রাত্রি
নন্দদাকূলে সেঠজির পরিচিত একটা বিষ্ণুমন্দিরে থাকিয়া রাত্রি
কাটাইলাম । সেঠের নিকট স্থানীয় অবস্থা ও দর্শনাদির বিষয়
সমস্ত শুনিয়া গইলাম ।

এই স্থানে রুদ্রপুরী, ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী নামে তিনটি স্থান
আছে । যে স্থানে ওঁ কারেশ্বর আছেন, তাহাকে রুদ্রপুরী বলে ।
আমরা যে স্থানে রাত্রি বাস করিলাম তাহার নাম বিষ্ণুপুরী ;
বিষ্ণুপুরীর অদূরে মার্কণ্ডের ঘাটের পূর্বাংশে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখ-

তীর্থ-কাহিনী ।

ভাগে ব্রহ্মপুরী । ব্রহ্মপুরীতে ওঁকারেশ্বর, বিষ্ণুপুরীতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মপুরীতে লক্ষ্মীনারায়ণ এবং জ্যোতির্লিঙ্গ, অমরেশ্বর, কপিলেশ্বর, কাশী-বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন । এই ব্রহ্মপুরী প্রভৃতি স্থান ও দেব দর্শন করা যাত্রী যাত্রেরই একান্ত কর্তব্য । যদি সময় পাই কল্যাণে বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মপুরী দর্শন করিব, এই কল্পনা স্থির করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে রাজি কাটাইলাম । পর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সময় না পাওয়ার তাড়াতাড়ি নর্মদা নদীর কূলে যাইয়া বাটোয়ালাকে দুটি পরসা দিয়া ডোঙ্গা (একরূপ নৌকা) র চড়িয়া নদী পার হইলাম । কথা হইল ফিরিবার কালে ব্রহ্মপুরী ও ব্রহ্মপুরী দর্শন করিয়া যাইব । নর্মদা অমরকণ্টক পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে । পরিসর বেশী না হইলেও অত্যন্ত গভীর ও স্রোতস্বতী । দুইটি বিস্তৃত ঘাট প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান ; অলমধ্য হইতে সোপানশ্রেণী উঠিয়া ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বসতির মধ্যস্থ পথের সঙ্গে যোগ হইয়া উপর দিকে ওঁকারেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে ।

ওঁকারেশ্বরের মন্দির নর্মদা নদীর মধ্যস্থ বিস্তৃত পর্বতের ঢালু প্রদেশে ; তৎপাশ্বেই পাণ্ডাগণের আবাস বাটি । নীচের তালার বাসস্থান, সম্মুখভাগে স্ব স্ব দোকান, উপর তালার যাত্রীদের থাকিবার স্থান । প্রায় সমস্ত ঘরই দ্বিতল, কিন্তু সমস্ত গৃহের মস্তকই খোলার ছাউনী দ্বারা মণ্ডিত । আমরা ঐরূপ উপর তালার একটা কুঠারী প্রাপ্ত হইলাম । এখানে যাত্রী থাকার গৃহের অভাব নাই, বাসা ভাড়া লাগে না । যাহাকে পাণ্ডা স্বীকার করা যায় তাঁহার গৃহেই বাসা করিতে হয় । পাণ্ডাকে যাহা কিছু দেওয়া

উকারণের ও অমরেশ্বর ।

যায় তাহাতেই বাসাতাড়ারও নিশ্চিন্তি হয় । পর্বত জন্ত স্থানীর
পথ ঘাট গৃহ সকলই উচ্চ নিম্ন ।

আমরা! স্ব স্ব বজ্রাদি কুঠারীতে বক্ষা করিয়া নশ্বদা-মানার্থ প্রস্তুত
হইলাম । নশ্বদা পুণ্যতোয়া নদী, নশ্বদামাহাত্ম্যে লিখিত আছে ।

নশ্বদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃত্য ।

তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥

সর্বপাপহরা নিত্যং সর্বদেবনমস্কৃত্য ।

সংস্তুতা দেবগন্ধর্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ ॥

নশ্বদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ।

তেন পুণ্যা নদী জেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥

নশ্বদায়া জলং পীত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং ।

দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ ॥

এতৎ তীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রজতে রুদ্রমন্দিরং ॥

স্থাবর জঙ্গমাদির জাগকারিণী এই নশ্বদা নদী—নদীর মধ্যে
শ্রেষ্ঠা এবং দেবাদিদেব মহাদেবের দেব দেহ হইতে নিঃসৃত্য ।
এই নশ্বদা নদী সতত সর্ব প্রকারের পাপ হরণ করিয়া থাকেন
বলিয়া দেব গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণ সতত ইহাকে প্রণাম ও ইহার
স্তবাদি করিয়া থাকেন । অর্থাৎ স্বয়ং শিব নিত্যই নশ্বদা নদীকে
সেবা করেন, সেই জন্ত নশ্বদা নদী পুণ্যতমা এবং ব্রহ্মহত্যা

তীর্থ-কাহিনী ।

মহাপাপও বিনাশ করিয়া থাকেন । নশ্বদার জল পানান্তে শিবকে অর্চনা করিলে তীর্থমাহাত্ম্য বশতঃ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । নশ্বদা তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যিনি প্রাণত্যাগ করেন, তিনি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া থাকেন ।

নশ্বদা স্নানার্থ যাইবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের আদেশ মত নশ্বদা ও ঔকারেশ্বরের পূজোপকরণ সাড়ে চারি আনার খরিদ করিয়া লইয়া স্নানের ঘাটে উপস্থিত হইলাম । স্নানের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতেছেন, সংকল্প দিতেছেন, তর্পণ করিতেছেন, এবং কেহ কেহ পাণ্ডার কথিত মত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যুক্ত করে স্তবাদি পাঠ ও পূজা করিতেছেন । আমরাও পাণ্ডার কথিত মন্ত্র বলিয়া স্নান, তর্পণ ও পূজা শেষ করিলাম । এতকাল স্নানাদি কালে জল শুদ্ধার্থ করনা করিয়া আবাহন পূর্বক যাহার জলে স্নানাদি করিয়াছি. আজ সেই নশ্বদার অবগাহন স্নান করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দ, অতুল তৃপ্তি লাভ করিলাম । স্নানান্তে ঔকারেশ্বর দর্শনে চলিলাম । অনতিদূরেই প্রস্তরনির্মিত ঔকারেশ্বরের মন্দির ; মন্দিরটি অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র নহে, তলদেশ মন্দিরপ্রস্তর মণ্ডিত । নাটমন্দির অতিক্রম পূর্বক গর্তৃগৃহে উপনীত হইলাম, এই গৃহের মধ্যস্থল ভিত্তি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত । উক্ত ভিত্তিগাত্রে যে প্রবেশদ্বার আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র, একটা লোক ব্যতীত এক সঙ্গে দুইটা লোক প্রবেশ করিতে পারে না । বুকিং অফিসে (Railway booking office) টিকিট লইবার জন্য দ্বারে বেক্রপ জনসমাগম হয়, সেইরূপ বহুতর যাত্রী প্রবেশ জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত ।

ওঁকারেশ্বর ও অমরেশ্বর ।

আমরা পাণ্ডার পশ্চাতে পশ্চাতে ঐ দ্বার দিয়া উপড় হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম । এই গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে জ্যোতির্লিঙ্গ ত্রীত্রীওঁকারেশ্বর মানবের মুক্তিদাতারূপে বিরাজিত । তৎপার্শ্বে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিকে ৮।১০ জনের বেশী লোক বসিবার স্থান সংকুলান হয় না । আমাদের মন্দির-প্রবেশের পূর্বেই কয়েকটা দ্বারী প্রবেশ করিয়া বসিবার স্থান টুকু অধিকার করিয়া লইয়া-ছিলেন । আমরা এক পাশ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম । ইতোমধ্যে কিছু স্থানের অবকাশ হইয়াছে দেখিয়া সেইস্থানে বসিয়া পাণ্ডার উপদেশ মত পূজা শেষ করিলাম । এই ওঁকারেশ্বর শিবলিঙ্গটি অর্ধ হস্ত পরিমিত অতি সুদৃশ্য এবং অনাদি লিঙ্গ । সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ ওঁকারেশ্বর দর্শন, পূজা, স্পর্শন, আত্ম-নিবেদন ও প্রণাম করিয়া জন্ম সফল ও কৃতার্থ বোধ করিলাম । তাপস সাধকগণ যে পরমাত্মারূপী ওঁকারের ধ্যান করিয়া থাকেন, এবং যে ওঁকার জীবের পরম সাধন, যিনি নিরাকার সর্বব্যাপী ধ্বন্যাত্মক মাত্র, তিনি স্বল্পবুদ্ধি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু সাকার শিবরূপ ধারণ করিয়া অধম জীবোদ্ধার করিতেছেন । সেট ওঁকারেশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন ; অহো কি আনন্দ ! কি আনন্দ !! “অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং,” আজ আমার পিতৃকুল ধন্য, আমার মাতৃকুল ধন্য ; আমিও ধন্য, হর্ষভরে মনে মনে এই মত চিন্তা করিতে করিতে যুক্ত করে গলগলীকৃত বাসে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া পাণ্ডার আদেশ মত বাসার আসিলাম, কিন্তু তখনও সেই হর্ষবেগ । বাসার আসিয়া কয়েকটা সাধুকে আমন্ত্রিত করিয়া যথাশক্তি ভোজন

তীর্থ-কাহিনী।

করাইয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান ও প্রণামান্তে বিদায় করিলাম। ঐ দিবস আর কোন স্থানে বাওয়া হইল না।

পরদিন পর্বত পরিক্রমণ ও স্থানীয় দেব দর্শনে বহির্গত হইলাম। নন্দ্যদার মধ্যস্থলে বিষ্ণাগিরি, ঐ বিষ্ণাগিরির দক্ষিণ পাশ্বের নদীকে নন্দ্যদা ও উত্তর পাশ্বের নদীকে কাবেরী বলে। এই উত্তর নদী যেখানে মিলিতা হইয়াছেন তাহাকে কাবেরীসঙ্গম বলে। নন্দ্যদার কূলে আসিয়া তথা হইতে পশ্চিম মুখে পার্বত্য পথে উচ্চ নিম্ন প্রস্তর রাশি অতিক্রম পূর্বক প্রায় দুই মাইল গমন করিলে কাবেরীসঙ্গম পাওয়া যায়, ঐ সঙ্গমস্থলে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। এইস্থলের কিঞ্চিৎ উপরে রণমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ, ইহার কেবল দাইল ভোগ হয়। তথায় অপর একটি গৃহে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত অতি সুদৃশ্য চতুর্ভুজ দ্বারকানাথ মূর্তি বিরাজিত। এই স্থান হইতে পূর্বমুখে পর্বতের শীর্ষ দেশ দিয়া একমাইল গমন করিলে গৌরীশঙ্কর শিবের মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়, ত্রিতল মন্দির মধ্যে নিম্ন হলে একাঙ লিঙ্গরূপী গৌরীশঙ্কর শিব বিরাজিত আছেন। তাহাকে দর্শন করিয়া উচ্চ নিম্ন পথ দিয়া এক মাইল পথ বাইয়া অর্ধসম্পন্ন একটি গৃহ মধ্যে সিদ্ধনাথ শিবদর্শন করিতে হয়, তথা হইতে ক্রমে ক্রমে পর্বত হইতে নিম্নদেশে আসিয়া সত্যনারায়ণে উপস্থিত হইতে হয়, এই স্থানে ছোট একটি মন্দিরমধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা মূর্তিত্রয় বিরাজিত আছে। এই দেবসেবার জন্য একটি সাধু নিযুক্ত আছেন। এই স্থানে অর্ধসম্পন্ন একটি ধর্মশালা আছে,

ওঁকারেশ্বর ও অমরেশ্বর ।

কোন ধার্মিক ধনী মহাজন দয়া প্রকাশে অবশিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া দিলে ইহলোকে যশোভাজন ও পরত্ন স্বর্গভোগী হইতে পারেন এবং তাহা হইলে নিরাশ্রয় বৈদেশিক যাত্রীদিগের একটা আশ্রয় হইতে পারে । তথা হইতে ক্রমে ক্রমে নশ্বদাকূলে আসিয়া আবার পশ্চিম মুখে যাইয়া ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইয়া প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্বক বাসায় আসিলাম । এবং অত্র স্থানীয় দেবদর্শন এইখানেই শেষ হইল ।

এস্থানের বাজারটা ছোট হইলেও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই পাওয়া যায় । প্রায় চার পাঁচ শত ঘর লোকের বসতি আছে, সকলেই দরিদ্র ; স্থানীয় লোকের উপজীবিকা একমাত্র পাণ্ডাগিরি আর দোকানদারী, পাণ্ডাগণ যাত্রীর সহিত কোন অসহ্যবহার করেন না । যাত্রীদের নিকট প্রাপ্য কিছু বেশী নাই । কোনরূপে দিন নির্বাহ করেন, পাণ্ডাগণের মধ্যে বিদ্যাচর্চা বিশেষ নাই, সামান্ত একটা পাঠশালা, একটা আউটপোস্ট ও একটি পোষ্টাফিস মাত্রই আছে । স্থানীয় লোকে দাইল রুটি বেশী ব্যবহার করে, অন্নব্যবহার খুব কম, চাউলের দর বেশী । জল বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ । আমরা ত্রিরাত্রি বাসাস্তে রওনা হইয়া ব্রহ্মপুরী আসিয়া পূর্বোক্ত অমরেশ্বর প্রভৃতি দেবদর্শনাদি করিয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলাম ।

পরিশিষ্ট ।

নবগঙ্গা ।

আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুন্পুনা স্মৃতা ।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী মতা ॥
কাবেরী গোতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা ।
বিষ্ণুপাদাজসমুত্ৰা নবধা ভূবি সংস্থিতা ॥

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ ত্রীশৈলে মল্লিকার্জুনং ।
উজ্জয়িন্দ্ৰাং মহাকালং ওঁ কারমমরেশ্বরং ॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্দ্ৰাং ভৌমশঙ্করং ।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোতমীতটে ॥
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে ।
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘৃস্মণেশং শিবালয়ে ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি জ্যোতির্লিঙ্গঃ সনাতনঃ ।
জ্যোতিষাঈকৈব লিঙ্গানি দৃষ্টানি ঋষিসন্তমাঃ ॥
তেষাঞ্চ জননীগর্ভে বাসো নৈব ভবেৎ পুনঃ ॥

পরিশিষ্ট ।

পঞ্চ মহাপীঠ ।

দেব্যান্ত যোনিপাতেন কামাখ্যা পীঠমুত্তমং ।
সর্কোংকুষ্টে তজ্জাতং ভুক্তিমুক্তি বিধায়কং ॥
তস্তা মুখস্ত পতনে পীঠং জ্বালামুখী স্মৃতা ।
ততো জিহ্বা চ পতনে লোলজিহ্বা প্রকীৰ্তিতা ॥
কটিদেশনিপাতেন কঙ্কাল পীঠমুত্তমং ।
তস্তা বাহুনিপাতেন বাহুলী পীঠ মুত্তমং ॥
দেব্যা হৃদি নিপাতেন হৃদ পীঠ মনুত্তমং ।
এতৎপীঠাং পরো নাস্তি বৰ্ত্ততে ধরণীতলে ॥

সপ্তপুরী ।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈত্তা মোক্ষদায়িকা ॥

ধাম চতুষ্টয় ।

কেদারধাম, দ্বারকাধাম, রামনাথধাম, জগন্নাথধাম ।

মহামাধবত্রয় ।

বিন্দুমাধব, বেণীমাধব, মাধবজী ।

কাশী চতুষ্টয় ।

উত্তর বা গুপ্তকাশী, দক্ষিণকাশী ভুবনেশ্বর,
মধ্যকাশী বারাণসী, পূর্বকাশী চন্দ্রশেখর ।

তীর্থ-কাহিনী ।

ষড়্ প্রয়াগ

দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ,
কর্ণপ্রয়াগ, প্রয়াগরাজ ।

সপ্ত গয়া ।

শিরোগয়া, নাভিগয়া, পদগয়া, শিবগয়া,
স্বয়ম্ভূগয়া, রামগয়া, মাতৃগয়া ।

সরোবর চতুষ্টয় ।

নারায়ণ সরোবর, বিন্দুসরোবর, পম্পাসরোবর,
মানসসরোবর ।

মঠ চতুষ্টয় ।

উধিমঠ, বশীমঠ, শঙ্করমঠ, সারদামঠ ।

সোমনাথ ।

সোমনাথের পুরাতন মন্দির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ । ইহা এই স্থানের
একটা প্রধান দর্শনীয় । আমাদের ধর্মশালার অনতিদূরেই এই
মন্দির, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধীরে ধীরে এই ধ্বংসাবশেষ মন্দিরে
যাইয়া উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, মন্দিরে আজও যে সকল
শিল্পনৈপুণ্য বিদ্যমান আছে তাহা হিন্দুর কৃতিত্বের অতুল
নিদর্শন । এই ভারতবিখ্যাত মন্দিরের মুসলমান রাজা কর্তৃক

পরিশিষ্ট ।

যে চূর্ণশা হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া কাহার না হৃদয়ে হঃখ উপস্থিত হয় ? এই মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না । ধনৈশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া সুলতান মামুদ ত্রিশ সহস্র সৈন্ত সমিভিব্যাহারে মন্দির আক্রমণ করে এবং পঞ্চ সহস্র ব্রাহ্মণের জীবন ধ্বংস করিয়া মন্দির লুণ্ঠন করে । মন্দির মধ্যে দশ হস্ত উচ্চ ও তিন হস্ত প্রস্থ লিঙ্গ মূর্তির উপর দুইশত মণ ওজনের সুবর্ণশৃঙ্খলের গাত্রে শত সহস্র সুবর্ণনির্মিত ঘণ্টা দোহলায়মান থাকিত । সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সোমনাথের পূজা করিতেন এবং তিন শত বাদ্যকর ও তিন শত গায়ক গীতবাদ্যে সতত মন্দির আমোদিত করিত । নিকরুণ যবনরাজ সুলতান মামুদ কর্তৃক আজ তাহাই মহা শম্মানে পরিণত হইয়া পূর্ব্বকার স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ধ্বংসাবশেষ মন্দির দণ্ডায়মান আছে । সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটিরও অধিক টাকার ধনরত্ন সহ অপূর্ব্ব খেতচন্দনকাষ্ঠনির্মিত বিশাল তোরণদ্বয় অপহরণ করিয়া গজনিতে ফিরিয়া গিয়া । মামুদের মৃত্যুর পর সেই দ্বার তাঁহার সমাধিভবনের দ্বারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় । রণজিৎসিং বহু চেষ্টায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ঐ তোরণদ্বয় গজনী হইতে ভারতে পুনরায় লইয়া আইসেন বটে কিন্তু প্রভাসে আনিতে পারিলেন না, আশ্রয় কেন্দ্রার অঙ্গাগারে রক্ষিত হইল এবং অদ্যাপি তথায়ই আছে ।

—:—